CC0. In Public Domain. Digitizagtion by eGangotri

প্রশ্নোত্তরে শ্রীবালানন্দ

সংকলক
গোরা মুখোপাধ্যায়

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitization by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রশ্নোত্তরে শ্রীবালানন্দ

সংকলক

গোরা মুখোপাধ্যায়

প্রাচী পাবলিকেশনস্

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রকাশক ঃ
জয়দীপ রায়চৌধুরী
প্রাচী পাবলিকেশনস্
বাক্সাড়া, হাওড়া
দূরাভাষ ঃ ৬৫৮-০০৮৪

প্রথম প্রাচী সংস্করণ ঃ
কলকাতা পুস্তক মেলা—২০০২

প্রচ্ছদ ঃ
শুভাশীষ বল

অক্ষর বিন্যাস ঃ
শৈব্যা বুকস্ লেজার
৮/১সি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা-৭৩

মূল্য ঃ ৮০ টাকা

মুদ্রক ঃ
অভিনব মুদ্রণী
৭৭/১, সিমলা স্ট্রীট্
কলকাতা-৬

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রাক্-কথন

দেওঘরে সচল বৈদ্যনাথরূপে অবস্থানকালে শ্রীশ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ তাঁর অগণিত ভক্ত ও শিষ্যমণ্ডলীর উদ্দেশে যে অমৃতোপম উপদেশাবলী নিরবচ্ছিন্নভাবে বিতরণ করতেন, তাঁরই কৃপাধন্য শিষ্যা স্বর্গতা সরলাবালা মিত্র, তাঁর রচিত 'কথা-প্রসঙ্গ' গ্রন্থের তিনটি খণ্ডে তার অনেকগুলি লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন।

মানুষের জীবনে নানারকম প্রশ্ন জাগে। শুধু অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসা নয়, দৈনন্দিন সাধারণ জীবন-জিজ্ঞাসায়ও মানুষের মন সময়ে সময়ে সময়ে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। এইসব জটিল জিজ্ঞাসা যখন যথার্থই মানুষের চিত্তকে অধিকার করে বসে, অথচ কোন সন্তোষজনক মীমাংসায় সে পৌঁছতে পারে না, তখনই সে সন্ধান করে এমন মানুষের যিনি তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে সকল প্রশ্নের মীমাংসা অনায়াসে করে দিতে পারেন। এঁরাই হলেন সদ্‌গুরু এবং এঁরাই মানুষের সকল সংশয় নিরসন করে মানুষকে প্রকৃত পথের সন্ধান দেখাতে পারেন।

অগণিত নরনারী, ভক্ত ও শিষ্য শ্রীশ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের পদপ্রান্তে উপনীত হয়ে নিজ নিজ সংশয় তাঁর কাছে ব্যক্ত করেছেন। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত থেকে সাধারণ গৃহবধূ, রাজা মহারাজা থেকে সমাজ সংস্কারক প্রথিতযশা নেতৃবৃন্দ, সকলের জন্যেই তাঁর ছিল অবারিত দ্বার। কী অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসা, কী দৈনন্দিন জীবন-জিজ্ঞাসার বহুচিত্র প্রশ্নাবলী ও তাদের সদুত্তর 'কথা-প্রসঙ্গ' গ্রন্থের পাতায় পাতায় লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। ব্রহ্মচারী মহারাজ তত্ত্বকথা শোনাতে শোনাতে সেই তত্ত্বের বিষয়বস্তুকে পরিস্ফুট করবার জন্যে প্রায়শই নানারকম গল্পের অবতারণা করতেন। এইরকম একশোটি গল্পের একটি সংকলন গ্রন্থ 'শ্রীবালানন্দ গল্পমালিকা' নাম দিয়ে সম্প্রতি প্রকাশ করেছেন দেওঘর রামনিবাস ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শ্রীমৎ বিভানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ। উপদেশের সঙ্গে সম্পৃক্ত দুই একটি গ্রন্থও সংক্ষেপে সংকলিত হয়েছে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে হয়তো একই প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন বালানন্দজীর কাছে। প্রশ্নকারীর গ্রহণ-ক্ষমতা বা অধিকার বুঝে মহারাজ সেই একই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন বিভিন্নভাবে। পাঠকের সুবিধার জন্যে এইরকম একই প্রশ্নের বিভিন্ন উত্তরগুলি একই জায়গায় সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে।

কত বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে মহারাজ আলোচনা করেছেন তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। আমরা মাত্র কয়েকটি বিষয় নির্বাচন করে নিয়ে সেই বিষয়সংক্রান্ত প্রশ্নগুলির মধ্যে আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখেছি। ঈশ্বর, আত্মা, মোক্ষ, সৃষ্টি, মায়া প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্রের জটিল বিষয়গুলি যেমন আলোচিত হয়েছে, তেমনি এখানে রয়েছে জাতিভেদ, আহার-বিহার-বাণিজ্যের মতো দৈনন্দিন জীবনচর্চার অন্তর্গত বিবিধ আলোচনা। কী প্রাঞ্জল ভাষায় সর্বজনবোধ্য করে তিনি এইসব জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করে গিয়েছেন, আশা করি এই গ্রন্থপাঠে পাঠক তা উপলব্ধি করতে পারবেন। প্রত্যেকটি বিষয়ে আলোচনায় প্রকাশ পেয়েছে বালানন্দজীর অতলস্পর্শ জ্ঞানের দিব্য মহিমা। অথচ আক্ষরিক অর্থে শিক্ষা বলতে তেমন কিছু তাঁর ছিলনা। ছিল তাঁর স্বাভাবিক ঈশ্বর-প্রীতি যা তাঁর প্রতিটি কথার মধ্যে দিয়ে শ্রোতার মর্মকে স্পর্শ করে যেত। আমাদের বিশ্বাস, তাঁর শ্রীমুখনিঃসৃত এই উপদেশাবলী যাঁরা পড়বেন, তাঁরাই ভগবানের প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাস নতুন করে ফিরে পাবেন। জীবনের নানা সংকটে ও দুঃখে সান্ত্বনা লাভ করবেন।

মহারাজ উপদেশ দিতেন ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে। শ্রীমতী সরলাবালা মিত্র তাঁর শ্রীগুরুমহারাজের মুখের কথা অবিকল বজায় রেখেছেন তাঁর 'কথা-প্রসঙ্গ' গ্রন্থে। এখানে আমরা বাঙালি পাঠকদের সুবিধার জন্যে সহজ বাংলায় উপদেশগুলি পরিবেশন করেছি। মহারাজের মূল বক্তব্য এবং তাঁর কথা বলবার নিজস্ব ভঙ্গীটি যথাযথ বজায় রাখতে চেষ্টার ত্রুটি করিনি।

সূচনায় শ্রীমদ্ বালানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের অমৃতময় উপদেশ যা 'কথা-প্রসঙ্গে' প্রবাহিত হয়েছিল তার থেকে পঞ্চাশটি তাঁর সাক্ষাৎ আদেশমূলক বাণী তাঁরই শ্রীমুখনিঃসৃত ভাষায় চয়ন করে একটি ক্ষুদ্র

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মালিকা গ্রথিত করে দেওয়া হল, জীবনে নিয়ত অনুসরণ ও পালনের জন্য এগুলি তাঁর অভ্রান্ত নির্দেশ। এই মালিকাটি বারংবার মনে মনে পাঠ বা আবর্তন করলেও সকলের সাধন-পথে প্রভূত সহায় হবে এবং শক্তি ও প্রেরণা এনে দেবে। এরই পটভূমিকায় প্রশ্নোত্তরটি পাঠ করলে তা আরও হৃদ্য ও আস্বাদ্য হবে বলেও মনে হয়, কারণ এই আদেশ-পঞ্চশিকারূপ মালিকার প্রতিটি বাণী এক একটি অমূল্য হীরকখণ্ডের মতো আপন প্রভায় সমুজ্জ্বল।

আমার পরমাত্মীয় এবং পরম পূজনীয় ডক্টর গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়ের অমূল্য উপদেশ এবং অপরিমেয় উৎসাহ ও প্রেরণা ভিন্ন এ গ্রন্থ সংকলন করা আমার পক্ষে সম্ভব হত না। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করছি। এঁদের সকলের উপর শ্রীভগবানের ও শ্রীশ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের মঙ্গলাশিস নিয়ত বর্ষিত হোক—এই প্রার্থনা।

কলকাতা
তারিখ ঃ ২রা নভেম্বর
১৯৯০—রাসপূর্ণিমা

গোরা মুখোপাধ্যায়

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ॐ

শ্রীবালানন্দ আদেশ-পঞ্চাশিকা

১। শ্বাস শ্বাসমে হরি রটো। প্রতি শ্বাসমে ঈশ্বর কা নাম স্মরণ কর্‌না।

২। মুখমে নাম কর্‌না, হাথমে কাম কর্‌না।

৩। তুম হৃদয় জমিন্‌মে হরিনামকা ক্ষেতি লাগাও।

৪। একদম্ ঈশ্বর-আশ্রিত হো জাও, উনিকা শরণাপন্ন হো জাও, উনিকা দাসানুদাস বন্ জাও।

৫। তুম্‌লোক পরমদয়াল পরমাত্মাকো উপর তুমলোগোঁকা সমুচা ভার ছোড় দেও।

৬। তুম্‌লোক একদম নির্ভয় হো জাও, সদা সর্বদা এহী ভাব মনমে রাখেগা যে হম্‌লোক পরমাত্মাদেবকা গোদিমে বৈঠা হ্যায়।

৭। তুম্ তুমারা তন্ মন্ ধন্ ভগবানকো সমপর্ণ কর্ দেও। একদম্ পরমাত্মাকা উপর সব্ ছোড়্ দেকে পড়া রহো।

৮। পরমাত্মারূপী রাজাসে তুম্‌লোক্ কুছ মাঙ্গো মৎ তুম্‌লোক রাজাকো হী মাঙ্গো।

৯। ঈশ্বরকো ডায়েরী লিখ্ দেও—জো কুছ কীয়া হ্যায় সব তুমারা কাম হ্যায়, তুম্ বুঝ্ লেও।

১০। জো কুছ্ মেরা বোলকে মান্‌তা হ্যায়, ওহী চীজ তেরা কর্ দেও উল্‌টায় দেও, উল্‌টায় দেনেসেই সীধা হোগা।

১১। রূপেয়া হম্ কামাতা হ্যায়, এহী ভাব তুম্ ছোড়্ দেও। ঈশ্বর হম্‌কো দেতা হ্যায়, এহী ভাব লে আও।

১২। পরমাত্মাকো ধন হ্যায়, তুম হ্যায় কর্মচারী, এহী ভাবসে রহো, তুমকো বন্ধন নেহী হোগা।

১৩। তুম্ ম্যানেজার বনো, মালিক মৎ বনো। ইষ্টদেবকো মালিক বনাও ঔর তুম্ উস্‌কো ম্যানেজার হোকে রহো।

১৪। তুম ঝি বন্ জাও, গৃহিনী মৎ বনো।

১৫। তুম্ ধরমকা রানী বন্ জাও।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

১৬। ধরম্ ধন্‌কা তুম্ আহরণ কর্‌না।

১৭। ভাবকো শুদ্ধ কর্‌না। ভাবকো উল্‌টায় দেনে হোগা, কোঈ শত্রু নেহী হ্যায়, উসমেই মিত্র দেখ্‌না চাহিয়ে, তব্ দুঃখ নেহী হোগা।

১৮। সংকল্প শুদ্ধ তো সংকল্প সিদ্ধ। সংকল্পকো শুদ্ধ কর্‌না চাহিয়ে, শুদ্ধ সংকল্প সিদ্ধ হোতা।

১৯। সদা সর্বদা সৎসঙ্গ কর্‌না চাহিয়ে।

২০। তুম্ সব আদমীকো ভক্ত বনায়গা, ভালা বনায়গা, সো তো নহী হোগা, তুম অপ্‌নে ভলা হো জাও।

২১। হর বখৎ বিচার কর্‌না। বিচারই সার, বিচার করনেসেই নিশ্চয় হো জায়েগা।

২২। হর্ বখৎ শুভ কাম কর্‌না, শুভ চিন্তন কর্‌না, দান কর্‌না।

২৩। হাথ খুলাসা রাখ্‌না, হাথ খুলাসা নেহী হোনেসে পুঁজি নেহী হোগা।

২৪। মিঠা বচন ভী বোল্‌না ঔর মিঠা ব্যবহার ভী কর্‌না।

২৫। বচন য়া বোলি অচ্ছী তরেসে সমঝকে উসকো অচ্ছী তরেসে বিচার কর্‌কে তব্ বোল্‌না চাহিয়ে। তৌল কর্‌কে বোলি বোল্‌না।

২৬। ছুটা-ছুটী মৎ কর্‌না, এক কিনারাকো পকড়্ কর্‌কে বৈঠা রহো। এককো পকড়্‌কে রহ্‌না। বাসা পকড়ায় লেও।

২৭। ক্ষুদ্র স্রোত মহৎ স্রোতমে মিলাও।

২৮। চুরি, নারী, মিথ্যাভাষণ—এহী বর্জন কর্‌না।

২৯। ভূত্-ভবিষ্যৎকো ছোড়্ দেনা, বর্তমানকে বীচ্‌মে রহ্‌না, এহী ঠিক হ্যায়।

৩০। জো শুভ কর্ম তুমারা সামনেমে আ জায়, উস্‌কো সুসম্পন্ন কর্ জাও। উস্‌কো ফল্‌কো তেয়াগ্ কর্‌না, ফলাফল ঈশ্বরকো দে দেনা। ফলাফলকো তুম্ প্রারব্ধকা উপর ছোড়্ দেনা।

৩১। তৃষ্ণাকে পীছে দৌড়া মৎ, ছুটো মৎ বিচারপূর্বক স্থির হোকে খড়া রহো, জ্ঞান-সূর্যকা আরাধনা করো।

৩২। অন্তর্‌মে নিবৃত্তি রখ্‌না, বাহারমে প্রবৃত্তি কর্‌না অন্তর তুম্ অপ্‌না ইষ্টধ্যানসে নিযুক্ত রাখো আউর্ বাহারকা বাবহারকে ওয়াস্তে প্রবৃত্ত হো জানা।

৩৩। দুঃখ পাইয়ে তো সুখ লাগাইয়ে। বিপদ আনেসে মুহ্যমান নহী হোনা, বিষণ্ণ নহী হোনা, আউর উৎসাহসে আনন্দ কর্‌না। আপত্তি কালমে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আনন্দ লে আও।

৩৪। রোগ আয়া, আনে দেও। শোক আয়া, আনে দেও। দুঃখ আয়া, আনে দেও। সংসারকে বীচ্‌মে নির্লিপ্ত হোকে রহ্‌না।

৩৫। তুম সাদা কাপড় পহিন্ কর্‌কে শুক্ল সন্ন্যাসী হো জাও, জ্ঞান উপার্জন করো, ঈশ্বরকা নিশ্চয় করো।

৩৬। মনকো খালী মৎ রখো। মনকো খালি রখ্‌নেসে উয়ো তুম্‌লোককো তক্‌লিফ্ দেগা।

৩৭। জ্ঞানরূপী গঙ্গাকে বিচাররূপী দোনো তট, মনরূপী দুষ্ট ঘোড়াকো ওহী তট্‌মে ছোড়্ দেও।

৩৮। সদা সর্বদা শুভ কার্যমে মনকো লগা রখ্‌নেকা হ্যায়।

৩৯। মুক্তিকে ওয়াস্তে যুক্তি কর্‌না চাহিয়ে, যুক্তিসে মুক্তি মিল্ জায়েগা।

৪০। তুম্ মধুমক্ষিকা বন্ জাও, তুমারা চিত্তশুদ্ধি অপ্‌নেসে হো জায়গা।

৪১। মধুকরকা মাফিক্ চুন চুন্‌কে তুম জহাঁ জহাঁ গুণ দেখো ঝট্ উসকো গ্রহণ করো।

৪২। তুমলোক পরদোষানুসন্ধান যত্নপূর্বক তেয়াগ করেগা।

৪৩। তাল্‌মে ভঙ্গ না পায়।

৪৪। দৌড়ো মৎ, বৈঠ মৎ।

৪৫। কিস্তী চুকাও।

৪৬। সুদ মৎ দেনা।

৪৭। শ্বাস পর্ টিকা দেও।

৪৮। অন্নদান দেও, হরিকা নাম লেও।

৪৯। শাস্ত্র লেকে পাঠ করো, ঘরমে বৈঠ্‌কে সৎসঙ্গ মিল জায়েগা।

৫০। জো রাস্তামে যাও, ঈশ্বরকো ছোড়ো মৎ। পরমাত্মাকা আশ্রয় লেও।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

ঈশ্বর

১। ভগবান যে আছেন তার প্রমাণ কী? ১৭
২। ভগবানকে কীভাবে বর্ণনা করা যায়? ১৯
৩। তিনি সাকার না নিরাকার, সগুণ না নির্গুণ? ১৯
৪। ভগবানকে লাভ করবার উপায় কী? ২০
৫। ভগবানকে কোথায় খুঁজতে হবে, কেমন করে খুঁজতে হবে? ২২
৬। ভগবানকে আমরা লাভ করতে পারিনে কেন? ২৪
৭। ভগবান কি আমাদের ডাক শুনতে পান? ২৬
৮। ভগবানের সঙ্গে মানুষের কী সম্বন্ধ? ২৭
৯। কলিকালে ভগবানকে কি সশরীরে দেখা যায়? ২৯
১০। জগতে এত দুঃখ-কষ্ট, তবে ভগবানকে মঙ্গলময় বলব কেন? ২৯
১১। ভগবানের কি পক্ষপাতিত্ব দোষ আছে? ৩০
১২। ভগবানের সম্বন্ধে আলোচনায় রুচি হয় না কেন? ৩১
১৩। শুভকর্মেই যখন শুভফল মেলে, তখন ভগবানকে ডাকবার দরকার কী ৩২

আত্মা

১। আত্মা কাকে বলে? ৩৪
২। আত্মাকে কিভাবে জানা যায়? ৩৫
৩। দেহের সঙ্গে আত্মার সম্বন্ধ কী? ৩৬

সদ্‌গুরু

১। সদগুরুর শরণ অপরিহার্য কেন? ৩৭
২। সদ্‌গুরুর কাছে শিষ্য কী লাভ করে? ৩৮
৩। একমাত্র গুরুবাক্যেই কি সত্যবস্তু লাভ হয়? ৩৮
৪। গুরুর কৃপা গ্রহণ করার ক্ষমতা সকলের হয় না কেন? ৩৯

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

৫। সকলকে এ রকম উপদেশ গুরু দেন না কেন? ৪১
৬। গুরু কীভাবে শিষ্যকে পরীক্ষা করেন? ৪২
৭। সদ্‌গুরুর সঙ্গে কি তর্ক করা উচিত ৪৩
৮। সব গুরুই কি গুরু হওয়ার উপযুক্ত? ৪৩
৯। গুরু যদি গৃহী হন তাতে কি শিষ্যের কল্যাণ হয় না? ৪৪
১০। গুরুকে ভালোবাসব, অথচ তাঁর আশ্রিত জনদের প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করব, এটা কি ঠিক? ৪৪

মন্ত্রদীক্ষা

১। মন্ত্রের কোন শক্তি আছে কি? ৪৬
২। দীক্ষা গ্রহণে দেশ-কাল-পাত্র বিচার করা হয় কেন? ৪৭
৩। গুরুদত্ত মন্ত্র প্রকাশ করা নিষিদ্ধ কেন? ৪৮

সাধু-সন্ত

১। সাধু কাকে বলব? ৫০
২। প্রকৃত সাধু আর কপট সাধু কীভাবে চেনা যায়? ৫১
৩। সাধু-সজ্জনদের পারিশ্রমিক কীভাবে দিতে হয়? ৫১
৪। সাধুরা পরিব্রাজনায় রত থাকেন কেন? ৫২
৫। সাধু-সজ্জনদের নিন্দায় লাভবান হয় কে? ৫৩
৬। সাধুবেশী ভণ্ডদের কি কল্যাণ হয়? ৫৪
৭। সংসারীরা ত্যাগী, না সাধু-সজ্জনেরা ত্যাগী? ৫৪
৮। কতরকম উদ্দেশ্য নিয়ে মানুষ সাধু-সন্তের কাছে যায়? ৫৫

সৎসঙ্গ

১। মানুষের জীবনে সঙ্গের প্রভাব কতখানি? ৫৬
২। সাধুসঙ্গ ও সৎসঙ্গের সার্থকতা কী? ৫৮
৩। সংসারীর পক্ষে সাধুসঙ্গ করবার উপায় কোথায়? ৬১

মোক্ষ/মুক্তি

১। মোক্ষ বা মুক্তিলাভের অবস্থা কী রকম? ৬২
২। বন্ধন থেকে মুক্তি কিভাবে হতে পারে? ৬৪
৩। বিদেহমুক্তি আর জীবনমুক্তি কাকে বলে? ৬৬

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

৪। মোক্ষকামী সাধক কি স্বর্গসুখ কামনা করে? ৬৭

জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম

১। জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম কি পরস্পর সম্পর্কহীন? ৬৯
২। জ্ঞানী বলা হয় কাকে? ৭২
৩। আত্মজ্ঞান লাভ সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না কেন? ৭৩
৪। জ্ঞানের আলোচনা কি সকলের সঙ্গেই করা চলে? ৭৪
৫। জ্ঞানীর পক্ষে দেবদেবীর পূজার্চনা কি নিরর্থক? ৭৫
৬। জ্ঞানী আর ভক্তে প্রভেদ কী? ৭৬
৭। মানুষের পক্ষে সকল কর্ম ত্যাগ করা কি সম্ভব ৭৮

ভক্তি-ভক্ত-ভগবান

১। ভক্তিকে সবচেয়ে সহজ পন্থা বলা হয় কেন? ৭৯
২। ভক্তি কীভাবে লাভ করা যায়? ৮০
৩। নিষ্কাম ভক্ত কাকে বলে? ৮৩
৪। সকাম আর নিষ্কাম ভক্তের মধ্যে পার্থক্য কী? ৮৪
৫। ভক্তের কাছে ভগবান কী চান? ৮৫
৬। ভক্তির কি তারতম্য আছে? ৮৬
৭। ভক্তকে ভগবানের চেয়ে বড়ো বলা হয় কেন? ৮৬
৮। শুধু অন্ধবিশ্বাসের দ্বারা কি ভগবানকে পাওয়া যায়? ৮৭
৯। নামজপে ভগবানকে পাওয়া যায় একথা কি সত্য? ৮৮

প্রারব্ধ ও পুরুষকার

১। প্রারব্ধ ও পুরুষকার বলতে কী বোঝায়? ৮৯
২। প্রারব্ধ বড়ো, না পুরুষকার বড়ো? ৯২
৩। প্রারব্ধকে কি খণ্ডানো যায়? ৯৪
৪। প্রারব্ধ কি এই জন্মে ফলপ্রসূ হয়? ৯৬

পাপ-পুণ্য

১। পাপ-পুণ্যের উৎপত্তি কোথা থেকে হয়? ৯৮
২। পাপের প্রতিকারে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন বা গ্রহদেবতার পুজোয় কি কোন ফল হয়? ৯৮

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

৩। ভগবানই যখন আমায় দিয়ে সব কাজ করান, তখন পাপ-পুণ্য আমার হবে কেন? ৯৯

৪। সর্বত্র পরমার্থ দৃষ্টি দেবার উপদেশ দেওয়া হয়। চুরি ডাকাতিতে কী পরমার্থ আছে? ৯৯

রোগ-শোক / সুখ-দুঃখ

১। রোগ-শোক, সুখ-দুঃখের সৃষ্টি হয়েছে কেন? ১৮০

২। সুখ-দুঃখের অবস্থান কোথায়? ১৮০

৩। মানুষ সুখ চায়, দুঃখ চায় না। তা কি সম্ভব? ১০১

৪। মানুষের দুঃখ-শোকের কারণ কী? ১০২

৫। শরীরে রোগ দেখা দেয় কেন? ১০৩

৬। রোগ-শোক নিবারণের উপায় কী? ১০৩

৭। দৈব ওষুধে কি রোগ সারে? ১০৮

অন্তঃকরণ

১। অন্তকরণ বলতে কি বোঝায়? ১১০

২। অহংকারকে কি আত্মা বলা চলে? ১১১

৩। ত্রিগুণের সংস্পর্শে মন কীভাবে কাজ করে? ১১১

৪। মনকে স্থির করবার উপায় কী? ১১২

৫। মনের নিম্নগতিকে উর্দ্ধমুখী করা যায় কী ভাবে? ১১৩

৬। অন্তকরণকে কীভাবে শুদ্ধ করা যায়? ১১৫

৭। জপ-তপেও অনেকের চিত্তশুদ্ধি হয় না কেন? ১১৭

৮। শুদ্ধ অন্তকরণে কি ভবিষ্যৎ জানা যায়? ১১৭

সৃষ্টি/মায়া

১। সৃষ্টি কোন্ কোন্ জিনিসে গঠিত? ১১৯

২। এই জগৎ কি মিথ্যা? ১১৯

৩। সৃষ্টির মধ্যে মনুষ্যজীবনকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হয় কেন? ১২০

৪। জড় ও চেতনে প্রভেদ কী? ১২০

৫। মায়া, প্রকৃতি বা অবিদ্যার উদ্ভব এবং অবস্থান কোথায়? ১২১

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

৬। জগৎ প্রপঞ্চকে মায়ার খেলা বলা হয় কেন? ১২২
৭। মায়া কিভাবে মানুষকে ভোলায়? ১২২
৮। মা হয়ে বিশ্বজননী সন্তানকে মায়ার হাতে সঁপে দেন কেন? ১২৩
৯। মায়ার হাত থেকে কীভাবে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়? ১২৩

ধর্মপথের অন্তরায় ও তাদের অপসারণ

১। দেহের প্রতি আসক্তিকে কীভাবে দূর করা যায়? ১২৫
২। ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব থেকে কীভাবে মুক্তি পাওয়া যায়? ১২৬
৩। ভোগের দ্বারাই কি ত্যাগ আসে না? ১২৯
৪। ধনদৌলতের অভিমান কীভাবে ত্যাগ করা যায়? ১৩০
৫। ক্রোধকে তে সব সময় দমন করা যায় না, তখন কী করা উচিত? ১৩১
৬। লোভকে জব্দ করা যায় কীভাবে? ১৩২

লোক-ব্যবহার

১। জাতিভেদ মানা উচিত না অনুচিত? ১৩৪
২। ধর্মান্তর গ্রহণ বাঞ্ছনীয় কেন? ১৩৫
৩। নিরামিষ আহার শ্রেষ্ঠ কেন? ১৩৬
৪। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক মানুষের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য কী? ১৩৮
৫। দুর্জনের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করা উচিত? ১৩৯
৬। ব্যবসা বাণিজ্যে মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া কি বাঞ্ছনীয়? ১৩৯

নারী

১। মায়েরাই ধর্মকে বাঁচিয়ে রেখেছে, একথা কতদূর সত্য? ১৪১
২। মায়ের স্বভাব শিশুর স্বভাবকে কীভাবে প্রভাবিত করে? ১৪২
৩। স্ত্রীর কাছে গুরু বড়ো না স্বামী বড়ো? ১৪৩
৪। শঙ্কারাচার্য মেয়েদের পিশাচিনী বলেছেন কেন? ১৪৪

সংসার

১। জ্ঞানীরা সংসারকে কীভাবে দেখে থাকেন? ১৪৫
২। সংসারে থেকে কি ধর্মলাভ হয় না? ১৪৭

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

৩। সংসারীর পক্ষে ভগবানের নাম নেবার সময় কোথায়? ১৪৭
৪। সংসারে নির্লিপ্ত হয়ে কীভাবে কাজ করতে হয়? ১৫০
৫। সংসারীদের পক্ষে কথার সংযমের উপর এত জোর দেওয়া হয় কেন? ১৫১
৬। সংসারের রঙ্গ দেখে যমরাজ, পৃথিবী আর লক্ষ্মী হাসেন কখন? ১৫১

দান

১। উপার্জনের টাকার সদ্ব্যবহার কেমন করে করতে হয়? ১৫৩
২। দাতা কে? কৃপণ কে? ১৫৩
৩। ধনবান দান করতে পারে, নির্ধন কী করবে? ১৫৪
৪। আশ্রমাদিতে দানের সার্থকতা কী ১৫৫
৫। দান কখন নিষ্ফল হয়? ১৫৬

মৃত্যু

১। মৃত্যু সৃষ্টি-রচনার একটি অঙ্গ কেন? ১৫৭
২। মৃত্যুর কোনো কালাকাল নেই কেন? ১৫৭
৩। মৃত্যুর পর কী সঙ্গে যাবে? ১৫৮
৪। মৃত্যুকে মানুষ ভয় পায় কেন? ১৫৮
৫। অন্তিমকালের কর্তব্য কী? ১৫৮

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ॐ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীশ্রী ভগবানের অশেষ কৃপায় "প্রশ্নোত্তরে শ্রী বালানন্দ" প্রকাশ করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি।

প্রকৃতপক্ষে গোবিন্দগোপালবাবুর সাহায্য ছাড়া এই গ্রন্থ আমার পক্ষে প্রকাশ করা সম্ভব হতো না। এছাড়া দুর্গাপুরের বালানন্দ তীর্থাশ্রমের অধ্যক্ষ বিভানন্দ ব্রহ্মচারী (ভূতনাথ বাবা) তাঁর সাহায্যের হাত প্রসারিত না করলে এবং এই বই প্রকাশের অনুমতি না দিলে—হয়তো এই বই প্রকাশের স্বপ্ন অধরাই থেকে যেতো।

গুরু মহারাজের মুখ নিঃসৃত বাণী—আমাদের কাছে অন্ধের যষ্ঠীর মতো। বর্তমানে এই ভোগসর্বস্ব ক্ষয় যুগে—তাঁর এই বাণী আমাদের সঠিক পথের সন্ধান দেবে বলেই আমার বিশ্বাস।

বিনীত
প্রকাশক

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীবালানন্দ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ঈশ্বর

১। ভগবান্ যে আছেন তার প্রমাণ কি?

কারণ ছাড়া কোন কার্য হতে পারে না। কার্য যেখানে আছে সেখানে সেই কার্যের কারণও থাকতে হবে! এই যে বিশ্বজগৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি, এ এল কোথা থেকে? নিশ্চয় কেউ একে সৃষ্টি করেছে। কে সেই সৃষ্টিকর্তা? তিনিই ভগবান। ভগবান যে আছেন তা নিঃসন্দেহে বলা চলে। ছেলে আছে অথচ তার বাপ নেই, এ কখনো হতে পারে? ছেলে থাকলে বাপকেও থাকতে হবে। তবে বাপ মারা গেলে ছেলে তাকে আর কাছে পায় না। কিন্তু বাপ হলেন জগতের পিতা, তিনি অমর, তাঁর কখনো মৃত্যু হতে পারে না।

ভগবানের অস্তিত্ব দু'ভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায়। এক বিধিবাক্য বা অস্তিভাব দিয়ে, আর এক নিষেধবাক্য বা নাস্তিভাব দিয়ে। বিধিবাক্য হল ভগবান আছেন, ভগবান হলেন সত্য আর তাঁর মায়া হল মিথ্যা। এই জগৎপ্রপঞ্চ সব হল মায়ার খেলা। তাই যা কিছু দেখছ সবই হল মিথ্যা উপাদানে গড়া, কারণ ভাগবানই একমাত্র সত্য, মায়া মিথ্যা। ভক্ত তাই বলেন, এই জগৎসংসারে যাকিছু দেখা যাচ্ছে সবই হরিময়, হরি ছাড়া আর কিছুই নেই। একে বলে বিধিবাক্য। ভক্ত এই ভাব নিয়েই ভগবানের অস্তিত্ব মেনে নেন।

চৈতন্যের তিন সত্তা অর্থাৎ ভগবান তিনভাবে নিজেকে প্রকাশ করছেন। সেই তিনটি সত্তা হল অস্তি, ভাতি, প্রিয়। মায়ারও তিন সত্তা—নাম, রূপ আর ক্রিয়া। চৈতন্য সত্তা তো লোপ হয় না, সে অস্তি অর্থাৎ আছে আর ভাতি অর্থাৎ প্রকাশ পাচ্ছে। তার এই অস্তি আর ভাতি তোমাকে মানতেই হবে। তবে চৈতন্যের উপর আরোপিত মায়াসত্তার লোপ হয়। একটা সোনার তাল থেকে তুমি বালা, হার, আংটি প্রভৃতি নানারকম অলঙ্কার তোমার ইচ্ছেমতো তৈরি করতে পারো, কিন্তু যা-কিছু তৈরী করো না কেন, সবকিছুর ভেতরে সেই সোনাই রয়েছে। অলঙ্কার হিসাবে তার নাম, রূপ আর ক্রিয়া যতই বিভিন্ন হোক

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

না কেন, মূলে যে সোনা সেই সোনাই থাকবে। সেই সোনার অস্তিত্ব, ভাতিত্ব কখনো লোপ পাবে না। অলঙ্কারগুলিকে গলিয়ে ফেলো, তাতে তাদের নাম, রূপ আর ক্রিয়া লোপ পাবে বটে, কিন্তু সোনার কোনো পরিবর্তন হবে না, তা যেমন, তেমনি থাকবে। তার মায়াসত্তা—নাম, রূপ আর ক্রিয়া শুধু লোপ পাবে। ভগবানের সঙ্গে মায়ার যতই খেলা চলুক না কেন, ভগবৎ-সত্তা কিন্তু ঠিক বজায় থাকে। পিঁপড়ের মধ্যে যে চৈতন্যসত্তা, সেই একই চৈতন্যসত্তা হাতি, ঘোড়া, মানুষ সকলের মধ্যেই রয়েছে! মাটি দিয়ে তুমি ঘড়া, কলসি যা-কিছু তৈরী করো না কেন, তাদের মূল উপাদান মাটির কোনো পরিবর্তন করা যায়না। মাটির ঘড়াকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলো, সেই টুকরোগুলোকে গুঁড়িয়ে ধুলো করে হাওয়ায় উড়িয়ে দাও, দেখবে সেই ধুলো মাটিতে পড়ে মাটির সঙ্গে মিশে আবার যে মাটি সেই মাটিতেই পরিণত হয়েছে। মাটির অস্তিত্ব তুমি কোনোভাবেই লোপ করতে পারবে না। সৃষ্টির মধ্যেও ভগবান এইভাবে বিরাজ করছেন, তাঁর অস্তিত্বও কোনভাবে বিলোপ করা সম্ভব নয়। বিধিবাক্য দিয়ে এইভাবে ভগবানের অস্তিত্বের প্রমাণ দেওয়া যায়!

আর নিষেধ বাক্য হল ভগবান বলে কিছু নেই। অনেকেই বলে ভগবান নেই। আমি তাদের বলি, তোমার ভিতরে থেকে যে সাক্ষী দিচ্ছে যে ভগবান নেই সেই সাক্ষীই তো হলেন ভগবান। প্রকৃতপক্ষে নাস্তিক কেউই নয়। বিচার করে দেখলেই নাস্তিকভাবেও ভগবানের অস্তিত্ব বুঝতে পারা যাবে। মানুষের দেহ ক্ষিতি, অপ্, তেজ মরুৎ, ব্যোম অর্থাৎ মাটি, জল, আগুন বায়ু ও আকাশ, এই পঞ্চভূতে গঠিত। তুমি নিজেকে ভাগ করে যার যার অংশ তাকে দিয়ে দাও। মাটির ভাগ বায়ুকে আর আকাশের ভাগ আকাশকে বিলিয়ে দাও। দেখো কী রইল। নেতি নেতি অর্থাৎ এ নয়, এ নয় এইভাবে বিচার করতে থাকো। ভগবান পৃথিবী নয়, জল নয়, তেজ নয়, বায়ু নয়, আকাশ নয়। শব্দ স্পর্শ, রূপ রস গন্ধ এই পঞ্চ তন্মাত্রাও ভগবান নয়! প্রতিটি তন্মাত্রার যে দেবতা, সেই পাঁচ দেবতাকে তুমি এই পাঁচ তন্মাত্রা বিলিয়ে দাও। কী রইল? কিছুই না। কে সাক্ষী দিচ্ছে যে কিছুই নেই? সেই সাক্ষীই চৈতন্যসত্তা বা ভগবান।

জ্ঞানী বলেন ঃ 'ব্রহ্ম সত্যং জগৎ মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব কেবলম্' অর্থাৎ এই জগৎ সংসার সবই মিথ্যা, একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, জীবই ব্রহ্ম বা সোহহম্, একমাত্র আমিই আছি, আমি ছাড়া আর কেউ নেই। এ-ও হল নিষেধভাব। জীব আর ব্রহ্ম অভেদ, এই তত্ত্বের মধ্যে দিয়ে জ্ঞানী ভগবানের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করা যায়। তবে যার যে ভাব ভালো লাগে তার পক্ষে সেই ভাব নিয়ে থাকাই ভালো।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

২। ভগবানকে কীভাবে বর্ণনা করা যায়?

পাঁচ-সাতটি মেয়ে একসঙ্গে খেলাধূলো করে, হাসি-ঠাট্টা গল্পগুজব করে। পরম বন্ধু তারা। একদিন একটি মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের পর বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হতে তারা জিজ্ঞাসা করল ঃ হ্যাঁ ভাই, স্বামী কেমন জিনিস বল্‌না।" যার বিয়ে হয়েছে সে বন্ধুদের কথা শুনে হাসতে হাসতে বলল ঃ "সে তো আমি মুখে বলে বোঝাতে পারব না ভাই। তোদের বিয়ে হোক, তখন তোরাও বুঝবি স্বামী কী, আর তাকে পেলে কেমন লাগে।" ঠিক তেমনি, জগতের স্বামী ভগবানকে যখন কেউ লাভ করে, তখন সে তাঁর কথা মুখে বলে বোঝাতে পারে না। তাকে জিজ্ঞাসা করলেও সে বলবে ঃ "ভাই, তাঁর কথা বলে বোঝানো তো সম্ভব নয়! তোমরা নিজেরা ভগবানকে লাভ করো, তাহলে তাঁর বিষয়ে জানতে পারবে।" এইজন্যই বলা হয় ভগবান অনির্বচনীয়, বাক্যের অতীত তিনি, ভাষায় তাঁকে প্রকাশ করা যায় না।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

ভগবান কোথায় থাকেন? তিনি থাকেন সকলের হৃদয়ে। আপন হৃদয়ে ডুব দিয়ে ডাকতে পারলেই তাঁকে পাওয়া যায়। তিনি কী খান? মানুষের অভিমানকে খান। মানুষের দর্পকে এইভাবে নাশ করেন বলে তাঁর নাম দর্পহারী। তিনি কোন্ কাজ করেন? রাজাকে গোলাম বানান আর গোলামকে রাজা করেন। কাজীকে করেন পাজী, পাজীকে করেন কাজী। তাই ভগবান শংকরের একটি নাম 'ভাঙ-গড়', একদিকে ভাঙেন, একদিকে গড়েন। ভগবান হাসেন কখন? মানুষের বেইমানী দেখে হাসেন। মানুষ কী রকম বেইমান দেখো! বলে, আমার ছেলে, আমার মেয়ে, আমার ধন, আমার দৌলত, ঘর-বাড়ি যা-কিছু সব আমার। ছেলেকে বলছে আমার, তবে সকলের ছেলে হয় না কেন? অনেক স্ত্রী তো বন্ধ্যা হয়ে থাকে। আসল কথা যা-কিছু মেলে সব ভগবানেরই দান, তিনি দিলে তবেই হয়। মানুষ সেকথা মানতে চায় না।

৩। তিনি সাকার না নিরাকার, সগুণ না নির্গুণ?

তিনি সাকারও বটে, নিরাকারও বটে। ভক্ত যেভাবে ভগবানকে গড়বে, ভগবানও সেইভাবেই তার কাছে ধরা দেবেন। ভগবান হলেন নিরাকার, ভক্ত তাঁর আকার গড়ে নেয়। এই নিরাকার কে বলতে পারো নীর-আকার অর্থাৎ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জলের আকার। জলের নিজস্ব কোন আকার নেই, যে পাত্রে রাখবে, জল সেই পাত্রের আকারই ধারণ করবে। গোলাকৃতি পুকুরে জলকে গোল দেখাবে, চৌকো পুকুরে চৌকো দেখাবে। আধার অনুসারে জলের আকৃতির পরিবর্তন হয়! নীর-আকার ভগবানেরও এই হল রীতি। ভক্তের হৃদয়ে ভগবান বাস করেন, ভক্তের হৃদয়েই হল তাঁর আধার। ভক্তের হৃদয় যেভাবে ভাবিত হবে, ভগবানও তার হৃদয়ে সেভাবে ধরা দেবেন। যদি তোমার মন সাকাররূপে তাঁকে পেতে চায়, তিনি তোমার জন্যে সাকাররূপ ধারণ করবেন। আর যদি নিরাকার চাও তিনিও তোমার জন্যে নিরাকার হবেন। গাছে একটা পাখি ডাকছে। চারজন পথিক সেই পাখির ডাকের চার রকম মানে করল। মুসলমান পথিক ভাবল পাখি বলছে 'সোভান তেরি কুদরৎ', বৈষ্ণব শুনল 'রাম লক্ষ্মণ দশরথঃ, মালির মনে হল পাখি বলছে 'পিঁয়াজ লশুন আদরক্' আর পালোয়ান পাখির ডাকের মানে করল 'দণ্ড মুদগর কসরত্'। যার যেমন মনের ভাব, সে সেভাবেই শুনতে পেল ঐ একই পাখির ডাক। তেমনি, ভগবান সাকার না নিরাকার, সগুণ না নির্গুণ, রাম না রহিম, তা কেউ নিশ্চয় করে বলতে পারে না। সাধকের মনের ভাব যে রকম হবে, ভগবানকে সেভাবেই পাবে। গাছে রয়েছে গিরগিটি, তাকে কেউ দেখছে লাল, কেউ দেখছে নীল, কেউ হলদে, কেউ বা সাদা আর এই নিয়েই যত মতবিরোধ, যত দলাদলিতে মানুষ মেতে ওঠে। সবাই বলে আমার দেখাটাই ঠিক। কিন্তু গাছতলাতে সব সময় যে বসে থাকে, সে জানে যে গিরগিটি ক্ষণে ক্ষণে রঙ বদলায়। সেই একই গিরগিটি বিভিন্ন রূপে দেখা দেয়! ভগবানকেও তেমনি কেউ বলে সাকার, কেউ বলে নিরাকার। তাঁকে কেউ বলে ব্রহ্ম, কেউ বলে আত্মা, কেউ বলে সগুণ, কেউ বলে নির্গুণ। ভগবানকে উপলক্ষ্য করে মানুষ এইভাবে অনবরত লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ভগবানকে যাঁরা লাভ করেছেন, ভগবানের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছেন, তাঁরা জানেন যে সর্বব্যাপী, সর্বরূপী, সকল সকল রূপের মাঝে তিনিই বিরাজ করছেন, তাঁকে বাদ দিয়ে কিছুই থাকতে পারে না। রাস্তাতেই তাই যত বিবাদবিসংবাদ, একবার গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারলে আর কোনো দ্বন্দ্ব থাকে না।

৪। ভগবানকে লাভ করবার উপায় কী?

তাঁকে লাভ করবার কতরকমের উপায়ের কথা শাস্ত্রে ঋষিরা বলে গিয়েছেন। তার মধ্যে কোনোটা সুগম, কোনোটা বা দুর্গম। কিন্তু সবচেয়ে সোজা পথ হল তাঁর শরণাপন্ন হওয়া। সকলেরই এই শরণাগতির পথে চলবার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অধিকার আছে, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই এই শরণাগতির পথ অবলম্বন করে তাঁকে লাভ করতে পারে। কিন্তু তাঁর জন্য কাঁদতে হবে, না কাঁদলে তিনি ধরা দেন না। শিশুটি যতক্ষণ পর্যন্ত না কাঁদছে ততক্ষণ মা তাকে স্তন্যপান করান না। বলেন, বেশ তো আপন মনে খেলা করছে, এখন খেলা করুক। সে চুপচাপ ঘুমিয়ে থাকলেও তিনি তাকে ঘুম থেকে তোলেন না! কিন্তু যেই সে কান্না জুড়ে দেয় অমনি মা আর স্থির থাকতে পারেন না, সব কাজ ফেলে ছুটে এসে তাকে বুকে তুলে নেন। আমরা দিন-রাত সংসার নিয়ে ভুলে থাকি, মায়ের কথা একবারও মনে পড়ে না! তিনিও তাই তাঁর বিশ্বকাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। ভগবানকে পেতে হলে, বিশ্বজননীকে পেতে হলে তাই শিশুর মতো আকুল হয়ে কাঁদতে হয়, নইলে তাঁকে পাওয়া যায় না।

আবার একথাও ঠিক যে আমাদের কখন কী প্রয়োজন তা তিনি জানেন এবং আগে থেকেই সব কিছু ব্যবস্থা করে রাখেন, যেমন আমরা জন্মাবার আগেই আমাদের জন্যে তিনি মায়ের বুকে দুধের ব্যবস্থা করে দেন। তাঁর জন্যে কাঁদতে হবে এ-ও যেমন একটা মত, তাঁর কাছে কিছু চাইতে হয় না। তিনি প্রয়োজন বুঝে নিজেই ধরা দেন, এও তেমনি একটা মত। শাস্ত্রকারেরা এই ভাবে নানারকম মত যে দিয়েছেন তার কারণ কী? এর কারণ হল মানুষ নানারকম ভাব নিয়ে থাকে। সকলের তো একই রকম ভাব ভালো লাগে না। কেউ তেতো খেতে ভালোবাসে, কেউ ভালবাসে ঝাল খেতে, আবার কেউ মিষ্টি খেতে পছন্দ করে! এইজন্যই শাস্ত্রকারেরা নানারকম পথ বাতলে দিয়েছেন। যে যেমন অধিকারী, তার কাছে সেইরকম কথা বলতে হয়।

ভগবান হলেন কল্পতরু। কল্পতরুর নিচে বসে যে যা ভাবনা করে, যা-কিছু চায়, সমস্তই সঙ্গে সঙ্গে তার মিলে যায়। তুমি তো সেই কল্পতরুর তলাতেই বসে আছ। এখন তুমি যদি ভূতকে চাও, ভূতকে পাবে আর যদি ভাগবানকে চাও তো তাঁকেই পাবে। তাই আগে তোমার ভগবানটাকে শুদ্ধ করো। ভগবান আছেন। এই বোধ যদি তোমার দৃঢ় হয় এবং তাঁকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা যদি সত্য হয়, তাহলে ভগবানও তোমার কাছে সত্য হয়ে উঠবেন। তাই বলা হয়, 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী'।

শাস্ত্র বলছেন তিনি 'হস্তামলকবৎ' অর্থাৎ হাতের মুঠোর মধ্যে যেন আমলকী রয়েছে! তেমনি তিনিও রয়েছেন তোমারই মধ্যে। আর যদি তুমি মনে করো যে তিনি দূরে রয়েছেন, তাতেও কোনো ক্ষতি নেই। ভালোবাসার টানে দূর নিকট হয়, তিনি দূরে থাকলেও ভালোবাসা দিয়েই তাঁকে লাভ করা যায়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

একটি দোঁহা আছে ঃ

জলমে বৈঠে কমলিনী সূর্য বৈঠে আকাশ।
জো জিসকো হৃদয়মে বৈঠে ওহী উসীকে পাস।।

ভালোবাসার কী সুন্দর এক দৃষ্টান্ত! সরোবরে রয়েছে পদ্মফুল আর কোথায় দূর আকাশে রয়েছে সূর্য। সূর্যের প্রতি পদ্মের কী মধুর ভালোবাসা! সূর্যোদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পদ্ম তার সমস্ত পাপড়ি মেলে ফুটে ওঠে আর সূর্য অস্ত গেলেই তার পাপড়িগুলি আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যায়। ভালোবাসা কোনো দূরত্ব মানে না। যে ভালোবাসতে জানে তার প্রেমের পাত্র যতদূরেই থাকুক না কেন, তার প্রতি আকর্ষণ, তার প্রতি ভালোবাসা মুহূর্তের জন্যেও বিচ্ছিন্ন হয় না। ভগবানকে তুমি যদি সত্যিই ভালোবাসতে পারো, তিনি দূরে থাকলেও তাঁর নাম স্মরণ মাত্রেই তোমার হৃদয়পদ্ম আপনা থেকেই বিকশিত হয়ে উঠবে, তিনিও তোমার সেই হৃদয়পদ্ম আলো করে সেখানেই ধরা দেবেন।

৫। ভগবানকে কোথায় খুঁজতে হবে, কেমন করে খুঁজতে হবে?

কতশত মানুষ ভগবানকে খুঁজছে, কিন্তু কোথায় যে খুঁজতে হবে তা তারা জানে না। জানে না যে তাঁতে আর আমাতে কোনো ব্যবধান নেই, তিনি আর আমি অভেদ। এ যেন সেই মৃগনাভীর কস্তুরীর মতো। মৃগ জানে না যে তার মধ্যেই রয়েছে কস্তুরী আর সেই কস্তুরীর গন্ধে পাগল হয়ে সে বাইরে তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তেমনি ভগবানও তো রয়েছেন তোমার হৃদয়েই। সেইখানেই তাঁর খোঁজ করো।

তুমি হয়তো বলবে ভগবান সর্বব্যাপী, অত বড়ো যিনি, আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয়ে কী করে তাঁর স্থান হবে? দেখো, তাঁর এই বিরাট রূপে তুমি তো তাঁকে ধরতে পারবে না। বিরাটও তিনি, ক্ষুদ্রও তিনি। সেই ক্ষুদ্র ভাবেই তাঁকে ধরতে হবে। জলের একটি বিন্দুর মধ্যে সূর্য্য যেমন করে ধরা দেয়, তেমনিভাবে ভগবানও ধরা দেবেন তোমার হৃদয়ে। যিনি সর্বরূপ, তিনি কি বিশ্বরূপ গ্রহণ করতে পারেন না?

ভগবান সর্বশক্তিমান, তিনি সবকিছুই করতে পারেন সন্দেহ নেই। কিন্তু একটা জিনিস তিনি কিছুতেই করতে পারেন না, আমার কাছ থেকে তিনি নিজেকে আলাদা করে রাখতে পারেন না, সে সামর্থ্য তাঁর নেই। তাই তাঁকে একথা বলা নিরর্থক যে তুমি আমার কাছ থেকে চলে যাও অথবা তোমার কাছ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

থেকে আমাকে দূরে সরে যেতে দাও। এ কখনোই হতে পারে না। ভগবান তো সর্বব্যাপী, সকল জায়গাতেই তো তিনি রয়েছেন। তাহলে আমাকে ছেড়ে তিনি যাবেনই বা কোথায় আর তাঁর কাছ থেকে আলাদা করে আমাকে রাখবার জায়গাই বা কোথায় পাবেন? তাই বলছি, ভগবান সবকিছু করতে পারলেও আমাকে তাঁর কাছ থেকে তফাৎ করতে পারেন না। মানুষ এই জায়গাটাতেই ভুল করে। সে ধারণা করতে পারে না যে ভগবান আমার কাছ থেকে দূরে নেই। ভগবান আর আমাতে যে মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে, এ কথাটা মানুষ বিশ্বাস করতে পারে না, তাই সে ভগবানের খোঁজে বাইরে ছোটাছুটি করতে থাকে।

সূর্যের প্রভাবে আমরা চারিদিককার দৃশ্য দেখতে পাই, কিন্তু সেকথা ভুলে গিয়ে আমরা ভাবি যে, আমাদের চোখের দৌলতেই বুঝি সবকিছু দেখছি। সূর্যাস্তের পর এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ রাত্রির অন্ধকারে ডুবে যায়, কিন্তু চোখ থাকা সত্ত্বেও তখন আমরা তা দেখতে পাইনে, এমনই সূর্যদেবের মহিমা। ভগবানের বেলাতেও এই কথাটা খাটে। ভগবান আছেন বলেই তুমি আছ, না থাকলে তুমিও থাকতে না! মৃতদেহ কেউ ঘরে রেখে দেয় না। আত্মীয় স্বজন বলবে, এতে প্রাণ নেই, দেহটাকে জ্বালিয়ে দাও, পুড়িয়ে ফেলো, আত্মার অস্তিত্বেই তোমার অস্তিত্ব, আত্মা বা ভগবানকে ছেড়ে তোমার আলাদা কোনো অস্তিত্ব নেই। ভগবান আর তুমি আলাদা নও। তাইতো বলি ভগবানকে বাইরে কোথায় খুঁজে বেড়াচ্ছ? তিনি যে তোমার ভিতরেই রয়েছেন, তাঁরই সত্তার উপর তোমার সত্তা নির্ভর করছে। তাই বাইরে বাইরে তাঁকে খুঁজে বেড়িয়ো না, আপন হৃদয়ের গভীরে ডুব দিয়ে সেখানেই তাঁর সন্ধান করো।

তাঁকে খোঁজার আগে তুমি নিজেকেই একবার খুঁজে দেখো না। নিজের সন্ধান পেলে তাঁকেও তুমি পেয়ে যাবে। নিজেকে প্রশ্ন করতে থাকে, তুমি কে? কোথা থেকে এসেছ? যাবে কোথায়? নিজের বলতে তোমার কী আছে? তোমার কর্তব্য কী? এইভাবে প্রশ্ন করতে করতেই তুমি নিজেকে খুঁজে পাবে। প্রথমেই খোঁজ করে দেখো তুমি কে? তুমি বলতে পারো, আমি রাম, আমি শ্যামের ছেলে। কিন্তু এ তো হল তোমার বাইরের পরিচয়। ওতে চলবে না, আসল কথা, তুমি নিজেই জানো না তুমি কে? তুমি হয়তো বলবে, আমি হলাম আমি। আরে বাবা, না হয় বুঝলাম যে তুমি তুমিই। কিন্তু এই তুমিটি যে কে তা তো বোঝা গেল না। এই শরীরটাই কি তুমি? তা তো নয়, লোকে বলে 'আমার শরীর', 'আমি শরীর' কেউ বলে না। প্রাণ বা মনও তুমি নও, কারণ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তুমি বলো 'আমার প্রাণ', 'আমার মন', আমার বলবার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে হবে যে 'আমি' হলাম আমার সমস্ত কিছু থেকে আলাদা স্বতন্ত্র সত্তা। দেহ, মন, যা-কিছু সব আমার, আমি কিন্তু ওসব নই। সেই যে আমি, তাকেই খুঁজে বের করতে হবে। নেতি, নেতি, অর্থাৎ আমি এ নয়, ও নয়, এইভাবে বিচার করে যাও। দেখবে শেষে আর কিছুই থাকবে না। কিছুই নেই, একথা তোমার নিজের ভিতর থেকে যে জানিয়ে দিচ্ছে, সেই সাক্ষীই হল তোমার আমি। তাকে ধরতে পারলেই ভগবানকে পেয়ে যাবে, কারণ এই আমিও যা, ভগবানও তাই। আর তখনই বুঝতে পারবে জীব আর ব্রহ্ম অভেদ! কিন্তু এ হল বিচারের পথ, জ্ঞানের পথ, বড়ো কঠিন এই পথ। তবে জ্ঞান বা ভক্তি, যে পথেই যাও না কেন, তাঁকে খুঁজতে হবে কিন্তু নিজেরই হৃদয়ের অন্তস্থলে।

প্রতিপদের চাঁদকে দেখে যেমন পূর্ণিমার চাঁদ সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যায়, তেমনি ভগবানের এক কণা দেখে তাঁর পরিপূর্ণ রূপের ধারণা করতে হয়। বিলেত থেকে যে কাপড় আসে তার এক টুকরো নমুনা দেখেই খদ্দের বুঝতে পারে কাপড়টা কেমন হবে। ভগবানের একটি কণা থেকেই এই বিশাল বিশ্বজগতের সৃষ্টি হয়েছে। এই সৃষ্টিকে দেখো। মনের মধ্যে ডুব দিয়ে একবার চিন্তা করে দেখো দেখি সৃষ্টি, স্থিতি, লয় কী আশ্চর্যভাবে ঘটে চলেছে। একবার হিমালয় পর্বতের দিকে চেয়ে দেখো, সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে একবার সমুদ্রকে লক্ষ্য করো। তখন বুঝতে পারবে, যাঁর এক কণা থেকে এইসব প্রকাশ পেয়েছে, সেই সৃষ্টির মালিকের কী বিপুল মহিমা। তিনি তো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নন। তোমার অনুভূতিতে তিনি প্রকাশ পাবেন।

৬। ভগবানকে আমরা লাভ করতে পারিনে কেন?

এক ব্রহ্ম বহু হয়েছেন। কেন বহু হয়েছেন? একা একা তো খেলা চলে না। তাই নিজেকে তিনি বহুরূপে সৃষ্টি করলেন। চোর চোর খেলায় যে বুড়িকে ছুঁয়ে দিতে পারে তাকে আর চোর হতে হয় না। সবাই যদি বুড়িকে ছুঁয়ে দেয় তাহলে খেলা চলবে কী করে? সেইরকম সকলেই যদি ভগবানকে চিনে নিতে পারে তাহলে তারা সবাই তো ভগবানে লীন হয়ে যাবে। এখানে রইবে কে? তিনি খেলবেন কাকে নিয়ে? তাই বুড়িরূপী ভগবান সহজে কাউকে ধরা দেন না। তবে এখানে একটা কথা বলবার আছে। সরল হৃদয় যাদের, তাদের ভগবান শীঘ্র ধরা দেন। বৃন্দাবনের গোপ-গোপীদের ছিল সরল অন্তঃকরণ, তাই ভগবান

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাদের কাছে নিজেকে ধরা দিয়েছিলেন।

অনেকে আমার কাছে এসে বলে, ভগবানকে এত ডাকি, তবু তাঁকে পাইনে কেন? আমি বলি, তুমি ছুঁচ দান করবে আর তার বদলে কাপড়ের আশা করবে, তাকি কখনো হয়? তুমি আশা করছ ভগবানকে লাভ করবে, কিন্তু আগে তুমি যদি তাঁর না হও, তিনিই বা তোমার হতে যাবেন কেন? তুমি যদি নিজেকে ভগবানের কাছে বিলিয়ে দিতে পারো, তাহলে তিনিও তোমার কাছে ধরা দেবেন। দু-চারবার ভগবানের নাম নিলাম আর তাঁকে পেয়ে গেলাম, তা তো ভাই হবার নয়। ভগবান দুনিয়ার মালিক, কোন জিনিসেরই তাঁর অভাব নেই। অভাব শুধু একটি জিনিসের, তা হল প্রেম। তিনি যে প্রেমের কাঙাল্। কিন্তু প্রেম তো কেউ তাঁকে দেয় না, তাই কেউ তাঁকে পায় না। তাঁকে প্রেমের বাঁধনে বাঁধতে পারলেই যে তিনি ধরা দেন। 'বিনা প্রেমসে ন মিলে নন্দলালা'।

ভগবান তো কোথাও চলে যাননি, তিনি সবকিছুর মধ্যেই বিরাজ করছেন। মানুষ তাঁকে দেখতে পায় না। কারণ ভগবানের বিভূতি দেখেই তারা মুগ্ধ হয়ে যায় আর তাই তাঁকে ছেড়ে তাঁর বিভূতি নিয়েই মত্ত থাকে। ভগবান রাজরাজেশ্বর। এই সংসারের তিনি এক বাজার বসিয়ে দিয়েছেন। ধনদৌলত, বিষয়-আশয়, স্ত্রী-পুত্র পরিবার, মান-সম্ভ্রম, কতরকম জিনিসই না তিনি এই বাজারে ছড়িয়ে রেখেছেন। মানুষ এইসব নিয়েই মেতে থাকে, ভগবানের দিকে দৃষ্টি ফেরাবার কথা তার আর মনে থাকে না। তবে মানুষের মধ্যে যারা চালাক-চতুর, তাদের কিন্তু বাজারে এইসব জিনিসপত্রের প্রতি আসক্তি নেই। তাদের একমাত্র লক্ষ্য থাকে ভগবানের দিকে। তাদের একমাত্র চেষ্টা কীভাবে ভগবানকে লাভ করা যায়, কারণ তারা জানে যে একবার যদি রাজাকে আপন করে নিতে পারে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে রাজার সমস্ত ঐশ্বর্য তাদের করতলগত হবে। তাই ভগবানকে লাভ করতে হলে তাঁর বিভূতির দিকে ফিরেও চেয়ো না, সাংসারিক সমৃদ্ধি নিয়ে মশগুল হয়ে থেকো না, তোমার যা-কিছু বাসনা-কামনা সব তাঁকে পাওয়ার কাজে নিযুক্ত করে দাও। তাহলেই তাঁর সন্ধান মিলবে। মানুষের যত বাসনা-কামনা, সবই হল এইসব বিভূতির জন্যে, সাংসারিক সমৃদ্ধির জন্যে। তাই তাদের বিভূতিই মেলে, ভগবান মেলে না।

চোখে কাজল দিলে সে-কাজল চোখেই থাকে, অথচ চোখ তা দেখতে পায় না। ভগবানও আমাদের মধ্যে মিশে একাকার হয়ে রয়েছেন। এত কাছে রয়েছেন বলেই আমরা তাঁকে দেখতে পাইনে। চোখের কাজল দেখতে হলে কী করতে হয়? একখানা পরিষ্কার আয়না সামনে ধরতে হয়, সেই আয়নার মধ্যেই কাজলকে দেখা যায়। তেমনি আমাদের চিত্তকে যদি স্বচ্ছ করতে পারি, শুদ্ধ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করতে পারি, তাহলে সেই বিশুদ্ধ চিত্তদর্পণে ভগবানকে আমরা দেখতে পাব। কিন্তু চিত্ত শুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত মানুষ কখনোই ভগবানকে জানতে পারে না। জগৎ-সংসারের সর্বত্রই তো ভগবান ওতপ্রোতভাবে মিশে রয়েছেন, কিন্তু তা বুঝবার সামর্থ্য সকলের থাকে না। চিত্তের ময়লা যদি সম্পূর্ণরূপে দূর করা যায়, তবেই তাঁকে দেখবার, তাঁকে জানবার সামর্থ্য আসবে, নইলে নয়। রজ তম দূর হয়ে চিত্ত যখন শুদ্ধ সত্ত্বভাবে ভরে উঠবে, তখনই জগতের সর্বত্র ভগবানের উপস্থিতি সাধক অনুভব করতে পারবে।

যদিও শাস্ত্র বলেছেন তিনি 'অবাঙ্‌মনসগোচরম্' অর্থাৎ বাক্য ও মনের অতীত তিনি, তবু একথাও তো শাস্ত্র বলেছেন যে তিনি 'বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্'। তিনি ইন্দ্রিয়ের অতীত হলেও ইন্দ্রিয় দিয়ে তাঁকে জানা না গেলেও তিনি শুদ্ধবুদ্ধিতে প্রতিভাত হন। আমাদের এই মলিন বুদ্ধির শুদ্ধি হয় না বলেই আমরা তাঁর দর্শনলাভে বঞ্চিত হই।

সাধন-ভজন যারা করে, তাদের মধ্যেও অনেকে এই প্রশ্ন করে, এত সাধন-ভজন করেও তাঁর দেখা মেলে না কেন? তাদের বলি, তোমার সাধন ভজনে কিছু গলদ আছে। তোমার মধ্যে শুদ্ধ সত্ত্বভাব যতক্ষণ না ফুটছে, ততক্ষণ ভগবানের দেখা মিলবে না। তাই প্রথমেই সত্ত্বগুণকে বাড়িয়ে তুলতে হয়। সাত্ত্বিক আহারে যেমন সত্ত্বগুণ বাড়ে, তেমনি সত্ত্বগুণকে বাড়াতে হলে সাত্ত্বিক জিনিসপত্রও ব্যবহার করতে হয়। পট্টবস্ত্র পরে ধূপ দীপ ফুল চন্দন সংগ্রহ করলেই মনে হবে, যাই কোনো মন্দিরে গিয়ে দেবতার পুজো করে আসি। আবার মিহি ধুতি পরে, গায়ে বিলিতি সেন্ট মেখে দেখো, তখনই থিয়েটারে যাবার জন্য মন ছটফট করবে আর নয়ত টপ্পা গাইতে ইচ্ছে হবে। শৌখিন পোশাকে ভগবানের আরাধনায় মন বসে না। এই কারণেই সব সময় সাত্ত্বিক জিনিসপত্র ব্যবহার করা উচিত। মুমুক্ষু যারা, আহার-ব্যবহারে তাদের সাত্ত্বিক হতে হবে, সাত্ত্বিকের চাপরাশ না নিলে ভগবানের দেখা মিলবে না।

৭। ভগবান কি আমাদের ডাক শুনতে পান?

ডাকার মতো ডাকলে তিনি ঠিক শুনতে পান। পিঁপড়ের ডাকও যাঁর কানে পৌঁছয়, তিনি তোমার ডাক শুনতে পাবেন না তা কি কখনো হয়? তাঁর সঙ্গে যে আমাদের বিনা তারের টেলিগ্রাফের সংযোগ রয়েছে। মনে মনে একবার তাঁকে স্মরণ করো, অমনি তিনি তা জানতে পারবেন। তুমি তা জানো না, তাই আমার কথায় তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না। কিন্তু আমি বলছি, এ তুমি নিঃসন্দেহে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মেনে নিতে পারো। যাতে তোমার বিশ্বাস হয় তার জন্যে আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি শোনো। দেখো, মানুষে মানুষেও ঐরকম বিনা তারের টেলিগ্রাফের চালাচালি হয়। তুমি হয়তো মনে মনে একজনের কথা চিন্তা করছ। সে যত দূরেই থাকুক না কেন, তখনই তোমার কথা তার মনে পড়ে যাবে। যার সঙ্গে তোমার বনিবনা নেই, যাকে তুমি ভালোবাসো না, সে যত নিকট আত্মীয়ই হোক না কেন, সে কখনোই তোমার আপন হতে পারে না, সে পরই থেকে যায়। কিন্তু ভগবান যে তোমার সবচেয়ে আপনার জন। তাঁর কাছে তোমার ডাক পৌঁছবেই পৌঁছবে। এই বিনা তারের টেলিগ্রাফের ব্যাপারটা তুমি নিজেই পরখ করে দেখতে পারো। কারুর কথা তুমি গভীরভাবে চিন্তা করতে থাকো, তোমার সেই চিন্তা ঠিক তার কাছে পৌঁছে যাবে। তুমি পরে তার কাছে জিজ্ঞাসা করে দেখো, তাহলেই তোমার বিশ্বাস দৃঢ় হবে।

৮। ভগবানের সঙ্গে মানুষের কী সম্বন্ধ?

ভগবান আমাদের সবচেয়ে আপন জন, তাঁর সঙ্গে আমাদের প্রেমের সম্বন্ধ। মানুষমাত্রেই তাঁকে ভালোবাসতে পারে। স্ত্রী, পুরুষ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শুদ্র, কারুর পক্ষেই তাঁকে ভালোবাসতে বাধা নেই মানা নেই। যাজ্ঞ-যজ্ঞ, হোম, বেদ-অধ্যায়নের অধিকার সকলের থাকে না, কিন্তু প্রেমের সঙ্গে ভগবানকে ডাকবার অধিকার জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলেরই রয়েছে। গুহক ছিল চণ্ডাল তা সত্ত্বেও প্রেমের টানে সে শ্রীরামচন্দ্রকে বন্ধুরূপে লাভ করেছিল। ভগবানের কাছে সবাই সমান, উচ্চ-নীচ বলে কোনো ভেদ তাঁর কাছে নেই। প্রেমের সঙ্গে যে তাঁকে ডাকে, তিনি তারই একান্ত আপন হয়ে যান।

ভক্তিশাস্ত্রে এই প্রেমকে পাঁচ ভাবে ভাগ করা হয়েছে। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। এই পাঁচটি ভাবে মানুষ ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারে। শান্ত প্রেম কেমন? না, পিতার প্রতি পুত্রের যে প্রেম, রাজার প্রতি প্রজার যে প্রেম, গুরুর প্রতি শিষ্যের যে প্রেম, সেই প্রেমকেই বলা হয় শান্ত প্রেম। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি উদ্ধবের প্রেম বা ভগবানের প্রতি যোগী-ঋষিদের প্রেম এই শান্ত ভাবের অন্তর্ভুক্ত।

দাস্য প্রেম কীরকম? না, প্রভুর প্রতি ভৃত্যের যে ভালবাসা, তাকে বলে দাস্য প্রেম। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নারদের ছিল এই দাস্য ভাব। হে ভগবান, তুমি আমার প্রভু, আমি তোমার দাস, এই 'দাসোহম্' ভাবটি বড়ো সুন্দর। এই ভাবে ভাবিত হয়েই নারদ জীবন্মুক্ত হয়েছিলেন, তাঁর সমস্ত হৃদয় একেবারে মধুময়

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হয়ে গিয়েছিল। আমি তাই সবাইকে বলি তোমরা ম্যানেজার হয়ে যাও। মায়েদের বলি, সংসারে তোমরা দাসী হয়ে থাকো। কেউ যেন সংসারে মালিক সেজে বোসো না, মালিক একমাত্র ভগবান, তোমরা তাঁর দাস-দাসী।

সখ্য প্রেম কাকে বলে? সখা বা বন্ধুর প্রতি বন্ধুর যে ভালবাসা, তাই হল সখ্য প্রেম। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ব্রজবালকদের এই সম্বন্ধ ছিল। অর্জুনও এই সখ্যপ্রেমে ভগবানকে আপন করে নিয়েছিলেন।

ছেলের প্রতি পিতামাতার যে ভালোবাসা তাকে বলা হয় বাৎসল্য প্রেম। বাৎসল্য ভাবের পরাকাষ্ঠা হল শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পিতা নন্দ ও মা যশোদার ভালোবাসা।

স্বামী ও স্ত্রীর ভালোবাসাকে বলে মধুর প্রেম। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজবালিকাদের এবং রুক্মিণী ও অন্যান্য মহিষীদের এই মধুর ভাবের সম্বন্ধ ছিল।

যে-কেউ ভক্তিমার্গের আশ্রয় নেবে, তাকেই এই পাঁচটি ভাবের একটাকে ধরে ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করতে হবে। তাঁর আরাধনা যে করবে, তার পক্ষে এই প্রেমের পথই হল সবচেয়ে সুগম পথ।

দাস্য ভাব কীরকম জানো মা? তোমার অধীনে যারা কাজকর্ম করে তুমি যেমন তাদের কাছ থেকে প্রতিটি পয়সার জমা-খরচ বুঝে নাও, তোমাকেও তেমনি ভগবানের কাছে সমস্ত জমা-খরচ বুঝিয়ে দিতে হবে। তুমি তোমার লোকজনকে যেমন মাইনে দিয়ে রেখেছ, ভগবানও তেমনি তোমাকে মাইনে দিয়ে রেখেছেন। তাঁর কাছ থেকে মাইনে বাবদ তুমি কী পাচ্ছ? অন্ন আর বস্ত্র, তাছাড়া আর কোনো কিছুতেই তোমার অধিকার নেই। তোমার লোকজন তোমার কোনো ক্ষতি করলে তুমি যেমন মাইনে কেটে নিয়ে তাদের দুঃখ দাও, ভগবান তোমার বেলাতেও সেই একই ব্যবস্থা করবেন। ধনদৌলত, বিষয়-সম্পত্তি সব ভগবানের, তুমি হলে কর্মচারী মাত্র। এইভাবে যদি থাকতে পারো তাহলে তোমার কোনো বন্ধন থাকবে না। মা, তোমার নিজের বলে কোনো জিনিসই নেই। তুমি যখন জন্মাওনি, তখনো এই এস্টেট ছিল, তুমি যখন থাকবে না, তখনো এই এস্টেট থাকবে। এই এস্টেট যদি তোমারই হত, তাহলে তোমার সঙ্গেই তা আসত যেত। তা তো হয় না। এস্টেট তোমার জন্মের আগেও ছিল, তোমার মৃত্যুর পরেও থাকবে। দুদিনের জন্যে তুমি 'আমার আমার' করছ আর নিজের বন্ধন সৃষ্টি করে চলেছ। প্রকৃতপক্ষে মালিক তো তুমি নও, মালিক তিনি, তুমি তাঁর দাসী হয়ে থাকো। তুমি প্রভু, আমি তোমার দাসী, তাঁর সঙ্গে এই সম্বন্ধ বজায় রেখে তুমি সংসারের কাজ করে যাও।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

৯। কলিকালে ভগবানকে কী সশরীরে দেখা যায়?

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তো কলিকালেই এসেছিলেন, কিন্তু সবাই কি তাঁকে চিনতে পেরেছিল? কেন পারেনি? পারেনি, তার কারণ হল চিত্তশুদ্ধির অভাব।

১০। জগতে এত দুঃখ-কষ্ট, তবে ভগবানকে মঙ্গলময় বলব কেন?

ভগবান মঙ্গলময়, তাঁর রাজ্যে কখনো অমঙ্গল হতে পারে না। তবে মানুষের ক্ষুদ্র দৃষ্টি, সে তাই সব ঘটনার মধ্যে মঙ্গল খুঁজে পায় না। প্রশ্ন উঠতে পারে, সকল ঘটনার মধ্যে মঙ্গল কীভাবে দেখা যাবে যখন দেখা যায় একমাত্র ছেলে উপার্জন করে, সেই উপার্জনে সে বৃদ্ধ পিতা-মাতা স্ত্রী-পুত্র কন্যাকে প্রতিপালন করে হঠাৎ সেই ছেলে মারা গেল। এতে কোন্ মঙ্গল সাধিত হল? স্থূল দৃষ্টিতে এতে কোন মঙ্গল আমরা দেখতে পাইনে সন্দেহ নেই। আমরা শুধু দেখি, সহায়-সম্বলহীন বৃদ্ধ পিতা-মাতা আর অসহায় স্ত্রী-পুত্র কন্যার খাওয়া-পরা কীভাবে চলবে তার কোনো ঠিকানা নেই তারা সবাই তো চরম দুঃখে নিমজ্জিত হল। এতে মঙ্গল কোথায়? ঠিক কথা, কিন্তু তবু এরই মধ্যে থেকে মঙ্গল খুঁজে বের করতে হবে। তার জন্যে চাই বিচার। ভেবে দেখো ঐ ছেলে যদি দীর্ঘকাল রোগশয্যায় পড়ে থাকত, তার রোজগার বন্ধ হয়ে যেত, রোগযন্ত্রণা যদি তার অসহ্য হয়ে উঠত, তাহলে তার চিকিৎসার খরচ বৃদ্ধ পিতা কোথা থেকে যোগাড় করত? খরচ যদি বা কোনোরকমে যোগাড় করল, তার অসহ্য রোগযন্ত্রণা সে দূর করত কেমন করে? ছেলের এই যন্ত্রণা তাকে মুখ বুজে সহ্য করতে হত, কোন প্রতিকার করা তার পক্ষে সম্ভব হত না আর তার ফলে বৃদ্ধ পিতা-মাতার দুঃখের আর অন্ত থাকত না। তাই মেনে নিতে হয় মঙ্গলময় ভগবান মাতৃরূপে এসে সমস্ত রোগযন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিয়ে তাকে তাঁর কোলে তুলে নিয়েছেন। তখন বলতে হয়, ভগবান, রোগের যন্ত্রণা থেকে তুমি তাকে মুক্তি দিয়েছ, তোমার কোলে আশ্রয় পেয়ে সে শান্তিলাভ করেছে। দেহে যখন জরা আসে, ব্যধি আসে, মঙ্গলময় ভগবান তখন তাকে নিজের কোলে তুলে নেন। এইভাবে বিচার করে সমস্ত দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও যদি ভগবানের মঙ্গলহস্তের স্পর্শ অনুভব করবার চেষ্টা করতে থাকো, তাহলে ভগবান যে মঙ্গলময়, তা একদিন বুঝতে পারবে। খোঁজ করেও যদি মঙ্গল দেখতে না পাও, তাতেও কোনো ক্ষতি নেই। শুধু অন্ধবিশ্বাসে মেনে নাও ভগবান মঙ্গলময়, তাঁর রাজ্যে অমঙ্গলের স্থান নেই। ভেবে নাও যে আমার দৃষ্টি ক্ষুদ্র, তাই আমি এর

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মধ্যে কোনো মঙ্গল দেখতে পাচ্ছিনে। ভগবান মঙ্গলময়, এই মহাবাক্য দৃঢ়ভাবে ধারণা করা চাই। তাতে মনের মধ্যে পরম শান্তি লাভ করা যায়। ধারণা দৃঢ় হলে, রোগ, শোক, দুঃখ, যা-ই আসুক না কেন, তোমার মন কিছুতেই আর চঞ্চল হবে না।

দুঃখের মধ্যেও মঙ্গল নিহিত আছে। দুঃখ মানুষের মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার করে। বৈরাগ্য থেকেই ভগবানের দিকে মানুষের মন যায়। সেইজন্যেই কুন্তীদেবী ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, 'হে ভগবান, আমাকে তুমি সুখে রেখো না, সুখ আমার চাইনে, সদাসর্বদা দুঃখই যেন আমাকে ঘিরে থাকে কারণ তাহলেই তোমার কথা সর্বদা আমার মনে পড়বে।'

এইভাবে দুঃখের ভিতর দিয়ে ভগবান যখন মানুষকে তাঁরই পানে আকর্ষণ করছেন, তখন তাঁকে মঙ্গলময় বলব না কেন?

১১। ভগবানের কি পক্ষপাতিত্ব দোষ আছে?

জগতে কেউ সুখী, কেউ দুঃখী। ভগবান কাউকে সবকিছু দুহাত ভরে দেন, কাউকে করেন নিঃস্ব। মনে হতে পারে এ বুঝি তাঁর পক্ষপাতিত্ব, কিন্তু একে পক্ষপাতিত্ব বলা চলে না। শাস্ত্র বলছেন, যে যেমন কর্ম করে, সে তেমনি ফল পায়। আগের জন্মে তুমি যেসব কর্ম করেছ, এই জন্মে সেই কর্মের অণুরূপ ফলই তুমি পাবে। সেইজন্যই দানব্রতর বিধি রয়েছে। পূর্বজন্মের দান এ জন্মের জন্যে পুঁজি হয়ে থাকে। বড়ো ব্যাঙ্কে যার এই সঞ্চয় রয়েছে, যে কোনো প্রকারে হোক, তার সমস্ত অভাব মিটে যায়। তুমি যে আজ এত টাকা রোজগার করছ তার কারণ কী? কারণ হল বড়ো ব্যাংকে তোমার যথেষ্ট পুঁজি রয়েছে। তা যদি না হত তাহলে সবাই তো তোমার মতো রোজগার করতে পারত। আগের জন্মের পুঁজি থেকেই এ জন্মে তোমার যা কিছু মিলছে, তাই এখন থেকে আবার কিছু পুঁজি জমাতে চেষ্টা করো, যাতে পরের জন্মে তোমাকে কোন কষ্ট পেতে না হয়।

তুমি অভাবে কষ্ট পাচ্ছ, কিন্তু তোমার অভাবের জন্য ভগবানকে দোষ দিয়ো না। ভগবান সর্বশক্তিমান, তিনি পরম দয়ালু, তিনি কি তোমার অভাব মেটাতে পারেন না? কিন্তু তিনি কি করবেন বলো? তিনি তো সবাইকে সবকিছু দেবেন বলে হাত বাড়িয়ে রয়েছেন, কিন্তু তাঁর দান তুমি নেবে কিসে? সে পাত্র তোমার কোথায়? বৃষ্টির জল সব জায়গাতেই পড়ে, কিন্তু সেই জল ধরে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রাখবার জন্যে উপযুক্ত পাত্র চাই। গঙ্গার ধারা বেয়ে চলেছে, গঙ্গাজল নেবে বলে কত লোক আসে মা গঙ্গার কাছে। কেউ আনে ঘড়া, সে ঘড়া ভরে জল নিয়ে যায়, কেউ জল নিয়ে যায় ঘটিতে করে। করুণাময়ী মা গঙ্গা কাউকে তো জল নিতে বারণ করেন নি, তবে যার যেমন পাত্র সে ততটুকুই জল নিতে পারে। কিন্তু যার কোন পাত্রই নেই, সে জল নেবে কিসে? উপযুক্ত পাত্র না হলে দাতা কিছুই দিতে পারেন না। ভগবানেরও তেমনি কারোর প্রতি কোনো পক্ষপাতিত্ব নেই। যে যেমন পাত্র, সে ততটুকুই তাঁর করুণা লাভ করতে পারে। তাঁর দান লাভ করতে হলে দুটি পাত্রের প্রয়োজন, ভক্তি আর বিশ্বাস। পাত্র দুটি কিন্তু পরিষ্কার হওয়া চাই। যত রাজ্যের আবর্জনা দিয়ে ভরে রাখলে ভালো জিনিস পেলেও তাতে রাখবার জায়গা হবে না, উপচে পড়ে যাবে। তোমার ভক্তি আর বিশ্বাসরূপ পাত্র দুটিকে মলিন করে রেখেছে মায়া আর অভিমান। করুণাময়ের করুণা লাভ করতে হলে তাই মায়া আর অভিমানকে ছাড়তে হবে।

একদিক দিয়ে দেখতে গেলে ভগবানের উপর পক্ষপাতিত্বের দোষ চাপানো ঠিক নয়। ভগবান নিজে নিষ্ক্রিয়, সুখ-দুঃখ কিছুই তিনি সৃস্টি করেন না, সেটা হল প্রকৃতির কাজ, প্রকৃতিই তাঁকে সক্রিয় করে তোলে। গীতায় ভগবান বলেছেন ঃ

> ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ!
> ন কর্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ততে।।

জীবের কর্তৃত্ব বা কর্ম ভগবান সৃষ্টি করেন না অথবা কর্মফলও সংযোগ করেন না। স্বভাবই কর্তৃত্বাদিরূপে প্রবর্তিত হয়ে মানুষকে কর্মে প্রবৃত্ত করে। দেখো ভাই, শাস্ত্র তো বলেছেন অবিদ্যাজনিত কর্ম দ্বারাই কর্মফলের সৃষ্টি হয় আর তা থেকেই সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়। ভগবান নিজের খুশিমতো কাউকে সুখী কাউকে দুঃখী করেননি, তাহলে তাঁর উপর পক্ষপাতিত্বের দোষ চাপাব কেন?

১২। ভগবানের সম্বন্ধে আলোচনায় রুচি হয় না কেন?

এর কারণ হল তোমাদের ডিসপেপসিয়া রোগ হয়েছে। তোমাদের এখন পাঁচন খেতে হবে, পাঁচন খেলে অরুচি রোগ সারবে। তবে পাঁচন তো তেতো, সহজে খেতে চাইবে না। তাই কোনোপ্রকারে বুঝিয়ে তোমাদের খাওয়াতে হবে। শাস্ত্রে তিন রকম বাক্যের কথা বলা হয়েছে—যথার্থ, রোচক আর ভয়ানক। যথার্থ বাক্য কাকে বলে? যেমন কোনো লোকের রোগ হয়েছে, ডাক্তার এসে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বলছে তুমি ওষুধ খেলে ভালো হয়ে যাবে। ডাক্তারের কথা শুনে রোগী ওষুধ খেয়ে নিল। সাধকদের ক্ষেত্রে যথার্থ বাক্য কীরকম? গুরুজন বলে দিলেন তুমি ত্রিতাপদগ্ধ সংসারে পড়ে আছ, তুমি ভগবানের শরণ নাও, তোমার ভবরোগ ছুটে যাবে। এ হল যথার্থ বাক্য।

রোচক বাক্য কী? যেমন তোমার রোগ হয়েছে, তোমাকে বলা হল ওষুধ খাও, রোগ ভালো হ'য়ে যাবে। তুমি এদিকে বলছ, যা তেতো ওষুধ, ও আমি খাব না! বুদ্ধিমান কবিরাজ তখন বলে, ভাই, তুমি ওষুধটা খেয়ে নাও, পরে তোমাকে আমি সন্দেশ খেতে দেব। সন্দেশের লোভে তুমি ওষুধ খেয়ে নিলে আর তাতেই তোমার অসুখ সেরে গেল। সাধকের ক্ষেত্রে রোচক বাক্য কীরকম? গুরুজন বললেন, ভাই, তুমি ভগবানের শরণ নাও, তোমার স্বর্গবাস হবে, সেখানে অমৃত খেতে পাবে, কত আরামে থাকবে সেখানে। সাধক তখন স্বর্গের লোভে ভগবানের নাম নেবে। এই হল রোচক বাক্য।

আর ভয়ানক বাক্য কীরকম? কোনো লোকের ম্যালেরিয়া হল। কুইনীন খেলেই রোগ সেরে যায়, কিন্তু তেতো বলে সে কুইনীন খাবে না। তখন কবিরাজ তাকে ভয় দেখায়, কুইনীন না খেলে তুমি মরে যাবে। মরার ভয়ে রোগী তখন কুইনীন খেয়ে নেয়। সাধকদের জন্য শাস্ত্রকাররা বললেন, ভগবানের শরণ নাও, নইলে তোমার নরকবাস হবে। নরকবাসের ভয়ে সাধক তখন ভগবানের শরণ নেয়। এ হল ভয়ানক বাক্য।

ভয়ে হোক, ভক্তিতে হোক, পাঁচন না খাওয়া পর্যন্ত তোমাদের ডিসপেপসিয়া রোগও সারবে না আর ভগবানে রুচিও হবে না। অরুচি সারাবার জন্যে যে পাঁচন, তার নাম কী? তার নাম সৎসঙ্গ। সৎসঙ্গ করলেই ডিসপেপসিয়া সেরে যাবে, ভগবানের নাম নিতে রুচি আসবে।

১৩। শুভকর্মেই যখন শুভ ফল মেলে, তখন ভগবানকে ডাকবার দরকার কী?

তোমার মতলবটা হল এই যে আমি শুভকাজ করে যাই, তাহলে তো শুভ ফল আপনা থেকেই মিলবে, তবে আর ভগবানকে ডাকি কেন? তোমার প্রশ্নের আমি এই উত্তর দিচ্ছি যে ভগবানকে ডাকাও তো এক শুভকাজ, এই শুভকাজ করলেও তো শুভ ফলই মিলবে, তবে বলছ কেন যে ভগবানকে ডাকব না?

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আত্মা

১। আত্মা কাকে বলে?

আত্মাকে বুঝতে হলে আগে স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর সম্বন্ধে ভালো করে জানা দরকার। শরীর তিন রকম—স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম, এই পঞ্চভূতের একত্র সংযোগের ফলে এই স্থূল শরীর উৎপন্ন হয়েছে। পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় আর পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় দিয়ে শরীরের সব কাজ নির্বাহ হয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ত্বক—এই পাঁচটি হল জ্ঞানেন্দ্রিয় আর বাক্, পাণি পাদ, পায়ু, উপস্থ—এই পাঁচটি হল কর্মেন্দ্রিয়। এই দশটি ইন্দ্রিয় নিয়ে স্থূল শরীর গঠিত। এই যে দশটি ইন্দ্রিয়, এদের সম্ভোগ করবার বিষয় হল শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ। এই পাঁচটি বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হয় আর তার ফলেই মানুষ সুখ-দুঃখ ভোগ করে। মানুষের যত অভাব, সব এই স্থূল শরীরে।

স্থূল শরীর থেকে সূক্ষ্ম শরীর শ্রেষ্ঠ। সূক্ষ্ম শরীর যে কেন শ্রেষ্ঠ তা আমি যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি। তোমার ইচ্ছে হল পদ্মফুল দিয়ে ইষ্টদেবের পূজো করতে, কিন্তু এই সময়ে তো পদ্মফুল মেলে না, হাজার চেষ্টা করলেও তুমি কোনখান থেকেই এখন পদ্মফুল যোগাড় করতে পারবে না। স্থূলভাবে পদ্মফুলের এই যে অভাব, এই অভাব সূক্ষ্মভাবে তোমার মিটে যেতে পারে। কেমন করে মিটবে? চোখ বুঁজে মনে মনে ভাবতে থাকো, তুমি যেন এক সুন্দর সরোবরে গিয়ে দেখলে চমৎকার সব পদ্মফুল ফুটে রয়েছে, সেই ফুল তুমি যেন তুলে এনেছ আর সেই পদ্মফুল তোমার ইষ্টদেবের চরণে অর্পণ করে তুমি যেন তাঁর পুজো করছ। এইভাবে সূক্ষ্মশরীরে স্থূল পদ্মফুলের অভাব তোমার দূর হয়ে গেল।

স্থূল পূজোর চেয়ে এই সূক্ষ্ম পুজোয় বেশি আনন্দ মেলে। কিন্তু তাই বলে সকলের পক্ষে স্থূল পুজো ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয়। স্থূল বস্তু যখন পাওয়া যায়,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তখন স্থূলভাবেই পুজো করা উচিত। যদি না মেলে, তখন মনে মনে সূক্ষ্ম বস্তু সংগ্রহ করে পুজো করতে হয়। স্থূল আর সূক্ষ্মে কিন্তু ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে। কখনো কখনো স্থূলভাব সূক্ষ্ম পৌঁছে যায়, আবার কখনো সূক্ষ্মভাব স্থূলেতে পৌঁছয়। এরও একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি দেখো। সূক্ষ্মভাবে অর্থাৎ মনে মনে ভেবে নাও তুমি তেঁতুল খাচ্ছ, অমনি দেখবে তোমার জিবে জল এসে গিয়েছে। তুমি তেঁতুল তো খাওনি, তবে তেঁতুল খাওয়ার ভাবনাতেই তোমার জিভে জল এল কেন? এর কারণ হল, সূক্ষ্মভাবে যেই তুমি তেঁতুলের কথা ভাবলে, অমনি সেই সূক্ষ্ম ভাবনার ক্রিয়া তোমার স্থূল দেহতে দেখা দিল, তোমার জিবে জল এসে গেল। সূক্ষ্মশরীরের ভাব স্থূল শরীরে ক্রিয়া করে। তেমনি স্থূল শরীরের ক্রিয়াও সূক্ষ্ম শরীরের অর্থাৎ মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। তবে স্থূল শরীর থেকে সূক্ষ্ম শরীর শ্রেষ্ঠ কারণ যা-কিছু অভাব, সব হয় এই স্থূল শরীরে। সূক্ষ্ম শরীরে কোনো অভাব নেই।

স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের পর কারণ শরীর। কারণ শরীরের উৎপত্তি অবিদ্যা থেকে। সাধককে তাই অবিদ্যার হাত থেকে রেহাই পেতে হবে। অবিদ্যাকে দূর করতে না পারলে কারণ শরীরকে হটানো যাবে না।

স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ—এই তিনের অতিরিক্তি হল আত্মা। অর্থাৎ এই তিন শরীরকে ছেড়ে দেবার পর যা রইল, সেই হল আত্মা। আত্মা স্থূল নয়, সূক্ষ্ম নয়, কারণ নয়। আত্মা 'অণোরনীয়ান্ মহতো মহীয়ান্', অণুর চেয়ে অণু, মহানের চেয়ে মহান।

স্থূল, সূক্ষ্ম কারণ—এই তিন অবস্থার যে সাক্ষী, তাকেই সৎ-চিৎ-আনন্দ-স্বরূপ আত্মা বলে জানবে। এই আত্মা তোমার বাল্যকাল, যৌবনকাল ও বৃদ্ধকাল—এই তিন অবস্থাকেই সাক্ষী হয়ে দেখে যাচ্ছে। বালক অবস্থায় তোমার মনের ভাব যেমন ছিল, শরীরের গঠন যেমন ছিল, যেসব কাজে মন ছিল, এখন এই যৌবনকালে তাদের কিছুই অবশিষ্ট নেই। তোমার সেই বাল্য অবস্থার সাক্ষী হয়ে রয়েছে আত্মা। এখন তোমার এই যুবা অবস্থায় তোমার শরীর, মন কর্মপদ্ধতি সবই বদলে গিয়েছে, সেই বাল্যকালের অবস্থায় এখন আর তুমি নেই, কিন্তু এখনো সেই আত্মাই সাক্ষী হয়ে তোমার এই যৌবন অবস্থাও দেখে যাচ্ছে। কিন্তু আত্মা তখন যেমন ছিল এখনো তেমনই আছে, তার কোনো পরিবর্তন হয়নি। মানুষ যখন বৃদ্ধ হয়, যখন তার শরীর শিথিল হয়ে পড়ে, দাঁত পড়ে যায়, চুলে পাক ধরে, তার কর্মপ্রচেষ্টা অন্যখাতে বইতে থাকে অর্থাৎ আগের থেকে তার এখনকার অবস্থা সম্পূর্ণরূপে যখন বদলে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যায়, তখন এই অবস্থাতেও আত্মা সাক্ষী হয়ে দেখতে থাকে। আত্মা কখনো বদলায় না, সাক্ষী হয়ে সে শুধু সকল অবস্থা দেখে যায়। ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের সাক্ষী হল আত্মা। এ যেন দেহলী দীপ বা ঘরের দরজার চৌকাঠে রাখা একটি প্রদীপ। প্রদীপের আলোয় ঘরের ভিতরটা যেমন দেখা যায়, তেমনি বাইরেটা দেখতেও কোনো অসুবিধা হয় না, আবার মাঝখানটাতেও আলো পড়ায় সেখানকারও সবকিছু নজরে পড়ে। আত্মার তেমনি দৃষ্টি রয়েছে সর্বত্র, সে সাক্ষী, সে দ্রষ্টা।

আত্মা সকল বস্তুর আধার, আত্মাই সকল বস্তুর আধেয়। আধার আর আধেয় কাকে বলে? যেমন গাছ আর তার ফল। গাছকে আশ্রয় করে ফল রয়েছে। এখানে গাছ হল আধার আর ফল আধেয়। তেমনি মাটি হল আধার আর আধেয় হল গাছ, কারণ গাছ রয়েছে মাটিকে আশ্রয় করে। কিন্তু পরমাত্মা আধার আর আধেয়, এই দুই রূপেই বিশ্বসংসারের বিরাজিত রয়েছেন, কারণ কোনো জিনিসই তো তিনি ছাড়া নয়। সাক্ষীরূপে তিনি সবকিছুতেই বিরাজমান।

এই আত্মতত্ত্বকে জানাই হল চরম সাধন। তাতেই মোক্ষ, তাতেই মুক্তি, তাতেই নির্বাণ, তাতেই কৈবল্যপ্রাপ্তি।

২। আত্মাকে কীভাবে জানা যায়?

দেহের মধ্যে এমন কোন্ শক্তি আছে যার দ্বারা দেহের সমস্ত কাজকর্ম নিষ্পন্ন হয়? যদি বলো চৈতন্যশক্তি, তোমার ঐ চৈতন্য অচৈতন্যের কথা আমি মানব না। ও তো চোখে দেখা যায় না। তবে হ্যাঁ, একটা শক্তিকে দেখা যায় বটে, তা হল প্রাণশক্তি। প্রাণশক্তিতেই দেহের সব কাজ চলছে। প্রাণবায়ু চলে গেলে আমার পক্ষে কোনো কাজ করা সম্ভব নয়। এই প্রাণই হল সূত্রআত্মা। প্রাণসূত্রেই আত্মাকে ধরা যায় অর্থাৎ আত্মাকে ধরবার সূত্র হল এই প্রাণ। তুমি হয়তো বলবে, প্রাণ সূত্র-আত্মা হতে পারে, কিন্তু স্বয়ং আত্মা তো নয়। তাহলে প্রশ্ন জাগতে পারে, ক্রমবিকাশের পথে প্রাণ বৃদ্ধি পেতে পেতেই কি আত্মায় পরিণত হবে? না, তা হবে না, কারণ প্রাণের বিকাশ যেমন দেখা যায়, তেমনি তার নাশও তো দেখতে পাওয়া যায়। একটি শিশু জন্মাল, তার প্রাণের বিকাশ ঘটল। কিন্তু শিশুটি মারা গেলে তার প্রাণও তো সেইসঙ্গে নাশ হয়ে গেল। তুমি বলছ, প্রাণশক্তির হ্রাসবৃদ্ধি বিজ্ঞান স্বীকার করে না। ভালো কথা, তবে মানুষ মরলে তার প্রাণশক্তি কোথায় যায়? অন্তত প্রাণশক্তির যে কিছু রূপান্তর ঘটে, সে কথাটা তো মানবে? আত্মা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কিন্তু সব অবস্থাতেই এক, তার কোনো রূপান্তর নেই।

আত্মা এমন কোনো জিনিস নয় যে আমি তোমার হাতে তুলে দিলাম আর তুমিও তা মুঠোর মধ্যে পুরে নিলে। আত্মা হল অনুভূতিসিদ্ধ, অনুভূতি না হলে আত্মাকে বোঝা যায় না। একদিন আত্মা সম্বন্ধে আমার কাছ থেকে উপদেশ শুনলে আর অমনি তোমার ধারণা জন্মে গেল, অনুভূতি এসে গেল তা হয় না। অনবরত এসব কথা শুনতে হবে, আলোচনা করতে হবে, তবেই আত্মা-অনাত্মা বিষয়ে তোমার ধারণা জন্মাতে পারে। সব সময় আত্মা সম্বন্ধে বিচার করতে হয় ধ্যান করতে হয়, তবেই ধারণা দৃঢ় হয়ে হৃদয়ে বসে যায়। যে সাধকের নিত্যানিত্য বোধ দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিষ্ঠা হয়েছে, জরা, ব্যধি, মৃত্যুতে সে কখনো বিচলিত হয় না। তবে উচ্চকোটির সাধক ভিন্ন নিম্নকোটির সাধকের পক্ষে এ অবস্থা লাভ করা দুরূহ ব্যাপার!

৩। দেহের সঙ্গে আত্মার সম্বন্ধ কী?

আমাদের এই স্থূল শরীর যেন একটা বাড়ি। বাড়ি আর বাড়ির মালিক যেমন এক নয়, তেমনি এই শরীর ও শরীরস্থ আত্মাও স্বতন্ত্র! বাড়ি যদি ভেঙে যায়, তাতে মালিকের গায়ে কোনো আঘাত লাগে না, বাড়িটা ভেঙে পড়বার সময় সে বাড়ি থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে সাক্ষী হয়ে ভাঙা বাড়ি দেখতে থাকে। বাড়ি হল দেহ আর মালিক হল আত্মা, যে সাক্ষী হয়ে সব দেখেছে।

শরীর থেকে আত্মা সম্পূর্ণ পৃথক্। শরীরে ব্যাধি দেখা দিলে, শরীর ভেঙে পড়লে, আত্মার তাতে কোনো ক্ষতি হয় না। এই দেহরূপী বাড়ি থেকে তুমি যদি সাক্ষীর মতো নিজেকে আলাদা করে নিতে পারো, তাহলে রোগ, শোক, যন্ত্রণা কিছুই বুঝতে পারবে না। রোগ এসেছে? আসতে দাও। জরা এসেছে ? আসতে দাও, মৃত্যু এসেছে? আসতে দাও। তোমার দৃঢ় ধারণা হওয়া চাই যে রোগ, জরা, মৃত্যু—এরা তো এসেছে শরীরে, আমাকে তো চেপে ধরেনি। আমি হলাম অজর অমর, আমার হ্রাস-বৃদ্ধি নেই। আমি জরা-ব্যাধি-মৃত্যুহীন আত্মা! গীতায় এই আত্মতত্ত্ব ভগবান বিশদভাবে শুনিয়েছেন অর্জুনকে:

অন্তবন্ত ইমো দেহ নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোহপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত।।

নিত্য, অবিনশ্বর ও অপরিমেয় আত্মার এই দেহগুলি অন্তবন্ত, নশ্বর। তাই দেহের নাশে আত্মার নাশ হয় না। আত্মা নিত্য, শরীরাদি অনিত্য, এই সার বাক্য গীতায় বহুভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সদ্‌গুরু

১। সদ্‌গুরুর শরণ অপরিহার্য কেন?

ধর্মের বিষয়ে যতরকম কথা থাকতে পারে, সবই যখন শাস্ত্রে লেখা আছে আর তা পড়ে নিলেই যখন সবকিছু জানা যায়, তখন গুরু করার দরকার কী? ভালো কথা। আচ্ছা বলো তো, ছেলেবেলায় তুমি যখন পড়াশুনো করতে তখন মাস্টারমশাই তোমাকে পড়া বলে দিতেন কিনা? শিক্ষকের কাছেই তোমাকে পড়াশুনো করতে হয়েছে, তাই না? কিন্তু পড়া বুঝতে শিক্ষকের দরকার হল কেন? বইয়েতে তো সমস্ত বর্ণ লেখাই ছিল, তবে বই দেখেই তোমার বর্ণপরিচয় হল না কেন? একজন তোমাকে বলে দিলেন এই বর্ণ হল 'ক', এই বর্ণ হল 'খ', তবেই তো তুমি একটি করে বর্ণগুলি চিনতে শিখলে। নিজে নিজে তো পড়তে শেখোনি। সাধারণ শিক্ষার জন্যে যেমন শিক্ষকের প্রয়োজন হয়, তেমনি ধর্মশিক্ষার জন্যেও শিক্ষকের প্রয়োজন। সেই শিক্ষক হলেন গুরু। শাস্ত্রের মধ্যে ধর্মবিষয়ে সবকিছুই তো লেখা আছে, কিন্তু তোমাকে সেসব কথা বুঝিয়ে দেবে কে? শাস্ত্র বাক্য বোঝা বড়ো কঠিন, সহজে কেউ তার মর্মার্থ উপলব্ধি করতে পারে না। যাঁর কাছে শাস্ত্রের মর্ম উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, একমাত্র তিনিই শাস্ত্রবাক্য বোঝাতে পারেন। সেইজন্য শাস্ত্রবেত্তা, ব্রহ্মবেত্তা, গুরুর প্রয়োজন।

শাস্ত্র পড়েই যে ধর্ম বা ভগবান সম্বন্ধে সবকিছু জেনে যাবে, সেটি হবার নয়। শাস্ত্র হল সমুদ্র। সমুদ্রের জল নোনতা, তা খাওয়া চলে না। সমুদ্রের ঐ নোনতা জল সূর্যদেব আকর্ষণ করে নেন। সেই জল বাষ্প হয়ে আকাশে উঠে গিয়ে আবার যখন বৃষ্টিরূপে পৃথিবীতে নেমে আসে, তখনই তা সুস্বাদু হয়, মানুষের খাওয়ার উপযোগী হয়। শাস্ত্রবাক্য বড়ো জটিল, সকলের পক্ষে তা আস্বাদন করা বা মর্মার্থ উপলব্ধি করা সহজসাধ্য নয়। সাধু-সন্তরাই শাস্ত্রের মর্মার্থ ঠিক ঠিক ধরতে পারেন। সূর্যরূপী এই মহাত্মাদের হৃদয়আকাশে শাস্ত্রের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বচনগুলি বাষ্পাকারে জমা হয়ে থাকে, মুমুক্ষুদের কল্যাণের জন্যে সেই বাষ্প উপদেশের আকারে আবার যখন তাঁদের মুখ থেকে নির্গত হয়, তখনই তো মিষ্টি লাগে অর্থাৎ তখনই তা সাধারণ মানুষের ধারণার উপযোগী হয় আর তাতেই তার প্রাণের পিপাসা মেটে। মানুষের ভাগ্য প্রসন্ন হলে সদ্‌গুরু মিলে যায়। গুরু সেই শাস্ত্রের কথাই বলে, তবে সেই কথাগুলো কোন্ কৌশলে জীবনে কাজে লাগানো যায় সেই কৌশলটি তিনি ধরিয়ে দেন, বুঝিয়ে দেন।

২। সদ্‌গুরুর কাছে শিষ্য কী লাভ করে?

সদ্‌গুরু শিষ্যের হাতে মুক্তি তো তুলে দেন না, তবে কী দেন? কিছুই না, শুধু তার যে 'জীবোহম্' ভ্রান্তি, সেই ভ্রান্তিকে তিনি দূর করে দেন। ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব করতে করতে মানুষ তার আপন স্বরূপ ভুলে যায়। তখন সে নিজেকে মায়ায় আবদ্ধ ক্ষুদ্র জীব বলেই মনে করে। সদ্‌গুরু তার সেই ভ্রমকে ভেঙে দেন। শিষ্যকে তিনি ভাল করে বুঝিয়ে দেন যে তুমি জীব নও, তুমি শিব, তুমি ইন্দ্রিয়ের দাস নও, তুমি শুদ্ধ মুক্ত আত্মা। নিজের কানে কলম গুঁজে রেখে সেকথা ভুলে গিয়ে মানুষ চারিদিকে সেই কলম খুঁজে বেড়াচ্ছে। অন্য একজন যেই তাকে বলল, আরে, তোমার কলম যে তোমার নিজের কানেই গুঁজে রেখেছ, অমনি তার হুঁশ হল যে সত্যিই তো কলম, যে তার নিজের কানেই গোঁজা রয়েছে। গুরুও তেমনি শিষ্যকে বুঝিয়ে দেন যে তোমার আত্মধন তো কেউ চুরি করে নিয়ে যায়নি, সে তোমার ভিতরেই রয়েছে, তুমি শুধু সেকথাটা ভুলে গিয়েছ। এইভাবে সদ্‌গুরু শিষ্যের কাছে তার স্বরূপ প্রকাশ করে দেন।

৩। একমাত্র গুরুবাক্যেই সত্যবস্তু লাভ হয়?

প্রকৃত অধিকারী হতে পারলে পরমার্থ লাভের জন্যে এক গুরুবাক্যই যথেষ্ট। নিজেকে মারতে হলে ছোটো একটা ছুরিতেই কাজ চলে যায়, কিন্তু পরকে মারতে বড়ো বড়ো অস্ত্রের দরকার। তুমি যদি পরকে পরমার্থ বোঝাতে চাও, তাহলে তোমাকে অনেক শাস্ত্র জানতে হবে, কিন্তু শুধু নিজে বুঝতে চাইলে অন্য কিছু না জানলেও চলে, একমাত্র গুরুবাক্যেই সব হয়ে যায়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

৪। গুরুর কৃপা গ্রহণ করবার ক্ষমতা সকলের হয় না কেন?

যার যেমন যোগ্যতা, সে সেই যোগ্যতা অনুসারে গুরুর কৃপা লাভ করতে পারে। গুরু সকলকেই সমান কৃপা করেন, তাঁর কাছে কেউ বড়ো, কেউ ছোটো নেই। কিন্তু তাঁর কৃপালাভের যোগ্যতা শিষ্যের থাকা চাই, অধিকার থাকা চাই, নইলে গুরুর উপদেশ শুনেও কোনো লাভ হবে না। অধিকারী ভেদে এখানে ফলের তারতম্য ঘটে। অধিকারী হয় তিন রকমের—উত্তম অধিকারী, মধ্যম অধিকারী আর অধম অধিকারী। উত্তম অধিকারী গুরুর ইঙ্গিতমাত্রই চট্ করে তা বুঝে নেয় আর সঙ্গে সঙ্গে সেই ইঙ্গিতমতো কাজ শুরু করে দেয়। তার ফলে সে শীঘ্রই সফলতা অর্জন করে। মধ্যম অধিকারীকে ভালো করে বুঝিয়ে দেবার পর তবে সে তা বুঝতে পারে এবং গুরুর নির্দেশমতো তখন কাজ করতে করতে ধীরে ধীরে সাফল্যের দিকে এগিয়ে যায়। আর অধম অধিকারী যে, তাকে গুরু যতই বোঝান না কেন, তাঁর উপদেশের মর্ম কিছুতেই তার মাথায় ঢোকে না, তাই সেই উপদেশমতো কোনো কাজ করতেও তার প্রবৃত্তি জাগে না। একই গুরুর শিষ্য হওয়া সত্ত্বেও তাই সে সফল হতে পারে না।

গুরুকৃপা যে সকলের ক্ষেত্রে একইভাবে ফলবতী হয় না, তার আরও একটা দৃষ্টান্ত শোনো। এ-ও সেই অধিকারীভেদেরই কথা। স্বাতী নক্ষত্রের জল পড়লে বিভিন্ন ফল উৎপন্ন হয়। শোনা যায় সেই জল কলায় পড়লে কর্পূর হয়, বাঁশে পড়লে বংশলোচন হয়, হাতির মাথায় পড়লে গজমোতি হয়, গরুর শিং-এ পড়লে গোরচ হয়, ঝিনুকে পড়লে মুক্তো হয় আর সাপের মাথায় পড়লে ভীষণ বিষ সৃষ্টি করে। সব কিন্তুই সেই এক স্বাতী নক্ষত্রেরই জল। কিন্তু দেখো, সাপের মাথায় যেই জল পড়ল, অমনি ভয়ানক বিষের সৃষ্টি করল। যেমন আধার, তার তেমনি ফল। তাই একই গুরুর শিষ্যদের মধ্যেও বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষ দেখতে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে যারা শঠ, খল, হিংস্র, তাদের কি প্রকৃত শিষ্য বলা যায়? গুরুর কাছে দীক্ষা নিলেই যে প্রকৃত শিষ্য হওয়া যায় তা নয়। আবার শুদ্ধ হওয়া চাই।

সাধক হয় চার রকমের। এক চতুর-চতুর। এরা গোড়া থেকেই নিষ্ঠার সঙ্গে সাধন-ভজনে লেগে থাকে, হঠাৎ করে সব ছেড়েছুড়ে বসে থাকে না। এদের তাই শুরুও ভালো, শেষও ভালো। দুই, চতুর-মূর্খ। এরা গোড়াতে খুব উঠে-পড়ে সাধন-ভজনে মন দেয়, কিন্তু পরে বিগড়ে গিয়ে সব ছেড়ে দিয়ে ঝিমোতে থাকে। এদের শুরুটা ভালো হলেও শেষটা মাটি হয়ে যায়। তিন, মূর্খ-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

চতুর। এরা প্রথম দিকটায় অবহেলা করে কাটায়, কিন্তু পরে নিজেদের সামলে নিয়ে সাধনায় মন দেয়। গোড়ায় তো এদের মধ্যে ভালো কিছু দেখা যায় না, তবে শেষটা ভালোই হয়। চার, মুর্খ-মূর্খ। কোনো সময়েই সাধন-ভজনে এদের মন নেই, না শুরুতে না শেষে। এদের তাই কিছুই হবার নয়।

যারা উপদেশ শুনতে আসে তাদের স্বভাব হয় তিন রকমের। জাঁতির স্বভাব, চালুনির স্বভাব আর কুলোর স্বভাব। জাঁতির স্বভাব কেমন? যা হাতের কাছে পাবে তাকেই সে কাটবে, যেমন তার্কিক লোকেরা হয়ে থাকে। তার্কিককে তুমি যত ভালো উপদেশই দাও না কেন, সে তর্ক করে উপদেশকেই উড়িয়ে দেবে, বাতিল করে দেবে। চালুনির স্বভাব কেমন? তার স্বভাব হল ভালো জিনিস সব ফেলে দিয়ে শুধু আবর্জনাগুলোকে নিজের মধ্যে ধরে রাখবে। আর কুলোর স্বভাব কী? যা-কিছু আবর্জনা, সব সে ফেলে দেয় আর যেটুকু ভালো, তাকেই নিজের কাছে রাখে।

যে শ্রোতার জাঁতির স্বভাব, সে তো উপদেশ শোনামাত্রই তা খণ্ডন করে দেবে। যার চালুনির স্বভাব, সে-ও উপদেশ শুনে তার সার পদার্থ ফেলে দিয়ে অসার অবান্তর কথাগুলোকেই গ্রহণ করবে। আর কুলোর স্বভাব যার সে উপদেশ শোনে, তার থেকে সারটুকু শুধু বেছে নেয় আর বাড়তি যেসব বাক্যবিন্যাস, তা ত্যাগ করে। কুলোর মতো স্বভাব হওয়া চাই, তবেই সদ্‌গুরুর উপদেশের মর্ম যথার্থ উপলব্ধি করা যায়। স্বভাবের এই তারতম্যের জন্যেই গুরুকৃপা সকলে সমানভাবে লাভ করতে পারে না।

আবার কারুর স্বভাব হল মোষের মতো। মোষ কী করে? মশার কামড়ে তার গায়ে যখন জ্বালা ধরে তখন সে পুকুরের জলে ডুব দেয়। মোষও আবার দুরকমের, বোকা আর চালাক। যেগুলো বোকা, সেগুলো জল-থেকে উঠে আসে আর সঙ্গে সঙ্গে মশার দল আবার তাদের অস্থির করে মারে। যে মোষগুলো চালাক, সেগুলো জল থেকে উঠবার পর মশা আর তাদের জ্বালাতন করতে পারে না। যদিও বা কামড়ায়, তবু গায়ে কাদা থাকার দরুণ সে কামড়ের জ্বলুনি তারা বুঝতে পারে না।

যে ভক্ত চালাক, তার স্বভাবও এই রকম। বিষয়রূপী মশার কামড় তাকে সহ্য করতে হয় না। মোষের মতো সে-ও সদ্‌গুরুর চরণকমলরূপ জলাশয়ে ডুব দেয় আর যাবার সময় গুরুর শ্রীমুখ থেকে যেসব উপদেশ শোনে, সমস্ত তার হৃদয়ে ভালো করে মাখিয়ে নিয়ে যায়। এইসব ভক্ত আবার যখন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিষয়কর্মে ফিরে যায়, তখন তারা কী করে? বিষয়কেও ভোগ করে, আবার সদ্‌গুরুর স্মরণ করতে থাকে। তার ফলে বিষয়রূপী মশা তাদের কামড়াতে পারে না, কামড়ালেও তার জ্বালা তারা টের পায় না। তবে যারা বোকা, তাদের দৌড়ঝাঁপই সার হয়। সদ্‌গুরুর কাছে এসে যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ শান্তি পায়, কিন্তু তাঁর কাছ থেকে ফিরে গিয়ে বিষয়কর্মে মন দেবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উপদেশগুলি ভুলে গিয়ে বিষয়ের জ্বালায় আবার জ্বলতে থাকে। তাই আবার তাকে ছুটতে হয় গুরুর কাছে। স্বভাবটিকে তাই গুরুকৃপা লাভের উপযোগী করে গড়ে তোলা দরকার।

গুরুকৃপা লাভ করতে হলে আরও একটি জিনিস না হলে চলে না, সেটি হল নিজের অন্তকরণের কৃপা। গুরু তো কৃপা করছেনই, কিন্তু তোমার অন্তঃকরণের কৃপা যদি না থাকে, তাহলে তুমি তো গুরুর উপদেশ কানেই তুলবে না। তাহলে গুরুর কৃপা তোমার কোন্ কাজে লাগবে? কোনো কাজেই লাগবে না। গুরু দিচ্ছেন, অথচ আমি নিচ্ছিনে, এতে লাভ কী? এখন দেখতে হবে, অন্তঃকরণের কৃপা ছাড়া যখন গুরু ও ভগবানের কৃপা লাভ করা যায় না, তখন অন্তঃকরণের কৃপা যদি না থাকে, তাহলে তুমি তো গুরু উপদেশ কানেই তুলবে না। তাহলে গুরুর কৃপা তোমার কোন্ কাজে লাগবে? কোনো কাজেই লাগবে না। গুরু দিচ্ছেন, অথচ আমি নিচ্ছিনে, এতে লাভ কী? এখন দেখতে হবে, অন্তঃকরণের কৃপা ছাড়া যখন গুরু ভগবানের কৃপা লাভ করা যায় না, তখন অন্তঃকরণের কৃপা কীভাবে লাভ করা যায়। অন্তঃকরণে কৃপা তখনই হবে, যখন অন্তঃকরণ শুদ্ধ হবে। কীভাবে শুদ্ধ হবে? গুরুই তোমাকে তা বলে দেবেন।

৫। সকলকে একরকম উপদেশ গুরু দেন না কেন?

সকলের একান্ত বাসনা কীভাবে ভগবানকে লাভ করা যায়, কীভাবে মুক্তি পাওয়া যায়। উদ্দেশ্য সকলের এক হলেও গুরু কিন্তু সকলকে একই উপদেশ দেন না। এর কারণ আছে। যে যেমন অধিকারী, তাকে সেইরকম উপদেশ দিতে হয়। সকলের জন্যে একই উপদেশে কাজ হয় না।

মানুষের প্রকৃতি বিভিন্ন, সকলে এক ধাতুতে গড়া নয়। যে যেমন পাত্র, গুরু তাকে তেমনি উপদেশ দেন। তামা বা পিতলের বাসনকে তেঁতুল দিয়ে মাজতে হয়, তবেই তা পরিষ্কার হবে। কাঁচের বাসনকে মাজতে হয় চুন দিয়ে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রূপোর বাসনকে পরিষ্কার করতে হলে খড়ি দিয়ে মাজতে হবে। কাপড়ের মতো যদি কোনো পাত্র হয়, তার জন্যে সাবান দরকার। আসল কথাটি হল পাত্রকে পরিষ্কার করা, মানুষের অন্তকরণকে শুদ্ধ করা। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, সব সম্প্রদায়ের মানুষই একথা মানে। হিন্দু বলে, অন্তঃকরণকে শুদ্ধ করো, মুসলমান বলে, দিল্‌কা সাফ্‌ করো। তবে কীভাবে শুদ্ধ করতে হবে, পরিষ্কার করতে হবে, তা গুরু বলে দেন। যার যেমন প্রয়োজন, তা বুঝে গুরু কাউকে বলেন ধ্যান করতে, কাউকে বলেন পূজো করতে, কাউকে জপ করতে, কাউকে যজ্ঞ হোম করতে, আবার কাউকে পরের উপকার করতে উপদেশ দেন। যে যেমন ধাতুতে গড়া, তারই উপযোগী করে গুরু তার অন্তঃকরণকে পরিষ্কার করবার উপায় নির্দেশ করেন। গুরু শুধু মাজনের কথাটাই বলে দেন, মাজবার কৌশলও বলে দেন, কিন্তু পরিশ্রম করে মাজতে হবে নিজেকে। গুরু যে তোমার হয়ে মেজে দেবেন, সেটি হবে না।

সেইজন্যই শিষ্য করবার সময় গুরু তাকে ভালো করে পরীক্ষা করে নেন এবং সে যে সাধনের উপযুক্ত বলে মনে করেন, তাকে সেইভাবে উপদেশ দেন।

৬। গুরু কীভাবে শিষ্যকে পরীক্ষা করেন?

গুরু শিষ্যকে চারভাবে পরীক্ষা করে নেন। কীরকম পরীক্ষা? সোনা খাঁটি কিনা তাই যেন যাচাই করা হচ্ছে। প্রথম ঘর্ষণ, দ্বিতীয় তাপ, তৃতীয় ছেদন, চতুর্থ আঘাত। প্রথমে কষ্টিপাথরে ঘষে দেখা হল, তাতে সন্দেহ পুরোপুরি দূর হল না। তখন পুড়িয়ে দেখা হল। খুব গনগনে আগুনের মধ্যে রেখে পরীক্ষা করে দেখা গেল সোনার বাইরের রং ঠিক আছে, কিন্তু ভিতরের রং বোঝা যাবে কী করে? তখন সোনাকে কেটে দেখা গেল যে ভিতরের আর বাইরের রং একই রকম। তারপর চোট বা হাতুড়ি দিয়ে ঘা মেরে দেখা হয় সোনায় খাদ আছে কিনা। খাদ থাকলে হাতুড়ির ঘায়ে সোনা ফেটে যাবে আর যে সে সোনায় খাদ নেই, হাতুড়ির ঘায়ে তা ফাটবে না, ছড়িয়ে যাবে। তখন বোঝা যাবে যে সেই সোনাই খাঁটি। গুরুর কাছে শিষ্যকেও এইভাবে চারটি পরীক্ষা দিতে হয়।

প্রথম ঘর্ষণ, মানে গুরু শিষ্যকে নিজের সেবাকার্যে নিযুক্ত করে দেন। সেই কাজে কোনোরকম ত্রুটি না হলে প্রথম পরীক্ষায় শিষ্য উত্তীর্ণ হল।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দ্বিতীয় পরীক্ষা তাপ অর্থাৎ তিতিক্ষা বা সহনশক্তির পরীক্ষা। সে পরীক্ষা কেমন? কখনো রোদে পুড়ছে, কখনো জলে ভিজছে, কখনো খাওয়া জুটছে, কখনো জুটছে না, কখনো ঘর ঝাঁট দেওয়া কখনো বাসন মাজা, এইভাবে নানারকম পরিস্থিতির মধ্যে শিষ্য যদি হাসিমুখে সব সহ্য করতে পারে, তাহলে দ্বিতীয় পরীক্ষায় সে উত্তীর্ণ হয়ে যায়।

এবার তৃতীয় পরীক্ষা ছেদন। ছেদন কী? না, শিষ্যকে নিজের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া। যতদিন সে কাছে ছিল ততদিন তো ঠিকই ছিল, এখন দূরে রেখে দেখতে হবে গুরুর প্রতি তার মতিগতি কেমন থাকে। যদি দেখা যায় যত দূরেই থাক শিষ্যের মন কম্পাসের কাঁটার মতো গুরুর পাদপদ্ম ছেড়ে এতটুকু বিচলিত হয়নি, সেখানেই স্থির হয়ে রয়েছে, যদি দেখা যায় যে গরু আর তার বাছুর দূরে থাকলেও যেমন হাম্বা ক'রে পরস্পরকে ডাকে, তেমনি গুরু আর শিষ্য যত দূরেই থাকুক না কেন, উভয়ের মধ্যে প্রেমের টান অক্ষুণ্ণ রয়েছে, তখনই শিষ্য তৃতীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হল।

এখন চতুর্থ পরীক্ষা আঘাত। শিষ্যের ক্ষুদ্র অপরাধও গুরু সহ্য করছেন না, লঘু পাপে গুরুদণ্ড দিচ্ছেন। শিষ্য যদি এই আঘাত সহ্য ক'রে গুরুর চরণকমলে শরণাগত হয়ে থাকতে পারে, তবেই সে চতুর্থ পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হয়ে প্রকৃত শিষ্য হওয়ার অধিকার অর্জন করে।

৭। সদ্গুরুর সঙ্গে কি তর্ক করা উচিত?

তর্কের মধ্যে যদি যুক্তি থাকে, তাকে তর্ক বলে না, তাকে বলে সৎসঙ্গ। তবে যুক্তিহীন তর্ক হলে, তর্ক করব বলেই তর্ক করলে, তাতে কোনো প্রশ্নেরই মীমাংসা হবে না। সেটা কখনোই বাঞ্ছনীয় নয়।

৮। সব গুরুই কি গুরু হওয়ার উপযুক্ত?

শাস্ত্রে তিন রকমের গুরুর কথা বলা হয়েছে। তরণ গুরু, তারণ গুরু আর তরণ-তারণ গুরু। তরণ গুরু যিনি, তিনি নিজে উদ্ধার হয়ে যান, কিন্তু অন্য কাউকে উদ্ধার করতে পারেন না। এঁদের অন্তরে আর বাইরে দুদিকেই নিবৃত্তি। তারণ গুরুর দৃষ্টান্ত হল এক ধরনের পণ্ডিত। তারা বড়ো জ্ঞানের কথা শোনাতে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পারে, কিন্তু তাদের ভিতরটা অজ্ঞানে ভরা, একেবারে অন্ধকার। এইসব পণ্ডিত শাস্ত্র থেকে পরকে উদ্ধারের রাস্তা বাতলে দিতে পারে, কিন্তু নিজেদের তারা উদ্ধার করতে পারে না! এইজন্যই এদের বলা হয় তারণ গুরু, পরকে উদ্ধার করবার ক্ষমতা থাকে এদের। তরণ-তারণ গুরু যিনি, তিনি অন্তরে নিবৃত্তি নিয়ে থাকেন, কিন্তু লোককল্যাণের জন্যে বাইরে প্রবৃত্তি রেখে দেন। নিজের সাধনবলে যে জিনিস তিনি অনুভব করেছেন, ভক্ত ও শিষ্যদের কল্যাণের জন্যে তিনি তাদের কাছে তাঁর সেই উপলব্ধির বিষয়ে উপদেশ দেন। এইভাবে নিজেরাও তাঁরা সিদ্ধিলাভ করেন, নিজেরা পার হয়ে গিয়ে অন্যদেরও পার করে দেন, অর্থাৎ অপরকেও উদ্ধার করতে সক্ষম হন।

এই তিন রকম ছাড়া আর এক রকম গুরু দেখা যায় যাদের অন্তরে প্রবৃত্তি, বাইরে নিবৃত্তি। এ তো হল মর্কট বৈরাগ্য। এ জিনিস অত্যন্ত খারাপ। গীতায় একে 'মিথ্যাচার বলা হয়েছে। এই মিথ্যাচারীরা বাইরে নিবৃত্তির পরাকাষ্ঠা দেখায়, কিন্তু অন্তরে ইন্দ্রিয়সেবায় মশগুল হয়ে থাকে। মানুষ এদের চিনতে পারে না, তাদের সেই নিবৃত্তির ভান দেখে ভুলে গিয়ে তাদের গুরু করে নেয়। এইসব গুরু নিজেরাও নরকে যায়, শিষ্যদেরও সর্বনাশ করে।

৯। গুরু যদি গৃহী হয়, তাতে কি শিষ্যের কল্যাণ হয় না?

অনেকে আমাকে এসে বলে, বাবা, আমার গুরুদেব গৃহী মানুষ, তাঁকে কী করে ভক্তি-শ্রদ্ধা করব? তাঁর প্রতি ঈশ্বরবুদ্ধি আনব কীভাবে? গুরুদেব আমার ভালো নন। তাদের কথা শুনে আমার হাসি পায়। তাদের বলি, তোমার গুরুদেব ভালো না হলেও ক্ষতি নেই। তাঁর প্রতি যদি তোমার ভক্তি থাকে, যথার্থই তাঁকে যদি তুমি ভক্তি করতে পারো, তাহলে গুরুর যে গতিই হোক না কেন, সেই ভক্তিতে শিষ্যের কল্যাণ হবেই হবে। এতে কোনো সন্দেহ নেই।

১০। গুরুকে ভালোবাসব, অথচ তাঁর আশ্রিত জনদের প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করব, এটা কি ঠিক?

তুমি আমাকে ভালোবাসবে, ভক্তি-শ্রদ্ধা করবে, আর আমার আশ্রমবাসীদের ভালোবাসবে না, এটা একটা কথা হল? যে আমাকে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভালোবাসবে, সে আমার আশ্রমকে ভালবাসবে, আশ্রমবাসীদের ভালোবাসবে, এটাই তো দরকার। আশ্রম তো দূরের কথা, সে আমার কুকুরকে পর্যন্ত ভালোবাসবে। দেখো ভাই, আমি যদি বলি আমি তোমাকে ভালোবাসি, কিন্তু তোমার ছেলেদের ভালোবাসিনে, তাদের এখান থেকে বিদায় করো, তখন তোমার মনের অবস্থা কেমন হবে? আর কি তোমার মন এখানে টিকবে? নিজের প্রাণ যে ব্যবহার পেতে চায়, অপরের প্রতিও সেইরকম ব্যবহার করতে হয়। তোমার যেমন ছেলে, আমার তেমনি শিষ্য। তোমার ছেলে যেমন তোমার প্রিয়, আমার শিষ্যরা, আমার আশ্রিত বিদ্যার্থীরা তেমনি আমার প্রিয়। তুমি অপরের কাছ থেকে যে ব্যবহার আশা করো, অপরের প্রতিও তেমনি ব্যবহার তোমাকে করতে হবে, এই কথাটা সর্বদা মনে রেখো। এটি সাধারণ একটি কথার কথা নয়, এ অমূল্য বাক্য। এই বাক্য যদি তুমি পালন করতে পারো, তাহলে তোমার অশেষ কল্যাণ হবে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মন্ত্রদীক্ষা

১। মন্ত্রের কোনো শক্তি আছে কি?

গুরু শিষ্যকে কী দেন? কিছুই দেন না, শুধু একটি শব্দ শুনিয়ে দেন, সেই শব্দতেই ভগবান লাভ হয়ে যায়। তবে সেই শব্দকে প্রয়োগ করবার কৌশল জানা চাই, সকলে সেই কৌশলটি জানে না। শব্দের যে কী অসীম ক্ষমতা, তা অনেকেরই জানা নেই। ধরো, কোনো মামলা যদি হেরে যাওয়ার মতো হয়, তাহলে বড়ো ব্যারিস্টার নিযুক্ত করলে সেই ব্যারিস্টারের কথার প্যাঁচে হারা মামলাও জিতে যাওয়া যায়। তেমনি, ঈশ্বরপ্রাপ্তি যদি আমার বরাতে নাও থাকে, তাহলেও যদি কোনো সাধু সদ্‌গুরুর মতো ব্যারিস্টার মিলে যায়, তাহলে তাঁর প্রভাবে, তাঁর বাণীতে আমার ঈশ্বরলাভও ঘটে যেতে পারে।

প্রথমে দেখো মন্ত্র কাকে বলে। ও তো শুধু এক শব্দ। শব্দ দু'রকমের হয়, ধ্বন্যাত্মক আর বর্ণাত্মক। ধ্বন্যাত্মক শব্দ কাকে বলে? যেমন দূরে এক জায়গায় বাজ পড়ল, ভীষণ শব্দে তোমার কানে তালা লেগে গেল, দু'চোখ তোমার আপনি বুঁজে গেল আর ভয়ে বুক উঠল কেঁপে। এরকম হল কেন? বাজ তো দূরে, তাতে তোমার কোনো ক্ষতিও হয়নি, কিন্তু সেই শব্দের এমনই শক্তি যে তা শুনেই তোমার শরীর আর মনে এক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। আবার দেখো, দূরে কোথাও মধুর সুরে এক বাজনা বাজছে, কিসের বাজনা তা তুমি বুঝতে পারছ না, কিন্তু সেই সুর তোমার কানে ভেসে আসছে আর তাতে তোমার মন-প্রাণ একেবারে মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। এই মিষ্টি সুরে তোমার কিন্তু বস্তুগত কোনো লাভ হচ্ছে না। তবু এতে আনন্দ পাচ্ছ কেন? দেখো ভাই, দু'রকমের ধ্বনির প্রভাব তোমাকে শুনিয়ে দিলাম। এ হল ধ্বন্যাত্ম মন্ত্রশক্তির কথা। এদের তুমি অস্বীকার করতে পারো?

বর্ণাত্মক শব্দ কাকে বলে? যেই আমি তোমার নাম ধরে ডাকলাম, অমনি তুমি আমার কাছে এসে দাঁড়ালে। বর্ণের বা নামের সঙ্গে যে শব্দ, তাকে বলে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বর্ণাত্মক মন্ত্র। তোমাকে ডাকতেই তুমি যেমন কাছে এলে, তেমনি ভগবানবাচক বর্ণ যোগ করে যদি ডাকা যায়, তাহলে ভগবানের সাড়া পাওয়া যায়। বশীকরণ মন্ত্র তুমি মানো তো? যদি না মানো, এখনি আমি তোমার সংশয় মিটিয়ে দিচ্ছি। দেখো, আমি যে এখন খুব মিষ্টি মিষ্টি করে তোমার সঙ্গে কথা বলছি, তাতেই তো তুমি আমার কাছে বসে রয়েছ? এখনি আবার যদি আমি তোমাকে দু-চারটে গালাগালি দিই, তাহলেই তুমি রেগে গিয়ে এখান থেকে উঠে যাবে, এক মুহূর্তও আর এখানে বসবে না। এই যে মধুর শব্দ, মিষ্টি কথা, এ হল বশীকরণ মন্ত্র, আর ঐ কর্কশ বুলি হল উচাটন মন্ত্র। এসব মন্ত্রশক্তি তোমাকে স্বীকার করতেই হবে, মন্ত্রের শক্তিকে তুমি কিছুতেই খণ্ডন করতে পারবে না। নাম আর নামী যে অভেদ।

২। দীক্ষা গ্রহণে দেশ-কাল-পাত্র বিচার করা হয় কেন?

আমি তো হরিনামের দাসব্রত খুলেই বসে আছি। পিপাসিত হয়ে যে আসে তাকেই বিলিয়ে দিই। তবে দিনক্ষণ একটু দেখে নিতে হয়। কৃষক যখন ধান রোপন করে তখন সে আকাশের দিকে লক্ষ্য রাখে। বৃষ্টি আসন্ন বুঝলে তবেই সে বীজ বুনে দেয়। সব সময় সে তো বীজ বপন করে না। তেমনি এখানেও দেশ, কাল আর পাত্র দেখতে হয়। তুমি হয়তো উত্তম পাত্র, সজ্জন মানুষ, দেশ অর্থাৎ যেখানে দীক্ষা নেবে সেই স্থানও উপযুক্ত স্থান, এখন কালের জন্যে কিছুদিন তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে। অপেক্ষা করতে দোষ কী? তাতে প্রাণের পিপাসা বাড়বে। যার পিপাসা জাগেনি, তাকে মিছরির সরবত দিলেও তা তার মিষ্টি লাগবে না। সে বলবে, চাইনে তোমার সরবত, ওতে আমার প্রয়োজন নেই। আবার পিপাসার সময় গরম জল এনে দাও, তাতেই তার মিষ্টি লাগবে। বলবে, দাও দাও, আরও দাও। তাই পিপাসা বাড়তে দেওয়াই ভালো। দীক্ষার বেলাতেও তেমনি ঠিক সময়টির জন্য অপেক্ষা করতে হয়।

তাছাড়া সবাইকে তো দীক্ষা দেওয়া চলে না। দীক্ষা নেবারও একটা অধিকার থাকা চাই, সে যোগ্যতা সকলের থাকে না। সবাই দীক্ষার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারে না, তাই পাত্র বিচার করে দীক্ষা দিতে হয়। পাত্র উপযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত দীক্ষা দেওয়া নিষেধ। কাঙালকে একটা মণি দিয়ে দেখো, সে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বলবে, এ কাঁচ নিয়ে আমি কী করব, ওতে আমার দরকার নেই, আমাকে বরং দুটি ভাত দিলে আমি খেয়ে বাঁচি। এবার কোনো জহুরীর কাছে মণিটা নিয়ে যাও তো দেখি। অমনি সে বলে উঠবে, আরে আরে, এর দাম যে লাখ দুলাখ টাকা। শাক তরকারি যে বেচেছে, তার কাছে গিয়ে মণির বদলে কিছু তরকারি চাওতো। সে কিছুতেই দেবে না। বলবে, এ কাঁচ দিয়ে তরকারি মেলে না, পয়সা ফেলো, জিনিস নাও। দেখছ তো মণির মর্ম তার জানা নেই, মণির কদর বুঝবার অধিকার তার নেই। যে প্রকৃত অধিকারী হবে, সে চট্ করে মণি চিনতে পেরে আগ্রহ করে তা নিয়ে নেবে। তাই অধিকারী না হওয়া পর্যন্ত, অধিকার অর্জন না করা পর্যন্ত সত্যবস্তু কাউকে দিতে নেই। দিলেও সে তা রাখতে পারবে না।

আবার দেখো, দীক্ষা নিলেই যে মানুষের কল্যাণ এমন কোনো কথা নেই। দীক্ষা নিয়ে খাটতে হয়, বীজে জলসেচন করতে হয় অর্থাৎ সাধন করতে হয়। তবেই ফল লাভ করা যায়। নইলে দীক্ষা নিলাম আর বাক্সে ভরে রেখে দিলাম, তাতে কোনো কাজ হবে না। জমিতে বীজ বুনে মালি যদি তাতে জল না দেয়, তাহলে ফসল ফলে না। তেমনি গুরু হৃদয়-ক্ষেত্রে, মনের জমিতে যে মন্ত্রবীজ বপন করে দেন, তাতে ভক্তিবারি সিঞ্চন করতে হয় শিষ্যকে, তবেই শিষ্য জ্ঞান-ভক্তি কর্মযোগের অধিকারী হয়ে মোক্ষ লাভ করতে পারে। নইলে দীক্ষা নেবে, অথচ কাজ কিছুই করবে না, তাতে কী লাভ হবে তোমার? কিছুই নয়। এইসব কারণেই দীক্ষার আগে পাত্র উপযুক্ত কিনা, তা পরীক্ষা করে নেওয়ার বিধি প্রচলিত আছে।

৩। গুরুদত্ত মন্ত্র প্রকাশ করা নিষিদ্ধ কেন?

'গুপ্ত যে, সে মুক্ত আর প্রকট যে সে ভ্রষ্ট', এই হল সাধনাতত্ত্ব। মন্ত্রকে যদি গোপন রাখতে পারো, তবেই সাধনার দ্বারা তুমি মুক্ত হতে পারবে। আর যদি সেই মন্ত্রকে প্রকট করো অর্থাৎ চারিদিকে প্রচার করতে থাকো, তাহলে তুমি ভ্রষ্ট হয়ে যাবে, মন্ত্রের কোনো ফল তোমার জীবনে ফলবে না। তুমি ভালো ভালো জিনিস খেয়েছ, যদি সঙ্গে সঙ্গে তা বার করে ফেলো, তাতে তোমার লাভ কী হল? যা খেলে, তা পেটে গিয়ে হজম হবে, তবেই না তুমি বল পাবে। সাধনক্ষেত্রেও একই ব্যবস্থা। দেখো ভাই, সাধনতত্ত্ব সব সময়

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গোপন রাখতেই হবে, এর যেন অন্যথা না হয়। যা খাচ্ছ, তা যদি কেবল বমি করতে থাকো, তাহলে কী হয়? তাতে মানুষ দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়ে। ঠিক তেমনি, মন্ত্র নিয়ে তা বমি করে ফেললে তাতে মনের পুষ্টি হয় না।

তুমি হয়তো বলবে, মন্ত্র যদি কারুর কাছে প্রকাশ করাই না যায়, তাহলে তো সেই মন্ত্র কালে কালে লুপ্ত হয়ে যাবে। তোমার এই আশঙ্কা নিরসনের জন্যে শাস্ত্র কী বলছেন শোনো। শাস্ত্র বলছেন, যাঁরা সদ্‌গুরু, আচার্যকোটি যাঁরা, তাঁরাই কেবল উত্তম অধিকারীর কাছে সত্যবস্তু প্রকাশ করবেন। মন্ত্রদানের অধিকার, সত্যবস্তু প্রকাশের অধিকার আছে কেবল সিদ্ধ মহাপুরুষদের। যাঁরা এখনো সাধনা করে চলেছে, কিন্তু সিদ্ধিলাভ করেনি, তাদের মন্ত্রদানের অধিকার নেই।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সাধু-সন্ত

১। সাধু কাকে বলব?

কাপড়খানা রাঙালে আর সাধু হয়ে গেলে, সেটি হবার নয়। মন যার সাধু-ভাবাপন্ন হয়েছে, সে-ই সাধু। তুমি এখন শুক্ল সন্ন্যাসী হয়ে থাকো অর্থাৎ সাদা কাপড় পরো আর সাদা শুদ্ধ স্বচ্ছ স্বভাব লাভ করতে থাকো। সাদা স্বভাব কেমন? তার একটা ছোট্ট দৃষ্টান্ত দিচ্ছি শোনো। এক সাধু নৌকা করে নদী পার হচ্ছেন। নৌকাতে আরও অনেক যাত্রী রয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে এক ভাঁড়। ভাঁড়ের স্বভাবই হল পরকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করা। সে নানাভাবে সাধুকে জ্বালাতন করতে শুরু করল। সাধুর অপমানে স্বর্গের দেবতারা রেগে গেলেন। তাঁরা ভাঁড়কে নদীর জলে ডুবিয়ে মারতে চাইলেন। সাধু তা জানতে পেরে দেবতাদের বললেনঃ 'হে দেবতা, ভাঁড়কে আপনারা প্রাণে মারবেন না। তার বদলে তার কুবুদ্ধিকে নষ্ট করে তাকে সুবুদ্ধি দিন, তাহলেই সে আর কোনোদিন সাধুদের অসম্মান করবে না! এতে তার কল্যাণ হবে। হে দেবতা, ভাঙতে তো বেশি সময় লাগে না, কিন্তু গড়তে যে অনেক সময় লেগে যায়।'

দেখো ভাই, সাধুর কেমন সুন্দর স্বভাব। কেউ যদি তাঁর অনিষ্ট করে, তবু তিনি তার অনিষ্ট চিন্তা করেন না। সাধু সব সময় সকলের ইষ্ট চিন্তাতেই মগ্ন থাকেন।

একটা দোঁহা শোনো ঃ

সন্ত ওহী জানিয়ে দুঃখে দুঃখ ওয়ে নায়।
পান ফুল ছীড়ে নহী রহে বগিচেময়।।

সাধু বলে তাঁকেই জানবে যিনি কাউকে দুঃখ দেন না, অন্যের থেকেও দুঃখ নেন না। সংসাররূপ এই বাগানে তিনি ঘুরে বেড়ান, কিন্তু তার একটি পাতা ফুল তিনি ছেঁড়েন না।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

২। প্রকৃত সাধু আর কপট সাধু কীভাবে চেনা যায়?

জহুরী জহর চেনে, সকলে তা চিনতে পারে না। তুমি নিজে যখন জহুরী হতে পারবে, তখন নিজেই চিনতে পারবে কে সাধু আর কে ঠগ। দেখো ভাই, তুমি তো এখন সাধু জহুরীর কাছে বসে রয়েছ। এখন এই জহুরীর দোকানে কিছুদিন কাজ করলে তুমি নিজেই একজন পাকা জহুরী হয়ে যাবে। তখন কোন্‌টা সাচ্চা, কোনটা ঝুটো, তোমাকে কিছু বলে দিতে হবে না। এখন যদি আমি তোমাকে বলি, সংসার করো, সংসারের প্রতি আসক্ত হোয়ো না, তাহলে কি তুমি আমার কথা মেনে নেবে? এসব হল নিজের অনুভূতির বিষয়, নিজেকেই ভালো করে বুঝতে হয়। অনুভূতি ছাড়া এসব বুঝবার আর অন্য পথ নেই। তবে এই জ্ঞান লাভ করতে হলে জহুরীর সঙ্গ করতে হয়। সাধু-সজ্জনদের সঙ্গ করতে হয়। তাহলে কিছুদিনের মধ্যে তাঁদের সেই জ্ঞান তোমার ভিতরে ফুটে উঠবে। তখন কোন্‌টা ভালো, কোন্‌টা মন্দ, কে সাধু, কে ভন্ড তা তুমি নিজেই বুঝতে পারবে।

৩। সাধু-সজ্জনদের পারিশ্রমিক কীভাবে দিতে হয়?

দেখো তো, কতক্ষণ ধরে আমি তোমাদের সঙ্গে বকবক করে চলেছি। এতক্ষণ ধরে কোনো উকিল-ব্যারিস্টারকে যদি কথা বলতে হত, তাহলে তাদের কত টাকা ফী দিতে হত শুনি? আমাকে তোমরা কত ফী দেবে বলো? আমার পারিশ্রমিক কত, তা জানো তো? এতক্ষণ ধরে আমি যে তোমাদের সঙ্গে কথা বললাম, আমার এই উপদেশগুলো তোমরা মনে রেখো, সেইটাই হল আমার পারিশ্রমিক। আর এখান থেকে উঠে গিয়ে যদি নুন, তেল, লকড়ির চিন্তায় মেতে ওঠো, তাহলে কিন্তু তোমরা আমাকে ফাঁকি দিলে, আমার প্রাপ্য ফী আমি পেলাম না! আমার একটি কথাও যদি মনে রাখতে পারো, তাতেই আমার পারিশ্রমিক মিলে যাবে। তোমাদের কল্যাণের জন্যেই আমার এত কথা বলা। এতে আমার নিজের কোনো স্বার্থ নেই। সাধুদের কর্তব্যই হল, যে আসবে তাকে কিছু সদুপদেশ দেওয়া, কিছু সৎকথা শোনানো।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

৪। সাধুরা পরিব্রাজনায় রত থাকেন কেন?

পানী তো বহতা ভলা বাঁধা গঁধীলা হোঙ্গ!
সাধু তো রম্‌তা ভলা দাগ ন লগে কোঙ্গ।।

যে জলে স্রোত আছে সেই জলই ভালো, বদ্ধ জলে দুর্গন্ধ হয়। সাধুর পক্ষে এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে না থেকে ঘুরে বেড়ানোই ভালো, কারণ তাতে সাধুর গায়ে কোনো দাগ লাগতে পারে না, অর্থাৎ ঘুরে বেড়ালে তাঁকে কখনো মোহে আবদ্ধ হতে হয় না।

দেখো ভাই, সাধু হয়েছ, অথচ ভ্রমণ করবে না, এ তো ঠিক কথা নয়। তুমি বলতে পারো, আপনি তো এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে আছেন। না, তা নয়, আমি কোনদিন এক জায়গায় বসে থাকি না। আমি তিন তিনবার সারা ভারতবর্ষ পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়িয়েছি। এখন বৃদ্ধ হয়েছি, বৃদ্ধাবস্থায় সাধুদের কোনো একজায়গায় বসে পড়াই উচিত। আগে আমার নিয়ম ছিল, কোনো জায়গায় তিন রাত্রির বেশি আমি থাকতাম না। তবে এখন এই বুড়ো বয়সে কেউ যদি কোথাও যাওয়ার কথা বলে তো বলি 'শিবলিঙ্গং ন চালয়েৎ'। বুড়ো বয়সে শিবলিঙ্গের মতো এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে থাকাই ভালো।

সাধুদের উচিত পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়ানো। আজকাল রেল হয়েছে, বুড়ি বুড়ী মায়েরাও এখন তীর্থ পর্যটন করতে পারেন। কিন্তু রেলে ভ্রমণ করলে সাধুদের সাধুবৃত্তির স্ফুরণ হয় না। ভ্রমণ থেকে সাধুর তিতিক্ষা বা সহিষ্ণুতা জন্মায়। ষট্ সম্পত্তির এক সাধন হল তিতিক্ষা। পায়ে হেঁটে দেশে-বিদেশে ঘুরে বেড়ালে আপনা থেকেই সাধুর সেই তিতিক্ষার সাধন হয়ে যায়। পায়ে হাঁটলে বেশি দূরে তো যাওয়া যায় না, বিশ্রামের জন্য কোনো গ্রামে তাকে থামতে হবে, সেই গ্রামে ভিক্ষা করে আহারের যোগাড় করতে হবে, কেউ ভিক্ষা দেবে, কেউ বা গালাগালি দিয়ে বিদায় করবে। সাধুকে নির্বিকারভাবে সেই গালাগালি সহ্য করতে হবে, মান-অপমান বোধ তাকে বিসর্জন দিতে হবে। পর্যটনকালে কখনো তাকে রোদে পুড়তে হবে, কখনো বৃষ্টিতে ভিজতে হবে, কখনো আহার জুটবে, কখনো জুটবে না, আর সন্তুষ্টচিত্তে সেই সব সহ্য করতে করতেই সাধুর মধ্যে আপনা আপনি তিতিক্ষা বা সহনশক্তি জেগে উঠবে। আজকাল সাধুরা কেউ আর পায়ে হেঁটে পর্যটন করে না। রেলে ঘুরে বেড়ায় বলে তাদের মধ্যে তিতিক্ষাও আর ফোটে না।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

৫। সাধু-সজ্জনদের নিন্দায় লাভবান হয় কে?

সাধুদের যারা নিন্দা করে তারা তো ধোপা, তাদের ধোলাই করতে দাও। সাধুদের যা কিছু ময়লা বা পাপ, তারাই পরিষ্কার করে দেয়। দেখো ভাই, মানুষ ভগবানকেও নিন্দা করতে ছাড়ে না। ভগবান কৃষ্ণ স্বয়ং পূর্ণ অবতার। শিশুপাল, দন্তবক্র এরা তাঁরই কত নিন্দাই না করেছে। তাতে ভগবানের কোনো ক্ষতিই তো হয়নি, ক্ষতি যা হবার তা তো এদেরই হয়েছে। একটা শ্লোক আছে শোন ঃ

অধর্মাং ধর্মং নিন্দন্তি চৌরাঃ নিন্দন্তি চন্দ্রমাম্।
যোগিনং বেশ্যাঃ নিন্দন্তি মূর্খাঃ নিন্দন্তি পন্ডিতান্।।

অধার্মিক যে, সে তো ধর্মের নিন্দা করবেই। চোর চাঁদের নিন্দা করে কারণ অন্ধকার রাতেই চুরি করার সুবিধে, চাঁদের আলোয় তার অসুবিধে হয়। বেশ্যা যোগীদের নিন্দা করে কারণ যোগীদের দিয়ে তো তার মনস্কামনা পূর্ণ হবে না। আর যে মুর্খ, সে তো বিদ্যার গৌরব বোঝে না, মানেও না, তাই সে পণ্ডিতদের নিন্দা করে। তবে মুর্খের নিন্দায় বিদ্বানের কিছু যায় আসে না।

শাস্ত্রে একটা প্রশ্ন তোলা হয়েছে, জ্ঞানীদের যে মোক্ষলাভ হয়, সেটা কেমন করে সম্ভব? জ্ঞানীরা শুভ কাজ নিয়েই থাকেন, তাতে তাঁদের পূণ্য সঞ্চয় হয়। আবার শরীর থাকলেই কিছু না কিছু মন্দ কাজ সেই শরীরের দরুণ ঘটে যায়, যেমন চলতে ফিরতে পায়ের চাপে কত কীট-পতঙ্গ মারা পড়ে, তাতে জ্ঞানীদেরও জীবহত্যার পাপ স্পর্শ করে। কিন্তু পাপ আর পূণ্য থাকতে তো মোক্ষ লাভ করা যায় না, কারণ পাপ-পুণ্যের যে ফল, তাই বীজরূপে নতুন কর্মের সৃষ্টি করে। কাজেই পাপ-পুণ্য যতক্ষণ না নির্মূল হচ্ছে, ততক্ষণ জ্ঞানীদের পক্ষে মোক্ষলাভ কীভাবে সম্ভব? এইজন্যই প্রশ্ন হল, জ্ঞানীদের পাপ আর পুণ্য যায় কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে, যারা জ্ঞানীর নিন্দা করে, জ্ঞানীর সঙ্গে শত্রুতা করে, তাঁকে দুঃখ দেয়, তারাই জ্ঞানীর পাপের অংশ ভোগ করে! আর যারা জ্ঞানীর প্রশংসা করে, তাঁর সেবা করে, তারা তাঁর পূণ্যের অংশ লাভ করে। তাই স্থূলভাবে দেখলে মনে হবে নিন্দাকারীরা জ্ঞানীদের পরম শত্রু, কিন্তু সূক্ষ্মভাবে দেখো, তারা জ্ঞানীদের পরম বন্ধু, সাধু-সজ্জনদের পাপের বোঝা এইসব নিন্দুকেরাই নিজেদের ঘাড়ে নিয়ে বহন করতে থাকে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

৬। সাধুবেশী ভণ্ডদের কি কল্যাণ হয়?

নকল সাধুদের যে কল্যাণ হয় না, তা নয়, তবে তা হয় অনেক দেরীতে। নকল করতে করতেই একদিন তারা আসলে পৌঁছে যেতে পারে। রাজবাড়ির সেই মেথরের গল্প জানো তো? রাণীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে পাওয়ার আশায় যে মেথর ছ'মাস ধরে গভীর জঙ্গলে সাধু সেজে বসেছিল? এই ছ'মাস তাকে কী কষ্টটাই না সহ্য করতে হয়েছে। নামমাত্র আহার, কারুর সঙ্গে কথাবার্তা নয়, চোখ বুঁজে শুধু বসে থাকা-লোকে ভাবল না-জানি কতবড়ো এক সাধু তপস্যায় মগ্ন রয়েছেন। দলে দলে লোক ছুটতে লাগল সেই নকল সাধুর কাছে। সারা দেশময় সাধুর কথা রাষ্ট্র হয়ে গেল। শেষে রাজকর্মচারীদের সঙ্গে নিয়ে রাজাও এলেন তাকে দর্শন করতে। তারপর যাঁর জন্য মেথরের সাধু সাজা, সেই রাণীও একদিন নির্জনে একলা এসে উপস্থিত হলেন সেই মেথরের কাছে। কিন্তু মেথর তখন তো আর সে মেথর নেই। এতদিনের সংযমের ফলে তার মধ্যে সাত্ত্বিক ভাব ফুটে উঠেছে, সাধুত্বের ভান খসে গিয়ে এখন সে রূপান্তরিত হয়েছে প্রকৃত সাধুতে।

বাইরের সংযম থেকে কখনো কখনো অন্তরের সংযম এসে যায়, আবার অন্তরের সংযম থেকে বাইরের সংযম ফুটে ওঠে। তাই সংযম কারুর ক্ষেত্রে বাইরে থেকে ভিতরে পৌঁছে যায়, কারুর বা ভিতর থেকে বাইরে প্রকাশ পায়। সাধুত্বের ভান করতে গিয়ে মেথর বাইরের প্রবৃত্তিকে দমন করেছিল, তাতেই তার অন্তর্নিহিত প্রবৃত্তিও দমন হয়ে গেল, পরস্ত্রীর প্রতি তার যে মোহ, তা দূর হল, সাত্ত্বিক ভাবের স্ফুরণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার চিত্তও কেমন নির্মল, শান্ত ভাব ধারণ করল।

৭। সংসারীরা ত্যাগী, না সাধু-সজ্জনেরা ত্যাগী?

ভাই, আমি ত্যাগী, না তোমরা ত্যাগী? তোমরা যে-ত্যাগ স্বীকার করেছ, তার তুলনায় আমার ত্যাগ তো কিছুই নয়। তোমরা হলে আসল ত্যাগী আর আমি তো হলাম নকল ত্যাগী। দেখো ভাই, তোমরা তো আসল জিনিসকেই ত্যাগ করে বসে আছ আর আমি ত্যাগ করেছি নকল জিনিসকে। আমার কথা শুনে তোমরা হাসছ, কিন্তু বিচার করলেই দেখবে এ হাসির কথা নয়। ভগবান হলেন আসল বস্তু, সেই আসল বস্তুকেই তোমরা ত্যাগ করেছ আর স্ত্রী-পুত্র,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ধন-মানের মতো মিথ্যে জিনিসগুলো নিয়ে আরাম করে বসে আছ। আর আমি কী করেছি? মিথ্যে ত্যাগ করে সত্যবস্তু নিয়ে বসে আছি। তবেই দেখো, তোমরা ত্যাগী কি আমি ত্যাগী? আমার চেয়ে তোমরা বড়ো ত্যাগী কিনা তা নিজেরাই এবার বুঝে নাও।

৮। কত রকম উদ্দেশ্য নিয়ে মানুষ সাধু-সন্তের কাছে যায়?

ভক্তদের জন্যে, মুমুক্ষুদের জন্যে সাধুদের শরীর ধারণ। আমাকে উপলক্ষ্য করে দশজনে পার হয়ে যায়, এই আমার কামনা। মুমুক্ষু যারা, যারা ভগবান সম্বন্ধে আলোচনা করতে এখানে আসে, তাদের দেখে আমার বড়ো আনন্দ হয়। তবে বেশির ভাগ মানুষ আসে ঐহিক স্বার্থসিদ্ধর আশা নিয়ে। কারুর ছেলের অসুখ, সে ওষুধু চাইতে আসে যাতে ছেলে ভালো হয়ে যায়, কেউ এসে বলে, আমার ছেলেপিলে নেই, ছেলে যাতে হয় সেই আশীর্বাদ করুন, কেউ আসে টাকা-কড়ির আশীর্বাদ চাইতে, কেউ চায় মান-যশ।

নিঃস্বার্থ মুমুক্ষু ভক্ত খুব বেশি আসে না। স্বার্থসিদ্ধির জন্যে যারা আসে তারা টেকেনা। স্বার্থসিদ্ধি হলে ভাবে, কাজ তো মিটে গেল, আর এখানে আসবার দরকার কী। স্বার্থ না মিটলে ভাবে, লাভ যখন কিছু হল না তখন এখানে আর এসে কী হবে? এইজন্যেই নিঃস্বার্থ, ধর্মপিপাসু কেউ এলে আমি খুশি হই। মন আনন্দে ভরে ওঠে। বুঝতে পারি এরা টিকবে, আমার উপদেশ এরা হেলায় নষ্ট করবে না।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সৎসঙ্গ

১। মানুষের জীবনে সঙ্গের প্রভাব কতখানি?

মিছরির শরবত তুমি অন্ধকারেই খাও আর আলোতেই খাও, তা মিষ্টি লাগবেই। তেমনি সৎসঙ্গে তোমার কোনো অনুভূতি হোক বা না হোক, সৎসঙ্গে যেসব আলোচনা হয় তা কেবল শুনে গেলেও তোমার মিষ্টি লাগবে। সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, সৎসঙ্গের তুলনা নেই। সঙ্গের এমনই প্রভাব যে তাতে মানুষ যেমন উপরে উঠতেও পারে, তেমনি নিচেও নেমে যেতে পারে। এইজন্যেই সর্বদা সৎসঙ্গ করা দরকার। অসৎসঙ্গে তোমাকে নিচে ফেলে দেবে, সৎসঙ্গে উপরে ওঠাবে। সৎসঙ্গের প্রভাবে মানুষের সবকিছু মিলতে পারে। তাই অসৎসঙ্গে যাতে পড়তে না হয় সেদিকে যেমন সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখবে, তেমনি সৎসঙ্গ যাতে মেলে তারও চেষ্টা করবে।

সঙ্গত সে হী গুণ উপজায় সঙ্গত সে গুণ জায়।
বাঁস ফাঁস মিশরী এক তৌল বিকায়।।

সঙ্গের কেমন প্রভাব দেখো। যার সঙ্গ তুমি করবে, তার যেমন ওজন, তার মতোই হয়ে যাবে। মিছরির মধ্যে বাঁশের টুকরো আর সুতো থাকে দেখেছ তো? মিছরির সঙ্গে একসঙ্গে মিশে থাকার দরুণ তারাও মিছরির দরে বিকিয়ে যায়। আবার দুধের সঙ্গে জল মেশালে সেই জলও দুধের দামে বিক্রি হয়। জলের তো কোনো দাম নেই, কিন্তু দুধের সঙ্গে সে মিশে গিয়েছে বলে তারও দাম দুধের মতো বেড়ে গিয়েছে।

মানুষের যা-কিছু উন্নতি অবনতি, সবই সঙ্গের প্রভাবেই ঘটে থাকে। সঙ্গের প্রভাব যে কতখানি, তারই এক গল্প বলি শোনো। দেওঘরে এক সার্কাসওয়ালা এসেছিল। সে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তিনটে বাঘ আর একটা সিংহ নিয়ে খেলা দেখাত। সার্কাসওয়ালার নাম গজানন, আমাকে খুব ভক্তি-শ্রদ্ধা করত। আমাকে একদিন সে বলল : 'বাবা, আপনাকে একদিন আমার সার্কাস দেখতে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হবে।' আমার প্রতি তার শ্রদ্ধা আর তার আগ্রহ দেখে আমি রাজী হলাম, সে একদিন মোটরে করে তার খেলা দেখাতে নিয়ে গেল। তিনটে বাঘ আর একটা সিংহ নিয়ে কতরকম আশ্চর্য খেলাই না সে দেখাল। একটা বাঘকে সে তার মাথার উপরে বসালো, দুটোকে চেপে ধরল বগলে, আর সিংহটাকে বসাল তার কোলের উপর। বাঘ সিংহের মতো জানোয়ার নিয়ে মানুষ খেলা করছে একবার ভেবে দেখো তো কী আশ্চর্য ব্যাপার! শেষকালে একটা টেবিলের উপর আলাদা আলাদা করে বাঘ, সিংহ, ঘোড়া আর ছাগলের খাবার রেখে দিল। যে যার খাবার নির্বিবাদে খেয়ে গেল, কারুর প্রতি কারুর হিংসা নেই। আমি গজাননকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম : 'গজানন, তুমি যে এইসব জানোয়ার নিয়ে খেলা করো, অথচ এরা কেউ কারুর হিংসা করে না, এর কারণ কী? আমি তো শুনেছি এদের আফিং খাইয়ে নির্জীব করে রাখা হয়, মারধোর করা হয়।' গজানন বলল : 'ওসব মিছে কথা। ওরা যে হিংসা করে না তার কারণ আর কিছুই নয়, একমাত্র কারণ হল ওদের আমি খুব ছোটবেলা থেকেই পুষেছি, তখন থেকেই এদের আমি ভালোবাসি আর এদের নিয়ে খেলা করি। তাইতেই এরা আমার এত অনুগত, নইলে বড়ো হবার পর পোষ মানাতে গেলে তা সম্ভব হয় না।'

এখন দেখো ভাই, হিংস্র জানোয়ারও মানুষের সঙ্গ পেলে কেমন তাদের হিংসাবৃত্তিকে ত্যাগ করতে পারে। বাঘ-সিংহের খাদ্য হল মানুষ, কিন্তু মানুষকে খাওয়া দূরে থাক, তারা তার সঙ্গে খেলা করছে। এর থেকেই বুঝে নাও সঙ্গের প্রভাব কেমন। যে যেমন সঙ্গ করবে তার স্বভাবও তেমনি হবে। তাই আমার উপদেশ, তোমরা সর্বদা ভালোর সঙ্গ করো, সতের সঙ্গ করো, সাধুসঙ্গ করো।

দেবতাদের মধ্যে সত্ত্বগুণ প্রধান, মানুষে প্রধান রজোগুণ আর পশু ও অসুররা হল তমোগুণসম্পন্ন। মানুষ রয়েছে মধ্যস্থলে, তাই মানুষ ইচ্ছে করলে দেবতা হতে পারে, আবার ইচ্ছে করলে পশু বা অসুর হয়ে যেতে পারে অর্থাৎ ঊর্ধ্বগতি বা অধোগতি মানুষের ইচ্ছাধীন। একটা শ্লোক শোনো ঃ

জৈসে কো তৈসা মিলে কীচড়মে মিলে নীচ।
পানী মে পানী মিলে নীচকো মিলে কীচ।।

অর্থাৎ তুমি যার সঙ্গে মিশতে চাও, তোমাকেও তার মতো হতে হবে, তবেই তুমি তার সঙ্গে মিশতে পারবে। নীচের সঙ্গে নীচই মিলবে, জলের সঙ্গে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মিলবে জল, পাঁকের সঙ্গে পাঁক। অর্থাৎ তুমি যদি ভালোর সঙ্গ করতে চাও তাহলে তোমাকে ভালো হতে হবে, নইলে তুমি ভালোর সঙ্গে মিশতে পারবে না।

মানুষের মধ্যে তিন শ্রেণীর মানুষ দেখা যায়—দেবশ্রণী, মনুষ্যশ্রেণী, পশু বা অসুর শ্রেণী। দেবশ্রেণীর মানুষেরা পরস্পরের সঙ্গে মিশতে পারে, মনুষ্য শ্রেণীর মানুষ তাদের মতো মানুষের সঙ্গেই মেশে আর পশু বা অসুরশ্রেণীর মনুষ্যের পক্ষে তাদের সগোত্রের সঙ্গে মেশা ছাড়া উপায় নেই। দেবশ্রেণীর মানুষের সঙ্গে পশু বা অসুরশ্রেণীর মানুষ যদি মিশতে যায়, তা তারা কখনো পারবে না। কিন্তু মানুষ রয়েছে মাঝখানে, তাই সে ইচ্ছে করলে দেবশ্রেণীর সঙ্গে মিশতে পারে, পশু বা অসুরশ্রেণীর সঙ্গেও মিশতে পারে, সেইজন্যেই মানুষের উচিত আপন আপন স্বভাবের চেয়ে উচ্চকোটির মানুষের সঙ্গ করা। পশুশ্রেণীর মানুষকে মিশতে হবে মনুষ্যশ্রেণীর মানুষের সঙ্গে, মনুষ্যশ্রেণীর মানুষকে মিশতে হবে দেবভাবাপন্ন মহাজনদের সঙ্গে। এইভাবে সঙ্গের গুণে মানুষ ধাপে ধাপে উর্ধ্বগতি লাভ করতে পারে। তুমি ছাদে উঠতে চাও, এক লাফে তো উঠতে পারবে না, তোমাকে সিঁড়ি ভেঙে ধাপে ধাপে ছাদে উঠতে হবে। সৎসঙ্গই হল সেই সিঁড়ি।

২। সাধুসঙ্গ ও সৎসঙ্গের সার্থকতা কী?

ভগবানের কথা যারা কখনো শোনেনি, তাদের মনে ভগবানকে লাভ করবার ইচ্ছে জাগবে কেন? সেইজন্যেই সৎসঙ্গের দরকার। দশবার ধরে ভগবানের কথা শুনতে শুনতে একবার হৃদয়ে ছাপ পড়ে যাবে। কোনো ভাগ্যবানের যদি সৎসঙ্গ মিলে যায় তাহলে তার আর অন্য কোনো উপায়ের দরকার হয় না, একমাত্র সৎসঙ্গেই তার সবকিছু লাভ হয়ে যায়। তোমার মধ্যে সত্ত্বগুণ থাকুক বা না থাকুক, তাতেও কোনো বাধার সৃষ্টি করে না। সাধুর সঙ্গের গুণে তাঁর ভিতরকার যে সত্ত্বগুণ, তা আপনা থেকেই তোমার ভিতরেও জেগে উঠবে। তিল ফুলে তো কোনো সুগন্ধ নেই, কিন্তু তিলের তেলে গোলাপ, জুঁই, বেলি, চামেলির সুগন্ধ আসে কোথা থেকে? ঐসব ফুলের সঙ্গ থেকেই তিল তেলের সুগন্ধ। একথা তো সকলেই জানে, কোনো প্রমাণের দরকার করে না। ঠিক এইভাবেই, তোমার ভিতরে সত্ত্বগুণ না থাকলেও তুমি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যখনই কোনো সত্ত্বগুণী সাধুর সঙ্গ করবে, তখনই আপনা থেকেই তোমার ভিতরে সত্ত্বগুণের স্মরণ হবে। আধার শুদ্ধ না হলেও সাধুসঙ্গে যে কিছুই লাভ হয় না, সেকথা বলা চলে না। একটা ফুটো পাত্রে তুমি ঘি রেখে দাও। সূর্যের উত্তাপে সেই ঘি গলে যাবে আর পাত্রটা ফুটো বলে সমস্ত ঘি যাবে। কিন্তু তবু পাত্রটার গায়ে ঘিয়ের একটা চেকনাই, একটা উজ্জ্বলতার ছাপ তো লেগে থাকবেই, সেটুকু তো আর মুছে যাবে না। তার মানে অসৎ লোকও যদি সাধুর কাছে আসে, মহাজনের কাছে আসে, তাতে কিছু লাভ তার হবেই। অন্য কিছু লাভ না হলেও, তাঁদের আশীর্বাদ সে তো পাবে। সাধু মহাপুরুষের কাছে গেলে যে কত কল্যাণ হয়, মানুষ তা ধারণা করতে পারে না। সৎসঙ্গের প্রভাব মুখে বলে শেষ করা যায় না। সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, এই সৎসঙ্গ মানুষকে স্বর্গে নিয়ে যায়। তাই তোমার কাছে আমার উপদেশ, সর্বদা সৎসঙ্গ করবে। ক্ষণিকের সৎসঙ্গেও অনন্ত ফল পাওয়া যায়।

পরশমণির স্পর্শে লোহা সোনা হয়ে যায়। কিন্তু পরশমণির থেকেও সাধুর ক্ষমতা অনেক বেশি। কী ভাবে? পরশমণি লোহাকে সোনা করে দিতে পারে বটে, কিন্তু লোহাকে সে পরশমণি করতে পারে না, সে সামর্থ্য তার নেই। কিন্তু সাধুর এমনই ক্ষমতা যে তিনি শরণাগতকে আপন স্বরূপে গড়ে তুলতে পারেন অর্থাৎ আপন শক্তিতে তাকেও সাধুতে পরিণত করে দেন। এখন বুঝে দেখো সাধুর সামর্থ্য পরমশমণি থেকে বেশী না কম। সেইজন্যেই সাধুসঙ্গের এত মহিমা। দোহাঁতেও তাই বলা হয়েছে :

শঠ শূদ্র সৎ সঙ্গত পাওয়ে।
পরশ পরশ কো ধাত ছুয়াওয়ে।।
সন্ত ঔর পারস্ কা বড়া হী অন্তর জান :
উয়ো লোহা কো কাঞ্চন করে
য়ে করে আপ্ সমান।।

তোমাদের পুরাণের মধ্যেও সৎসঙ্গের কত দৃষ্টান্ত দেখানো হয়েছে। নারদ ঋষি ছিলেন ঝিয়ের ছেলে, কিন্তু দাসীপুত্র হয়েও তিনি হয়েছিলেন ঋষি। চাতুর্মাস্য ব্রত পালন করবেন বলে তপস্বী ঋষিরা এক জায়গায় কুটির বেঁধে বাস করছিলেন। সেই সময় নারদের মা দাসী হয়ে ঐসব ঋষিদের সেবাপরিচর্যায় নিযুক্ত ছিলেন। তিনি তাঁদের বাসন মেজে দিতেন। ঘর-দোর পরিস্কার করতেন এবং বালক নারদও মায়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে এইসব কাজে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সাহায্য করতেন। ঋষিদের খাওয়া হয়ে গেলে যা অবশিষ্ট থাকত, মায়ে-ছেলেতে মিলে তাই প্রসাদ পেতেন।

সাধুরা যখন নানারকম সৎপ্রসঙ্গ নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতেন, তখন নারদ একমনে সেইসব আলোচনা শুনে যেতেন। শুনতে শুনতে সেই ভগবৎ প্রসঙ্গ তাঁর হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে ছাপ ফেলে গেল। চাতুর্মাস্য ব্রত উদ্‌যাপনের পর সাধুরা সেই স্থান ছেড়ে চলে গেলেন। ঠিক এমনি সময়ে সর্পাঘাতে নারদের মায়েরও মৃত্যু হল। নারদ নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লেন। এই অবস্থায় তিনি কি করলেন? তিনি গভীর বনের মধ্যে চলে গেলেন। ঋষিরা কীভাবে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন থাকতেন, নারদ তা আগেই দেখেছেন। তিনিও সেইভাবে বসে ভগবানের ধ্যানে একেবারে ডুবে গেলেন এবং অবশেষে ভগবান দর্শনলাভ করে ধন্য হলেন।

দেখো ভাই, নারদ ছিলেন তো সামান্য এক দাসীর ছেলে, কিন্তু কিছুদিনের জন্যে ঋষিদের সঙ্গ লাভ করে তিনি ভগবানকে পর্যন্ত লাভ করলেন, নিজে ঋষিত্বও অর্জন করলেন। এর কারণ কী? এর একমাত্র কারণ সঙ্গের প্রভাব। তাই আবারও বলি, সৎসঙ্গের কোন তুলনা নেই।

সংসারের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তোমরা এখানে বিশ্রামক্ষেত্রে এসেছ, সাধুর আশ্রমে এসেছ। তোমাদের বিশ্রাম তো মিলবেই। বিষয় হল বিষ, বিষ কার মধ্যে থাকে? সাপের মধ্যে। বিষয়রূপী সাপের সঙ্গে তোমরা যুদ্ধ করে চলেছ, যখন সেই বিষের জ্বালায় অস্থির হও, তখনই সেই জ্বালা দূর করতে তোমাদের এই বিশ্রামের জায়গায় ছুটে আসতে হয়। এ যেন সাপ আর বেজির লড়াই। সাপ বেজিকে দু-চার ছোবল মারতেই বেজির শরীরে জ্বালা ধরে যায়। বেজি তখন কী করে? চট্ করে বনের মধ্যে ঢুকে যায়। বনে নানা রকমের ওষুধের গাছ আছে। যে গাছ বিষের ক্রিয়া নষ্ট করে, বেজি তখন সেই গাছ শুঁকতে থাকে, তাতেই তার ভিতর থেকে সাপের বিষ নেমে যায়। বিষ নামতেই বেজি আবার সাপের সঙ্গে নতুন করে লড়াই করতে প্রস্তুত হয়। তোমরাও তেমনি বিষয়-বিষে জর্জরিত হয়ে সাধু-সজ্জনদের কাছে ছুটে আসো, তাঁদের শ্রীমুখ থেকে যে উপদেশ বেরিয়ে আসে, তাতেই সেই বিষের জ্বালা দূর হয় আর তোমরাও শান্তি ও শক্তি পেয়ে আবার দ্বিগুন উৎসাহে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হতে পারো। সাধুর আশ্রমে আসা মানে আবার ঘড়িতে দম দিয়ে নিয়ে যাওয়া, যাতে ঘড়িটি সচল ও সক্রিয় থাকে। সংসারে দম ফুরিয়ে এলেই তাই বিশ্রামের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জন্যে সাধুর আশ্রমে আসবে, আবার দম ভরে নিয়ে কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

৩। সংসারীর পক্ষে সাধুসঙ্গ করবার উপায় কোথায়?

দেখো ভাই, তুমি বিদ্বান, ঘরে বসেই তো তোমার সৎসঙ্গ মিলে যেতে পারে। শাস্ত্র নিয়ে পড়তে থাকো, তাহলেই তো ব্যাস, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্রদের মতো মহাজনদের সঙ্গ, সাধুসঙ্গ মিলে যাবে। উপায় নেই তা তো নয়, ইচ্ছে থাকলে উপায় আপনিই হয়ে যায়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মোক্ষ মুক্তি

১। মোক্ষ বা মুক্তিলাভের অবস্থা কী রকম?

মুক্তিলাভের পর যে কী অবস্থা হয় তার খবর আজ পর্যন্ত কেউ দিতে পারেনি, দেবেও না। দিতে পারবেও না। আমিত্বের নাশ হলে মানুষ মুক্ত হয়ে যায়। যদি কেউ বলে যে আমি মুক্ত, তাহলে বুঝতে হবে তার আমিত্বের নাশ হয়নি, সে এখনো মুক্ত হয়নি। যদি কেউ বলে আমার মুখে জিব নেই, তাহলে কী বুঝতে হবে? জিবই যদি না থাকে তাহলে সে কথা বলছে কেমন করে? কথা যখন বলছে তখন নিশ্চয়ই তার জিব আছে। তেমনি, কেউ যখন বলে আমি মুক্ত, তখনই বুঝতে হবে সে মুক্ত নয়। আমিত্বের লোপ না হওয়া পর্যন্ত কেউ মুক্ত হতে পারে না।

ভগবানকে পেলে তবেই জীব মোক্ষলাভ করে, মুক্তিলাভ করে। সেই মোক্ষের আস্বাদ কেমন? সাধক তার সমাধির মধ্যে আর সাধারণ মানুষ সুষুপ্তির মধ্যে মোক্ষের স্বাদ কিছুটা বুঝতে বুঝতে পারে। কীভাবে বোঝা যায়? একটা ঘড়াভর্তি মধু রয়েছে, সেই ঘড়ায় একটা খড় ডুবিয়ে সেই খড় জিবে ঠেকালে মধুর রসাস্বাদন সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যায়। তেমনি সমাধিতে আর সুষুপ্তিতে মুক্তির একটা আভাস মেলে। সাধুর সমাধি আর সাধারণ মানুষের সুষুপ্তির মধ্যে কোনো তারতম্য নেই। সমাধিতে সাধকের বাইরের কোনো বোধ থাকে না, নিজের শরীর, মন, প্রাণ, কোনো কিছুরই বোধ থাকে না, কেবল এক চৈতন্যসত্তা বজায় থাকে। সেই চৈতন্যসত্তাই জানিয়ে দেয় যে সমাধি অবস্থায় আমি এক আনন্দময় সত্তায় ডুবে ছিলাম। তেমনি সাধারণ মানুষের সুষুপ্তিকালেও বাইরের কোনো বোধ না থাকলেও ঐ চৈতন্যসত্তাই সাক্ষী হয়ে জেগে থাকে। ঘুম ভাঙলে পর তাই মানুষ বলতে পারে বড়ো আরামে ঘুমিয়েছে। সমাধিতে আর সুষুপ্তিতে সেই এক চৈতন্যসত্তাই জেগে থাকে। তবে দুইয়ের মধ্যে এইটুকু তারতম্য যে সমাধি হয় প্রকাশে আর

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সুষুপ্তি হয় অন্ধকারে। ভগবানকে লাভ করার যে কী আনন্দ তা অন্য কোনোভাবে বোঝানো যায় না, সমাধি ও সুষুপ্তিতে তা অতি সামান্যভাবে বোঝা যায় মাত্র। সুনিদ্রায় যে কত শান্তি, তা সাধারণ মানুষ সবাই তা জানে। সারাদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর দেহ যখন ক্লান্তিতে এলিয়ে পড়ে, তখন দু-চার ঘণ্টা ঘুমুতে পারলে সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে যায়, মানুষ তখন নতুন শক্তি, নতুন উদ্যমে আবার পরিশ্রম করবার জন্যে প্রস্তুত হয়। দেখো, দু-চার ঘণ্টার নিদ্রাতেই মানুষের কেমন শান্তি মেলে, দেহে মনে নতুন উৎসাহ জেগে ওঠে। ঘুমের মধ্যে খানিকটা অমৃতের আস্বাদ মেলে বলেই ঘুম মানুষের কাছে এত প্রিয়। একবার ঘুম এসে গেলে সে আর কিছু চায় না, কোথায় রইল স্ত্রী-পুত্র-পরিজন, নিজের শরীরটাই বা কোথায় পড়ে রইল, এসব চিন্তাও তখন আর মাথায় আসে না। বিছানা জুটল তো ভালো, না জুটলেও যেখানে হোক শুয়ে পড়লেই হল। তারপর যখন ঘুম ভাঙল, তখনই কি সে উঠতে চায়? এক একবার চোখ খোলে, আবার চোখ বোঁজে, তবু সে ঘুম ছেড়ে উঠতে চায় না, আবার ঘুমের আরামের মধ্যে ফিরে যেতে চায়। কেন এমন হয়? তার কারণ, ঘুমের মধ্যেই যে সে পরম শান্তির সন্ধান পেয়েছে, মুক্তির একটা ক্ষীণ আস্বাদ পেয়েছে।

সমাধিতেই বলো আর সুষুপ্তিতেই বলো, যাতে এত আনন্দ, তার থেকে মানুষের উত্থান হয় কেন? মানুষ সব সময় সমাধি আর সুষুপ্তিতে মগ্ন থাকে না কেন? তার থেকে বেরিয়ে আসে কেন? এর থেকেই বোঝা যায় মানুষ নিজের ইচ্ছায় তা করে না, কর্মসূত্র জোর করে তাকে নামিয়ে আনে। সমাধির অবস্থা তো সাধারণ মানুষ বুঝবে না, তবে সুনিদ্রার অবস্থায় যে সুখ তা সবাই বোঝে। সংসারে ঘুমের মতো সুখ আর নেই। সুনিদ্রা হয় কখন? যখন শরীর নীরোগ থাকে। তাই বলা হয় সংসারে প্রথম সুখ হল নীরোগ শরীর, দ্বিতীয় সুখ সুনিদ্রা। রোগী আর পাগলের চোখে ঘুম নেই। ঘুমের মধ্যে মানুষ কিছুটা অমৃতের স্পর্শ পায়। ডাক্তাররাও একথা মানে। দেখো, কোনো রোগী ঘুমিয়ে আছে তখন তার ওষুধ খাওয়ার সময় হয়েছে। ডাক্তার বলবে, এখন ওকে ওষুধ দিয়ো না, ঘুমোতে দাও! এখন ওষুধ খাওয়ালে রোগীর যে উপকার হবে, তার চেয়ে সহস্রগুণ উপকার হবে যদি সে ঘুমোতে পারে। সাধারণ মানুষকে মোক্ষের সুখ বোঝাতে গেলে তাই সুষুপ্তির সুখ ছাড়া আর কোনো দৃষ্টান্ত দেওয়া চলে না। তবে মনে রেখো, দৃষ্টান্ত আর আসল জিনিস কিন্তু এক নয়। সাদৃশ্য অতি সামান্য, তবু যে-জিনিসের কনামাত্র প্রকাশেই এত আনন্দ, তার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পরিপূর্ণতায় যে কত আনন্দ, কত সুখ ও শান্তি হতে পারে, তা উপলব্ধি করতে হবে। যে উপলব্ধি করতে পারবে, সে-ই কেবল মুক্তির আনন্দ বুঝতে পারবে, অন্যের পক্ষে তা বোঝা সম্ভব নয়।

২। বন্ধন থেকে মুক্তি কী ভাবে হতে পারে?

মুক্তি তো গাছের ফল নয় যে গুরু তোমার হাতে দেবেন। দুধও নয় যে তোমাকেই খাইয়ে দেবেন। মুক্তি হল এমনই জিনিস যা নিজের অনুভূতি ছাড়া বুঝবার উপায় নেই। এর জন্যে চাই সর্বদা বিচার। ভগবানকে লাভ করার নামই হল মুক্তি। ভগবান তো কোথাও পালিয়ে যাননি, বিশ্বসংসারের সমস্ত বস্তুতে তিনি ওতপ্রোতভাবে বিরাজ করছেন। তোমার কর্তব্য হল সমস্ত বস্তুর মধ্যে থেকে তাঁকে খুঁজে বের করা। তাই সর্বদা বিচার করতে হয়।

ইন্দ্রিয়দের অনর্থক খাটিয়ে মেরো না শরীর ধারণ করবার জন্য যতটুকু প্রয়োজন, ইন্দ্রিয়দের দিয়ে সেই কাজটুকু শুধু করিয়ে নাও, বৃথা তাদের অপব্যায় কোরো না। প্রয়োজনীয় কাজটুকু হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয়দের বিশ্রাম দিয়ো, ইন্দ্রিয়ের আগুনকে নিবিয়ে দিয়ো। তা যদি না করো, তাহলে তোমার যা-কিছু সদ্‌বৃত্তি সব সেই আগুনে পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে, ভগবানকে লাভ করা বা মুক্তিলাভ করা তোমার পক্ষে সম্ভব হবে না।

অহংভাব অর্থাৎ আমার কর্ম, যা-কিছু করছি আমিই করছি, এই ভাব যদি ছাড়তে পারো, তাহলে যে কোনো কাজই করো না কেন, কোনো কাজই বন্ধন সৃষ্টি করতে পারবে না। হে ভগবান, যা-কিছু কাজ সব তোমারই কাজ, আমি হলাম তোমার কর্মচারী—এই ভাব নিয়ে কাজ করতে হবে।

সংসার মিথ্যা, এই জ্ঞান যার হয়েছে, সংসারের কোন জিনিসিই তার বন্ধন সৃষ্টি করতে পারবে না। জানা না থাকলে রবারের সাপ দেখেও মানুষ ভয় পায়, কিন্তু একবার যদি জানতে পারে এ আসল সাপ নয়, এ সাপ মিথ্যা, তাহলে সাপের ভয় তার, কেটে যায়, ঐ সাপ নিয়েই সে খেলা করে, কখনো নিজের জামার পকেটে রাখছে, কখনো বা অন্যকে সাপের ভয় দেখাচ্ছে। এইভাবে সেই সাপ নিয়ে ইচ্ছামতো খেলা করতে থাকে। তেমনি সংসার যে মিথ্যা, এই বোধ একবার জন্মালে কোনো কিছুতেই সাধককে বাঁধতে পারে না। শাস্ত্রে মাখনের দৃষ্টান্ত দেখানো হয়েছে। মাখন যখন দুধের মধ্যে মিশে থাকে, তখন সে অজ্ঞানী। পরে সেই দুধকে জমিয়ে দই করে, আবার যখন সেই দইকে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ঘোল করে মাখন বের করা হয়, তখন সেই মাখনকে তুমি ঘোলের মধ্যেই ফেলে রাখো আর জলের মধ্যেই ফেলে রাখো, তা ঘোল বা জলের সঙ্গে মিশে যাবে না। মাখন তখন আলগা হয়ে উপরে ভাসতে থাকবে। এতক্ষণে মাখন হল জ্ঞানী। তেমনি মানুষও যখন জ্ঞানলাভ করে, সংসারকে মিথ্যা বলে বুঝতে পারে, তখন সে-ও সংসারের সঙ্গে মিশে যাবে না, সংসারে থাকলেও তার তখন কোন ক্ষতি হবে না, সে মাখনের মতো আলগা হয়ে সংসারের উপরে ভেসে থাকবে। একেই বলে মুক্ত পুরুষ।

শঙ্করাচার্য বলেছেন ঃ

বদ্ধো হি কো যো বিষয়ানুরাগী।
কা বা বিমুক্তিঃ বিষয়ে বিরক্তিঃ।

বদ্ধ কে? বিষয়ে যার অনুরাগ, সে-ই বন্ধনদশায় পড়ে আছে। মুক্তি কাকে বলে? বিষয়ের প্রতি বিরক্তি অর্থাৎ বিষয়ের প্রতি অনুরাগ না থাকলেই মানুষ মুক্তিলাভ করে। বিষয়ানুরাগই বন্ধনের মূল কারণ, এই অনুরাগকে নাশ করতে পারলে তবেই মানুষ মুক্ত হতে পারে।

বাসনা সম্পূর্ণরূপে নাশ না হওয়া পর্যন্ত মুক্তিলাভ সম্ভব নয়। তবে উচ্চকোটির সাধক ছাড়া কেউ নির্বাসনা হতে পারে না। নিম্নকোটির সাধক তো নির্বাসনা হতে পারবে না, তাই তাদের পক্ষে শুভ বাসনা নিয়ে থাকাই মঙ্গল। সাধারণ মানুষ কত রকমের বাসনা নিয়েই থাকে, তারা নানারকম অভ্যেসের দাস হয়ে পড়ে। কু-বাসনা দূর হবে তাদের মধ্যে যদি শুভ বাসনার স্ফূরণ হয়, তাহলে একদিন সেই শুভ কামনা থেকেই তারা নির্বাসনা হতে পারবে, মুক্তিলাভ করবে।

তুমি মুক্তি মুক্তি করছ, কিন্তু জগৎসংসারে বন্ধন কোথায়? সবই তো মুক্ত। আমি যুক্তি দিয়ে একথা প্রমাণ করে দিচ্ছি, আমার যুক্তি তুমি খণ্ডন করতে পারো কিনা দেখো। চার রকমের মুক্তির কথা শাস্ত্রের বলা হয়েছে। প্রথম সালোক্য অর্থাৎ ভগবানের সঙ্গে একই লোকে বাস করার নাম সালোক্য মুক্তি। তুমি কি তাঁর সঙ্গে একই লোকে বাস কর না? ভগবান সর্বব্যাপী, কোন লোকে তিনি আছেন, কোনো লোকে নেই, তা তো নয়। তুমি যে লোকে রয়েছ, ভগবানও সেই লোকেই রয়েছেন। যদি এ লোকে তিনি না থাকেন, তাহলে তাঁকে সর্বব্যাপক কী করে বলা যাবে? তাহলে তাঁর সর্বব্যাপ্তিত্বেই যে দোষ পড়বে। এখন বিচার করে দেখো তাঁর সঙ্গে সমান লোকে থাকার দরুণ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তুমি মুক্ত কিনা। জগৎসংসারে সালোক্য মুক্তি তাই সকলের ভাগ্যেই ঘটেছে, তা থেকে কেউ বঞ্চিত নেই।

তারপর হল সামীপ্য মুক্তি অর্থাৎ ভগবানের সমীপে বা নিকটে বাস। তিনি কি তোমার কাছ থেকে দূরে রয়েছেন? তা তো নয়। তিনি 'হস্তামলকবৎ' অর্থাৎ হাতের মুঠোয় যেন আমলকি রয়েছে। হাতে আমলকি রাখলে তাতেও হয়তো বা একটু ফাঁক থেকে যায়, কিন্তু তাঁতে আর তোমাতে এতটুকুও এক চুলও ফাঁক নেই।

তৃতীয় হল সারূপ্য মুক্তি, ভগবানের সমান রূপ লাভ করা। ভগবান হলেন বিশ্বরূপ। বিশ্বের রূপের মধ্যে তোমার রূপ নেই? তুমি কি বিশ্বছাড়া? তাঁকে ছেড়ে তুমি যাবে কোথায়? তিনিও যে তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারেন না। তুমি যে তাঁরই একটি রূপ।

চতুর্থ হল সাযুজ্য মুক্তি, ভগবানের সঙ্গে অভেদে অবস্থান। সাধক যখন সমাধিস্থ অবস্থায় থাকে, তখন তার মধ্যে সংকল্প-বিকল্প কিছুই থাকে না, থাকে একমাত্র চৈতন্যসত্তা। সেই চৈতন্যসত্তাই হলেন তিনি। সমাধি অবস্থায় সাধক তার সঙ্গেই অভেদে অবস্থান করে। প্রশ্ন উঠতে পারে, সকলের তো সমাধি হয় না, যাদের হয় না তাদের পক্ষে সাযুজ্য মুক্তি কিভাবে সম্ভব? তার উত্তর হল, মানুষ যখন ঘুমোয়, সেই সুষুপ্তি অবস্থায় তো কিছুই থাকে না। জগৎসংসার সব ডুবে যায়, কিন্তু তখনো চৈতন্যসত্তার লোপ হয় না। তাতেই মানুষের সাযুজ্য মুক্তি হয়ে যায়। আচ্ছা বেশ; সাযুজ্য মুক্তিকে তুমি না হয় নাই মানলে, কিন্তু বাকি তিন রকমের মুক্তি তো তোমাকে স্বীকার করতেই হবে। কোনোরকম যুক্তি দিয়েই তো তুমি অস্বীকার করতে পারবে না। আমি জানি সবই মুক্ত, বন্ধন বলে কিছু নেই। কিন্তু সকলে তা ধারণ করতে পারে না। তাঁরই লোকে থেকে, তাঁর সমীপে বাস করে, তার সঙ্গে একরূপ হয়েও বুঝতে পারে না। এরই নাম মায়া বা অজ্ঞান।

৩। বিদেহমুক্তি আর জীবন্মুক্তি কাকে বলে?

বিদেহমুক্তির উদাহরণ শাস্ত্রে বলেছেন 'দগ্ধধান্যবৎ'! ধানকে আগুনে ফেললে তা জ্বলে যায়, তার নাম রূপ কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, তার অঙ্কুর পর্যন্ত নিঃশেষে দগ্ধ হয়ে যায়। এইরকম যাঁর অবস্থা, কর্মফলের বীজ পর্যন্ত যাঁর সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ হয়ে গিয়েছে জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত থেকে তিনি চিরতরে মুক্ত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হয়ে যান। তাঁকে আর সংসারে ফিরে আসতে হয় না। একে বলে বিদেহ মুক্তি।

জীবন্মুক্তি দু রকমের। তা কেমন? ধান থেকে তুমি খই করলে, তাতে তার নামও বদলে গেল, রূপও বদলে গেল। ধানের যে বীজ অর্থাৎ তার যে উৎপাদিকা শক্তি, সেই শক্তি খই হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হয়ে যায়। তবু তার মধ্যে প্রারব্ধের কিছুটা অবশিষ্ট থাকে। সেই প্রারব্ধটুকু নষ্ট হয় কিসে? কেউ হয়তো খই খেয়ে নিল, তাতে তার ক্ষুধা মিটল আর সেইসঙ্গে খইয়ের যেটুকু প্রারব্ধ ছিল তা নষ্ট হয়ে গেল। সাধুরা হলেন এই খইয়ের মতো মানুষ। খইয়ের যেমন নাম আর ধাম বলে চেনা যায় না, সাধুদেরও তেমনি নাম আর রূপ বদলে যায়, খইকে যেমন আর ধান বলে চেনা যায় না, সাধুদেরও তেমনি আর সাধারণ মানুষ বলে চেনা যায় না, সাধু তখন অন্তরে বাইরে গেরুয়া রঙে রঙিন হয়ে যান। খইয়ের যেমন উৎপাদিকা শক্তি থাকে না, তার থেকে আর অংকুর উদ্‌গত হয় না, তেমনি যে বীজ অংকুরিত হওয়ার দরুণ মানুষকে আবার সংসারে ফিরে আসতে হয়, সাধুদেরও সেই বীজ নিঃশেষে লুপ্ত হয়ে যায়। তাই তাঁদেরও আর জন্ম-মৃত্যুর কবলে পড়তে হয় না। শুধু প্রারব্ধের ভোগ যেটুকু অবশিষ্ট থাকে, সেইটুকুই এই জন্মে ভোগ হয়ে যায়।

এই হল এক রকমের জীবন্মুক্তি। আর এক রকম হল, যেমন ধানকে জলের সঙ্গে সিদ্ধ ক'রে সেই ধানকে জল থেকে তুলে নিলে। জলে সিদ্ধ হওয়ার ফলে ধানের উৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হয়ে গেল, কিন্তু তার নাম আর রূপের কোন পরিবর্তন হল না। এই সিদ্ধ ধানকে সাধারণ ধানের সঙ্গে মিলিয়ে দাও, তখন আর তাকে সিদ্ধ বলে বোঝা যাবে না। দেখতে এক রকম হলেও সিদ্ধ ধান থেকে কিন্তু কখনো অংকুর হয় না। গৃহীদের মধ্যেও যাঁরা সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন, তাঁদের অবস্থাও হয় এই সিদ্ধ ধানের মতো। তাঁদের নামের পরিবর্তন হয় না, রূপও বদলায় না, সাধারণ গৃহস্থের মতোই তাঁরা সংসারেই থেকে যান। কিন্তু ভিতর থেকে কর্মবন্ধনের সমস্ত বীজ তাঁদের নষ্ট হয়ে যায়। এই সব গৃহীদেরও তাই আর জন্ম-মরণশীল সংসারে ফিরে আসতে হয় না।

৪। মোক্ষকামী সাধক কি স্বর্গসুখ কামনা করে?

মোক্ষ বা মুক্তি যার লক্ষ্য, সে কখনো স্বর্গসুখ কামনা করে না, দেবতা হতেও চায় না। স্বর্গে কী আছে? মর্ত্যলোকে যা আছে, স্বর্গলোকেও তাই রয়েছে। এখানে দুর্নীতি আছে, সেখানেও তাই। দুর্নীতি না থাকলে স্বর্গরাজ্য

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রাজারও কোনো প্রয়োজন থাকত না। কিন্তু তা তো নয়, স্বর্গেও রাজা রয়েছেন ইন্দ্র। দুর্নীতি যদি না থাকবে তবে রাজার দরকার হল কেন? এখানে যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়, সেখানেও হয়। কী করে বুঝবে? যুদ্ধ-বিগ্রহ না হলে কার্তিক সেনাপতির দরকার হয় কেন? এতেই বোঝা যায় স্বর্গেও হিংসা রয়েছে! এখানে রোগ হয়, ওখানেও হয়। রোগ না হলে অশ্বিনীকুমার বৈদ্যরা সেখানে বসে আছেন কেন? বেশ্যাদের মতো অপ্সরারাও ওখানে রয়েছে! এখানে যা যা আছে, ঠিক ওখানেও ঠিক তাই আছে, তবে সাধকরা স্বর্গকামনা করতে যাবে কিসের জন্য? আর দেবতা হওয়ার কথা যদি বলো, দেবতাদেরও তো পতন হয়। মোক্ষলাভ হলে, ভগবানকে পেলে আর পতনরে ভয় থাকে না, তাই দেবতারাও মানুষের শরীরকে শ্রেষ্ঠ বলে মানেন। কেন মানেন? কারণ একমাত্র মনুষ্য শরীরেই মোক্ষলাভ হয়। মনুষ্য শরীর হল মোক্ষর দ্বার। তবে কাজ করতে হবে, চেষ্টা করতে হবে। এই দুর্লভ মনুষ্য জীবন লাভ করেছি, কেবল আহার নিদ্রা, ভয় আর মৈথুন নিয়েই ঠিক কি এই শ্রেষ্ঠ জীবন কাটিয়ে দেব? না না, তা কিছুতেই করা চলবে না। এসব কাজ তো পশুরাও করে, তারাও তো এই আহার, নিদ্রা, ভয় আর মৈথুন নিয়ে জীবন কাটায়। সৃষ্টির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ যে মনুষ্য জীবন, সেই জীবন আমরা লাভ করেছি। আমাদের ভগবানকে পেতে হবে, মোক্ষলাভ করতে হবে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম

১। জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম কি পরস্পর সম্পর্কহীন?

জ্ঞান, ভক্তি আর কর্ম এই তিন তরফে জোর লড়াই বেধেছে। জ্ঞানবাদী বলছে, জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান না থাকলে কর্মে প্রবৃত্তি আসবে কোথা থেকে? এই কাজ করলে এ ফল হবে, এই জ্ঞান না থাকলে মানুষ কাজ করতে যাবে কেন? ফলাফল না জেনে শুধুমাত্র কর্তব্যবোধে যদি কাজ করে যাও, তাহলেও তো তোমাকে কর্তব্যজ্ঞানকে মানতে হবে। কর্তব্যজ্ঞানও তো একটা জ্ঞান। কাজেই জ্ঞান না থাকলে কর্ম করা অসম্ভব। অতএব জ্ঞানই হল শ্রেষ্ঠ।

কর্মবাদী বলছে, কর্মই শ্রেষ্ঠ, কর্ম ছাড়া জ্ঞান হবে কোথা থেকে? কর্ম না করলে চিত্তশুদ্ধি হবে না আর চিত্তশুদ্ধি ছাড়া জ্ঞান লাভ সম্ভব নয়। তাই কর্মই হল প্রধান।

এদিকে ভক্তিবাদী বলছে, তোমাদের ওসব কথা মানিনে, ভক্তিই শ্রেষ্ঠ কারণ ভক্তি যদি না থাকে তাহলে শুধু জ্ঞান শুকনো খটখটে হয়ে যায়, তাতে কোন রস থাকে না আর শ্রদ্ধা ভক্তি না থাকলে ঠিকমতো কর্মও করা যায় না। সমস্ত জ্ঞানের মধ্যে, সমস্ত কর্মের মধ্যে প্রথমেই যে জিনিসটা দরকার, তা হল ভক্তি।

জ্ঞানবাদী আবার তর্ক জুড়ে দেয়, জ্ঞান না থাকলে ভক্তি টিকবে কিসের উপর নির্ভর করে? ইনি আমার প্রভু, আমি তাঁর দাস, এই জ্ঞান যতক্ষণ না হচ্ছে, ততক্ষণ ভক্তি দাঁড়াবার জায়গা পাবে কোথায়?

আপন আপন শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে জ্ঞান, ভক্তি আর কর্মের মধ্যে এইভাবে তো লড়াই শুরু হয়ে গেল। এখন এর মীমাংসা হবে কীভাবে?

দেখো, জ্ঞান বলো, ভক্তি বলো, আর কর্মই বলো, প্রত্যেকেরই উদ্দেশ্য হল, পরমার্থকে লাভ করা। এই তিনটি একই সূত্রে বাঁধা, একটির সাধন হলেই অপর দুটির সাধন সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যায়। এমন তো নয় যে কর্ম নিয়ে থাকলে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জ্ঞান বা ভক্তি লাভ হবে না। কিংবা ভক্ত কখনো জ্ঞানী বা কর্মী হতে পারবে না, আবার এমনও নয় যে জ্ঞানীর পক্ষে ভক্ত বা কর্মী হওয়া চলবে না। জ্ঞান, ভক্তি আর কর্ম, এই তিনটি পথই হল একে অন্যের সহায়ক, পরিপুরক। যার যে পথ ভালো লাগে, যে যে-পথের অধিকারী, তার পক্ষে সেই পথই হল শ্রেষ্ঠ পথ।

গীতায় ভগবান বলেছেন বটে 'ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে' অর্থাৎ জ্ঞানের মতো পবিত্র বস্তু আর কিছু নেই। তবে জ্ঞান বলতে এখানে ভক্তিমিশ্রিত জ্ঞানের কথাই বলা হয়েছে। দেখো ভাই, ভক্তি কাণ্ড, জ্ঞান কাণ্ড, কর্মকাণ্ড সবই হল বেদনির্দিষ্ট পথ। এই তিনটি হল এক একটি রাস্তা! যার যে রাস্তায় চলতে সুবিধে হবে, সে সেই রাস্তা ধরেই এগিয়ে যাবে। কিন্তু সবাই পৌঁছবে সেই একই গন্তব্যস্থলে।

রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিল-নানাপথজুষাম্।
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব।।

তাৎপর্য হল, ঋক্-যজু-সাম, এই তিন বেদ, সাংখ্য, যোগ, তন্ত্র, বৈষ্ণব প্রভৃতি কতরকম ধর্ম প্রচলিত রয়েছে। মানুষ তাদের বিভিন্ন রুচি বা প্রকৃতি অনুসারে বিভিন্ন ধর্ম অনুসরণ করে। এইসব পথের মধ্যে কোনটা সরল, কোনোটা জটিল কুটিল, কিন্তু নদী যেমন নানা পথ অতিক্রম করে পরিণামে সমুদ্রে গিয়ে মেশে, মানুষও তেমনি যে পথ ধরেই যাক না কেন, সকলেই শেষে গিয়ে পৌঁছবে সেই ভগবানের কাছে। মানুষ তার প্রকৃতি অনুসারে যে কোন রাস্তায় চলতে পারে, তাতে কোনো ক্ষতি নেই। অতি ক্ষুদ্র নদী বয়ে চলেছে, তার গতিপথে বাধার মতো দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়। নদী সেই পাহাড় ভেদ করে ছুটে চলে সমুদ্রের উদ্দেশ্যে। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম যে কোনো পথ ধরে মানুষও তেমনি ধেয়ে চলেছে ভগবানের দিকে, তার গতি রোধ করবার সাধ্য কারুর নেই। সকল বাধা অতিক্রম করে একদিন সে ভগবানের সঙ্গে মিলবেই মিলবে।

জ্ঞান পথ, ভক্তি পথ, কর্ম পথ, এই তিন পথ ছাড়া আর চতুর্থ কোনো পথ নেই। জ্ঞান রয়েছে এক ধারে, কর্ম রয়েছে এক ধারে আর মাঝখানে রয়েছে ভক্তি। অর্থাৎ জ্ঞানীকেও ভক্তির আশ্রয় নিতে হয়, কর্মীকেও ভক্তির আশ্রয় নিতে হয়। কর্মী সারাদিন ধরে কর্ম করল, কিন্তু সে সব কাজে যদি ভগবৎবুদ্ধি না থাকে, ভগবানের কাজ করছি এই ভাব না থাকে, তাহলে তার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সমস্ত কাজ ব্যর্থ হয়ে যায়। হে ভগবান, আমি যা-কিছু করছি সব তোমারই কাজ, আমার কাজে তুমি প্রসন্ন হও, এই ভাব নিয়ে কর্মীকে কর্ম করতে হবে। জ্ঞানীকেও তেমনি ভক্তিভাব নিয়ে থাকতে হয়। হে ভগবান, আমি জানি তুমি আর আমি অভিন্ন কিন্তু কীভাবে অভিন্ন? তুমি হলে সমুদ্র আর আমি হলাম নুনের পুতুল। নুনের পুতুল যেমন সমুদ্রে মিশে সমুদ্রের সঙ্গে অভেদ হয়ে যায়, আমি তেমনি তোমার মধ্যে মিশে তোমার সঙ্গে একাকার হয়ে গিয়েছি, তুমি ছাড়া আর আলাদা কোনো অস্তিত্ব নেই। এইভাবে যদি বিচার করতে পারে তবেই তার জ্ঞানী হওয়া সার্থক, নইলে ভক্তিহীন জ্ঞানে সাধক নীরস হয়ে যায়, তার মধ্যে নাস্তিকতার ভাব এসে যায়। আমিই যখন ব্রহ্ম, আমিই যখন ভগবান তখন কার জন্যে আমি সাধনা করব, এরকম ভাব ভালো নয়। জীব আর ব্রহ্ম অভেদ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু কীভাবে অভেদ? হে ভগবান, তুমি অগ্নি, আমি তোমারই স্ফুলিঙ্গ, তুমি সমুদ্র, আমি তার তরঙ্গ, এই ভাবই হল সঠিক ভাব। আমিই সমুদ্র, আমিই তরঙ্গ, এই ভাব ঠিক নয়। এইজন্যেই বলা হয়েছে, জ্ঞানীকেও যেমন ভক্তির আশ্রয় নিতে হয়, কর্মীকেও তেমনি ভক্তির আশ্রয় নিতে হয়।

জ্ঞানের মধ্যে ভক্তি আছে, তবে বাইরে থেকে তা বোঝা যায় না, সে কেমন? যেমন ফুল আর ফল। প্রথমে ভক্তিরূপী ফুল ফুটল। ফুল না হলে তো ফল হয় না, ফুল ফুটলেই বোঝা যায় এবার ফল ফলবে। তারপর যখন ফল হল তখন ফুল আপনা থেকেই ঝড়ে. পড়ল। এখন প্রশ্ন হল, ফল হলে ফুল যেমন ঝরে যায়, তেমনি জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গেই ভক্তিও কি ফুলের মতো নষ্ট হয়ে যাবে? না, ভক্তি নষ্ট হয় না। ভক্তি তখন রস হয়ে জ্ঞানরূপী ফলের মধ্যে প্রবেশ করে। ভক্তিরস মিশ্রিত যে জ্ঞান, তাই হল ঠিক ঠিক জ্ঞান। জ্ঞান হল ফল, ভক্তি হল সেই ফলের রস। যে ফলের মধ্যে রস থাকে না, তা কোনো কাজেই লাগে না। লোকে সেই শুকনো ফল ফেলে দেয়।

জ্ঞানমিশ্রিত ভক্তিও সেইরকম। যে ভক্তের মধ্যে জ্ঞান নেই, তার ভক্তি হবে কেমন করে? ভক্তি যদি জ্ঞানমিশ্রিত না হয়, জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহলে সেই ভক্তির প্রতিষ্ঠা হবে কোথায়? কোন্ আধারে? কাকে ভক্তি করব এ জ্ঞানই যদি না থাকে তাহলে ভক্তি কখনো জাগতে পারে না। পাখিকে দুটো ডানায় ভর দিয়ে উড়তে হয়, উড়বার সময় দুটি ডানাই একসঙ্গে কাজ করে। ভক্তি আর জ্ঞানও তেমনি আলাদা থাকতে পারে না। একসঙ্গেই তাদের কাজ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

চলতে থাকে। জ্ঞান আর ভক্তির আর একটা উদাহরণ দিচ্ছি। জ্ঞান হল বিহঙ্গ, ভক্তি হল বিহঙ্গীনী। জ্ঞান-বিহঙ্গ যেখানে যাবে ভক্তি-বিহঙ্গিনীও তার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে যাবে। দু'জনের কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারে না।

জ্ঞানী আর ভক্ততে কোনো তফাত নেই। জ্ঞানী যা চায়, ভক্তও সেই একই জিনিস চায়। তবে তাদের সাধনপথের কিছু কিছু তফাত থাকে। তবে যদি মেলাতে চাও তো তাও মিলে যায়। সে কেমন? না, রেললাইনের মতো। মেন লাইন, কর্ড লাইন, লুপ লাইন জায়গায় জায়গায় মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে, তারাও মিলে গিয়েছে। এখন লুপ লাইনেই কাশীধামে যাও আর কর্ড লাইনেই যাও, দুই যাত্রীর উদ্দেশ্যে কিন্তু একটিই, কাশীধামে যাব, বিশ্বনাথ দর্শন করব।

আবার দেখো, ভক্তের যে ভাবোন্মাদ আর জ্ঞানীর যে সমাধি, তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই; ভক্তের যখন ভাবোন্মাদ হয়, তখন তার বাইরের বিষয় সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান থাকে না। সমাধিতে মগ্ন জ্ঞানীর অবস্থাও ঠিক একই রকম। তবে জ্ঞানের পথ কঠিন পথ, ভক্তিপথই হল সুগম।

২। জ্ঞানী বলা হয় কাকে?

প্রদীপ জ্বলছে। সেই প্রদীপকে দেখাবার জন্যে অন্য কোনো প্রদীপের দরকার হয় না। প্রদীপ একদিকে যেমন ঘরের অন্ধকার দূর করে, তেমনি নিজেকেও নিজে উদ্ভাসিত করে রাখে। চৈতন্যরূপী পরমাত্মাও সেইরকম। তিনি জ্যোতিস্বরূপ। তাঁকে দেখাবার জন্যে অন্য কোনো আলোর দরকার হয়না। তিনি নিজেও যেমন জ্যোতির্ময়, তেমনি জগৎসংসারকেও আলোকিত করে রাখেন। সেই চৈতন্যরূপী পরমাত্মা আমাদের ভিতরেই আছেন। তাঁকে দেখতে হবে, তাঁকে অনুভব করতে হবে। যিনি এই চৈতন্যসত্তাকে অনুভব করতে পারেন, তিনিই হলেন জ্ঞানী। জ্ঞানী এক অখণ্ড চৈতন্যসত্তাকে উপলব্ধি করেছেন, তিনি জেনেছেন সেই চৈতন্যসত্তাতেই সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্থিতি, এমন কোনো বস্তু নেই যাতে সেই সত্তা বিরাজ করছে না।

জ্ঞানীকে সব সময় চেনা যায় না। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীর বিরহে কেঁদে কেঁদে বনে বনে ঘুরে বেড়িয়েছেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ষোল হাজার মহিষী নিয়ে দ্বারকায় অতুল ঐশ্বর্য ভোগ করেছেন। বশিষ্ঠ ছিলেন মহাকর্মী। শুকদেব ছিলেন মহাত্যাগী। এঁদের কি কেউ জ্ঞানী বলে চিনতে পারবে? এঁদের সঙ্গে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অজ্ঞানীদের তাহলে তফাতটা কোথায়? তাই বলছি, জ্ঞানীদের সব সময় চেনা যায় না।

সাধনার সপ্তম ভূমিতে সাধক পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে পারে। প্রথম তিন ভূমি হল অজ্ঞানের রাজত্ব। চতুর্থ ভূমিতে এসে সাধক জ্ঞানরাজ্যের দ্বারে এসে পৌঁছয়, এই চতুর্থ ভূমিই হল জ্ঞান রাজ্যের প্রবেশ দ্বার। তখনো কিন্তু তার পূর্ণ জ্ঞান হয়নি। সপ্তম ভূমিতে এসে পৌঁছলে তবেই সে হবে পূর্ণ জ্ঞানী। পূর্ণ জ্ঞানীর অবস্থা কি রকম? শাস্ত্রে এখানে মাছের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। মাছ থাকে জলে। জল থেকে তাকে তুলে নাও, সে মরে যাবে। সপ্তম ভূমির সাধকের অবস্থাও তাই। ভগবানের সঙ্গে তাঁর বিন্দুমাত্রও ভেদ থাকে না, তাঁর সঙ্গে অভেদভাবে তিনি অবস্থান করেন। সেই অভেদভাব থেকে এতটুকু বিচ্যুত হলেই তাঁর প্রাণ আর থাকবে না। এই অবস্থায় যিনি রয়েছেন, তাঁর পক্ষে ব্যবহারকার্য করা সম্ভব নয়।

কিন্তু জনক তো ছিলেন পরম জ্ঞানী। তিনি সংসারকেও ভোগ করেছেন, আবার সর্বদা ভগবানের সঙ্গে অভেদভাবে বিরাজ করতেন। তাহলেই প্রশ্ন জাগে, শরীর থাকতে কি কেউ পূর্ণ জ্ঞানী হতে পারে? শাস্ত্রে এখানে মাতালের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। মাতাল প্রচুর মদ খেয়েছে, বাইরের কোনো হুঁশ তার নেই, কোথায় কোন্ খানা-খন্দে পড়ে রইল, কাপড়-চোপড়ের কোনো ঠিক ঠিকানা নেই, হয়তো উলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাতে লজ্জা-সরমের কোনো বালাই নেই। তেমনি কোনো সাধক যখন ধর্মের মদের মাতাল হয়ে বিভোর হয়ে যায়, তখন তারও বাইরের শরীরের কোনো হুঁশ থাকে না। এরই নাম যথার্থ বিদেহ অবস্থা।

আগে যে চতুর্থ ভূমির সাধকের কথা বললাম, তার অবস্থা কী রকম? তার অবস্থা হচ্ছে কচ্ছপের মতো। কচ্ছপ জলেও থাকতে পারে আবার মাটিতেও ঘুরে বেড়ায়। সেইভাবে এই ভূমির সাধকরাও বিষয়কর্মও যেমন করে, তেমনি ভগবানের সঙ্গেও যোগাযোগ রেখে চলে।

৩। আত্মজ্ঞান লাভ সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না কেন?

সাধনসিদ্ধ না হলে আত্মজ্ঞান লাভ করা যায় না। জ্ঞানের পথ সকলের জন্যে নয়। মল, বিক্ষেপ আর আবরণ, এই তিন দোষ জ্ঞানলাভের পরিপন্থী।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শাস্ত্রে এই তিনটি বাধা দূর করবার উপায় বলা হয়েছে কর্ম, উপাসনা আর জ্ঞান। মল কাকে বলে? সাধকের চিত্তে যে ময়লা পড়েছে তাকেই বলে চিত্তমল। শুভকর্মের দ্বারা চিত্তদর্পনের এই ময়লা দূর হয়, চিত্তশুদ্ধি হয়। বিক্ষেপ হল সুখ-দুঃখের অস্তিত্ববোধ। উপাসনার দ্বারা এই চিত্তবিক্ষেপ দূর করতে হয়। অখণ্ড চৈতন্যসত্তার সঙ্গে অভেদবোধকে যা ঢেকে রাখে, তাকে বলে আবরণ। জ্ঞানের দ্বারা এই আবরণ ভেঙে গেলে দ্বৈতবুদ্ধি চলে যায়, তখনই সাধক এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ চৈতন্যসত্তায় ডুব দিতে পারে।

আবরণের এক দৃষ্টান্ত দেখো। কুয়ো থেকে খানিকটা জল নিয়ে তুমি গঙ্গার জলে মিশিয়ে দাও। কুয়োর জল গঙ্গাজলের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যাবে। আবরণ কাকে বলব? একটা বোতলে কুয়োর জল ভরলে, তারপর বোতলের মুখে একটা দড়ি বেঁধে জল সমেত বোতলটাকে গঙ্গার জলে ডুবিয়ে দাও। বোতলের মধ্যে কুয়োর জল গঙ্গাজলে ডুবল বটে, কিন্তু গঙ্গাজলের সঙ্গে মিশে গেল না। এবার তুমি দড়ি টেনে বোতলটাকে তুলে আনো, দেখবে বোতলের মধ্যে সেই কুয়োর জলই রয়েছে। এই বোতল হল আবরণ। এই আবরণকে ভাঙলে তবেই কুয়োর জল গঙ্গাজলে মিশে যাবে, তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। এইভাবে সাধক যখন নিজের ব্যক্তিসত্তাকে সম্পূর্ণরূপে দূর করতে পারে, আবরণকে ভেঙে ফেলতে পারে, তখনই সে আত্মজ্ঞানরূপী গঙ্গায় নিজেকে বিসর্জন দিতে পারে আর সেই গঙ্গার সঙ্গে মিশে গিয়ে সে পরমাত্মারূপী সমুদ্রে মিশে যায়। আবরণ না ঘোচা পর্যন্ত তা সম্ভব নয়।

৪। জ্ঞানের আলোচনা কি সকলের সঙ্গেই করা চলে?

তুমি তো ভাই শুক্ল সন্ন্যাসী, তাই গেরুয়া ধারণ না করে সাদা ধুতি পরে রয়েছ যাতে লোকে তোমাকে বাবাজী বলে চিনতে না পারে। লোকের কাছে তুমি ধরা দিতে চাওনা। তুমি হলে জ্ঞানী, মুক্ত পুরুষ, কোনো বন্ধন নেই তোমার। এতক্ষণ ধরে তোমার সঙ্গে যে সৎসঙ্গ চলছে, এবার কিন্তু তা বন্ধ করা দরকার, তাই নিয়ে আর বেশি আলোচনা করা ঠিক হবে না। শুনলে পরে লোকে নাস্তিক হয়ে যাবে, তাদের ঈশ্বরবুদ্ধি চলে যাবে। এ আলোচনা এবার বন্ধ করা যাক। বিশেষত এখানে মায়েরা বসে রয়েছে, এদের মাথায় একবার যদি এসব ভাব ঢুকে যায় তো ভীষণ অনর্থ ঘটবে, এরা সব নাস্তিক হয়ে যাবে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বেদান্তের অধিকার সকলের হয় না। বেদান্তের চর্চা সকলের সঙ্গে করতে নেই, অধিকারী ছাড়া এসব আলোচনা করা নিষেধ।

৫। জ্ঞানীর পক্ষে দেবদেবীর পূজার্চনা কি নিরর্থক?

একদিনের কথা আমার মনে পড়ছে। কে জি গুপ্ত আর পাইকপাড়ার রাজার ম্যানেজার আমার কাছে এসেছিলেন। দুজনেই ব্রাহ্ম। আমাকে তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন : "মহারাজ, পুতুল পুজো করা উচিত না অনুচিত?" আমি গুপ্ত বাবুকে বললাম : "বাবু, খুব ভালো প্রশ্ন করেছেন আপনি, তবে আপনার এ প্রশ্নের উত্তর আমি দেব না। আমি মায়ীর সঙ্গে একটু কথাবার্তা বলব, তাতেই আপনার উত্তর আপনি পেয়ে যাবেন।"

গুপ্ত বাবুর স্ত্রীকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম : "মায়ী, তুমি যখন ছোটো ছিলে তখন পুতুল খেলা করতে, না করতে না?" মায়ী বললেন : "হ্যাঁ বাবা, সব ঘরের ছোটো ছোটো মেয়েরাই তো পুতুল খেলা করে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, সবাইকার ঘরের ছোটো মেয়েরাই তো পুতুল খেলে।" তারপর তাঁকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম : "মায়ী এখনো কি তুমি পুতুল নিয়ে খেলা করো?" তিনি বললেন : "না বাবা, এখন তো আসল খেলা খেলতে হচ্ছে, তাই নকল খেলা ছেড়ে দিয়েছি।" তখন কে জি গুপ্তকে আমি বললাম : "বাবু, আপনার প্রশ্নের উত্তর মায়ীর কাছ থেকে পেলেন তো?"

গুপ্ত বাবু বললেন : "মহারাজ, এর থেকে আমি এই বুঝলাম যে যতক্ষণ আসল খেলা না মিলছে ততক্ষণ নকল খেলা করা চলে। মহারাজ, আপনি জ্ঞানী পুরুষ, জ্ঞানী পুরুষ হয়ে আপনি কেন এইসব দেবদেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন? আপনি নিজে কি এখনো পুতুল পূজো করেন, না করেন না?" আমার যেন মনে হল তিনি জানতে চান আমার আসল বস্তু লাভ হয়েছে কিনা। আমি হাসতে হাসতে তাঁকে বললাম : "বাবু, এ প্রশ্নের উত্তরও মায়ীই আপনাকে দেবেন।" আমি তখন মায়ীকে আবার জিজ্ঞাসা করলাম : "মায়ী, তুমি তো এখন আসল খেলা নিয়ে মেতে আছ, পুতুল খেলা ছেড়ে দিয়েছ। আচ্ছা বলো তো, তোমার কাছে ছোটো ছোটো মেয়েরা যখন পুতুল নিয়ে এসে বলে, মা, কী করে পুতুল খেলা করতে হয় আমাদের শিখিয়ে দাও, তখন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাদের সঙ্গে তোমাকে পুতুল খেলতে হয় কিনা?" মায়ী বললেন : "হ্যাঁ বাবা, মেয়েদের শেখাতে গিয়ে তাদের সঙ্গে আমাকেও খেলতে হয় বৈকি।"

তখন আমি কে জি গুপ্তকে বললাম : "বাবু, আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরও মায়ী দিয়ে দিলেন। দেখুন বাবু, জ্ঞানী হলেও, আসল বস্তুলাভ হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের শিক্ষার জন্যে মায়ীর মতো আমাকেও পুতুল পূজো করতে হয়।" আমার কথা শুনে কে জি গুপ্ত একেবারে চুপ হয়ে গেলেন। পরে বললেন : "মহারাজ, এই পুতুল পূজো নিয়ে আমি কতজনের সঙ্গে কতরকম তর্ক করেছি। আজ সেকথা আপনি এত সহজে আমাকে বুঝিয়ে দিলেন, তা আমার চিরকাল মনে থাকবে।"

৬। জ্ঞানী আর ভক্তে প্রভেদ কী?

তোমাদের বাংলায় একটা গান আছে, 'চিনি হতে চাই না আমি, চিনি খেতে ভালোবাসি।' জ্ঞানী চায় চিনি হতে আর ভক্ত চায় চিনি খেতে। কোন্‌টা ভালো? চিনি হওয়া, না চিনি খাওয়া? চিনি খাওয়াটাই তো ভালো মনে হয়। জ্ঞানী চায় 'সোহম' হতে, সে-ই আমি অর্থাৎ ভগবানে আর আমাতে কোনো প্রভেদ নেই। কিন্তু ভক্ত চায় চিনি খেতে অর্থাৎ ভগবানকে সম্ভোগ করতে। জ্ঞানী অদ্বৈতকে প্রতিপাদন করে আর ভক্ত চায় দ্বৈতকে নিয়ে থাকতে। জ্ঞানী বলে, 'একং ব্রহ্ম দ্বিতীয়ো নাস্তি', একমাত্র ব্রহ্মই আছেন, দ্বিতীয় আর কেউ নেই। ব্রহ্ম ছাড়া যখন আর কিছুই নেই, তখন সেই ব্রহ্মের স্বাদ গ্রহণ করবে কে? চিনির স্বাদ গ্রহণ করবে কে? অদ্বৈতবাদী তো নিজেই চিনি হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ভক্ত বলে : তুমি আছ আর আমি আছি, তুমি ব্রহ্ম, আমি জীব, তুমি ভগবান, আমি ভক্ত, তুমি প্রভু, আমি দাস। এইভাবে ভক্ত ভগবানকে আস্বাদন করতে চায়, চিনি খেতে চায়, সে চিনি হতে পারে না।

৭। মানুষের পক্ষে সকল কর্ম ত্যাগ করা কি সম্ভব?

অন্তরে নিবৃত্তি, বাইরে প্রবৃত্তি, এই হল আমার উপদেশ। বাইরে নিবৃত্তি কতদূর চলতে পারে? বাইরের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক তুমি ছেড়ে দিতে পারো,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কিন্তু শরীর ধারণ করতে হলে তো খাওয়া-দাওয়া করতেই হবে, নইলে শরীর থাকবে কী করে? খাওয়াটাও তো একটা কর্ম, তাকে তুমি ছাড়তে পারবে না। আমি যখন হিমালয়ে ঘুরে বেড়াতাম তখন এমন সব সাধু দেখেছি যাঁরা দিগম্বর হয়ে পড়ে রয়েছেন, রোদে দেহ পুড়ে যাচ্ছে, বৃষ্টিতে সর্বাঙ্গ ভিজছে, হাত তাঁদের মুষ্টিবদ্ধ, খাওয়া-দাওয়ার কোনো চেষ্টাই নেই তাঁদের মধ্যে। অন্য কোনো সাধু ভক্ত যদি কিছু খাদ্য নিয়ে তাঁদের মুখের কাছে ধরেন, তবেই তাঁরা খান। এইভাবেই তাঁরা শরীর ধারণ করে আছেন। খাবার অন্যে দিয়ে গেল। কিন্তু সেই খাবার চিবোতে হল তাঁদেরই, চিবিয়ে গলা দিয়ে নামাতেও হল তাঁদের। এই কাজটুকুও তাঁদেরই করতে হল। ভোগ ছাড়া এই স্থূল শরীর থাকতে পারে না, শরীরকে তাই কিছু আহার দিতেই হয়। ভগবান এই এক চালেই সংসারকে বেঁধে রেখেছেন, তা হল আহার।

আহারের যদি দরকার না হত, তাহলে কোনো কিছুরই দরকার হত না। এই আহারের জন্যেই সকলকে এক একজনের অধীনে থাকতে হয়। কত সাধু আমাকে এসে বলে, বাবা, আমি কর্মশূন্য হতে চাই, আমাকে সেইরকম উপদেশ দিন। আমি তাদের বলি, কর্মশূন্য হওয়ার কোনো উপদেশ আমার কাছে নেই। সকল কর্ম তুমি তো ত্যাগ করতে পারবে না, প্রাণীমাত্রকেই প্রাণকর্ম করে যেতে হবে। প্রাণকর্ম কী? না, শ্বাস-প্রশ্বাস। শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া তো তোমাকে সব সময়েই করে যেতে হবে, একে তুমি ছাড়বে কী করে? শ্বাস-প্রশ্বাসটাও তো একটা কর্ম।

তবে একটা কথা বলি। দেখো ভাই, অনর্থক কাজ বাড়িয়ো না। মনে রেখো ঃ

বঢ়তে বঢ়তে বঢ় গয়ে হাথী ঘোড়া জিন্।
ঘটতে ঘটতে ঘট গয়ে কর করোয়া কৌপীন্।।

কাজ বাড়ালেই কাজ বেড়ে যাবে, অল্প জিনিসে তখন আর তোমার চলবে না। তখন কত জিনিসের দরকার হবে তোমার। হাতি চাই, ঘোড়া চাই, ঘোড়ার পিঠে দেবার জন্যে জিন চাই। আবার সাধু হয়েও যদি কাজ বাড়াতে থাকো তাহলে তোমার কমণ্ডলু নিতে হবে, কৌপীন ধারণ করতে হবে। কাজ বাড়ালেই কাজ বাড়বে। এইভাবে কাজ যদি বাড়িয়েই চলতে থাকো, তাহলে কাজের আর

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অন্ত থাকবে না। তাই আমার উপদেশ, যে শুভ কাজ তোমার সামনে আসবে তাকেই ভালোভাবে সম্পন্ন করবার চেষ্টা করো। কাজের ফলের দিকে নজর দিয়ো না, ফলাফলকে ভগবানের উপর ছেড়ে দাও। অন্তরে নিবৃত্তি, বাইরে প্রবৃত্তি, আজ এখান থেকে এই উপদেশই নিয়ে যাও, অন্তরে ফলাকাঙ্খা না রেখে বাইরে কাজ করতে থাকো। এইটি শুধু জেনে রেখো যে মানুষের পক্ষে কর্মশূন্য হয়ে থাকা সম্ভব নয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভক্তি-ভক্ত-ভগবান

১। ভক্তিকে সবচেয়ে সহজ পন্থা বলা হয় কেন?

বেদের তিন কাণ্ড—জ্ঞানকাণ্ড, কর্মকাণ্ড আর ভক্তিকাণ্ড। জ্ঞানকাণ্ড বড়ো কঠিন, গোড়ার দিকে তাতে কোন রস পাওয়া যায় না, আনন্দও মেলে না। কর্মকাণ্ডও সহজ নয়, তাছাড়া এতে অর্থের ও সামর্থ্যের দরকার। সকলের পক্ষে তাই কর্মকাণ্ড সুগম নয়। তবে ভক্তিকাণ্ড হল সকলের পক্ষে এক সহজ পথ। ভক্তির যে সাধন, তাতে গোড়া থেকেই সাধক আনন্দ পায়। দেখো ভাই, জ্ঞান হল শুকনো ফলের মতো, যাকে দেবে সে-ই বলবে ওতে রস নেই, ফেলে দাও। ভক্তি কিন্তু যেমন মিষ্টি তেমনি স্নিগ্ধ।

ভক্তির মতো সহজ পন্থা আর কিছুই নেই। ভক্ত যারা, তারা তো মুক্তি চায় না, তারা বলে মুক্তি তো ভক্তির দাসী। ভক্তিরূপী মাকে ছেড়ে মুক্তিরূপী দাসীকে চাইতে যাব কেন? ভক্তি ছোট-বড়ো বিচার করে না। রামচন্দ্র হলেন পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন, আর গুহক হল চণ্ডাল, কিন্তু দেখো, গুহকের ভক্তিতে রামচন্দ্র হলেন তার বন্ধু, পরম প্রেমে তিনি তাকে আলিঙ্গন না করে থাকতে পারলেন না। রামচন্দ্র যখন বনে গেলেন, তখন বনবাসী ঋষিরা তাঁর কত স্তব-স্তুতি কত পূজার্চনা করলেন যাতে তিনি তাঁদের প্রতি প্রসন্ন হন। কিন্তু রামচন্দ্রের নজর সেদিকে ছিল না, তিনি এদিক ওদিক দৃষ্টিপাত করে কাকে যেন খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। ঋষিরা অবাক হয়ে জানতে চাইলেন ভগবান কেন তাঁদের পুজো গ্রহণ করছেন না, চারিদিকে চেয়ে কাকে তিনি খুঁজে বেড়াচ্ছেন। রাম ঋষিদের বললেন : "আমি আমার ভক্তের জন্যে যতটা ব্যাকুল, জ্ঞানীদের জন্য তত ব্যাকুলতা আমার নেই। যে চণ্ডালদের তোমরা তোমাদের কাছে ঘেঁষতে দাও না, আমি সেই চণ্ডালকন্যা শবরীর জন্যে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছি, তার দর্শন না পেয়ে আমি আর স্থির থাকতে পারছিনে।" ঋষিরা তখন বললেন : "হে রাম তোমাকে দর্শন করব বলে কত তপস্যা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করেছি, কত উপবাস, পঞ্চতপ করেছি, সেসবের চেয়ে তোমার কাছে বড়ো হল এক চণ্ডালের মেয়ে!" রাম তাঁদের বললেন ঃ "তোমরা আমার জ্ঞানী ভক্ত হলেও তোমাদের মধ্যে প্রেম ভক্তির অভাব রয়েছে। কিন্তু শবরী আমাকে জয় করেছে তার প্রেম ভক্তিতে, তাই সে আমার কাছে অনেক বড়ো।" ঋষিরা তখন কাতর প্রাণে শ্রীরামচন্দ্রের কাছে প্রেম ভক্তি লাভের বর চাইলেন। রাম বললেন ঃ "তোমাদের এজন্মে তা আর সম্ভব হবে না। দ্বাপর যুগে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান হয়ে আবার আমি ফিরে আসব, তোমরাও তখন আসবে বৃন্দাবনের গোপী হয়ে! সেই সময় প্রেম ভক্তির ডোরে আমি তোমাদের কাছে বাঁধা পড়ব, ধরা দেব।"

দেখো ভাই, ভক্তিতে উঁচু-নিচুর বাছ-বিচার নেই। কোথায় ভগবান শ্রীরামচন্দ্র আর কোথায় চণ্ডালের মেয়ে শবরী, কোথায় শ্রীকৃষ্ণ ভগবান আর কোথায় গোপকন্যারা! নীচু কুলে জন্ম হলেও কোনো ক্ষতি নেই, ভগবানের যদি প্রেম ভক্তি থাকে তাহলেই মানুষ উদ্ধার হয়ে যায়। এইজন্যেই বলা হয় ভক্তির মতো সহজ পথ আর নেই।

ভক্তির পথ অবলম্বন করলে সহজেই ভগবানকে লাভ করা যায়। ভক্ত হল দ্বৈতবাদী! দেখো, ভগবান কেমন নিজে থেকেই দ্বৈতবাদীর পক্ষ নিয়ে নিয়েছেন। কেমন করে তা বোঝা যায়? সৃষ্টির দিকে নজর দাও, তাহলেই বুঝতে পারবে। দেখেছ তো, সৃষ্টির মধ্যে সবই কেমন দুই-দুই ভাবে রাখা হয়েছে। দিন আর রাত্রি, আলো আর অন্ধকার, প্রকৃতি আর পুরুষ, সুখ আর দুঃখ, সংযোগ আর বিয়োগ, সব কিছুতেই দ্বৈতভাব। বীজ থেকে গাছের যখন নতুন পাতা বেরোয় তখন প্রথমেই দুটি পাতা বের হয়। একটা পাতা বেরুল না কেন? পাখি দুটি পাখা মেলে আকাশে ওড়ে, মানুষ দুই পায়ে হাঁটে। ভগবানের রচনাতে তো তাই দেখতে পাই। মায়া আর ব্রহ্ম, জীবাত্মা আর পরমাত্মা, যেদিকে তাকাও সর্বত্র দেখবে ভগবান দুই-দুই করে সব জিনিস রেখেছেন। এর থেকেই বুঝে নাও ভগবান নিজেই যেন দ্বৈতবাদীর পক্ষ অর্থাৎ ভক্তের পক্ষ নিয়ে বসে আছেন।

২। ভক্তি কিভাবে লাভ করা যায়?

ভক্তি তো সকলের মধ্যেই রয়েছে, তবে তার গতি রয়েছে নিম্নমুখী। সেই গতিকে উর্দ্ধমুখী করতে হবে। ভক্তির চারটি নাম—মোহ, স্নেহ, প্রীতি আর

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভক্তি। মোহ হয় টাকাকড়ির উপর। ভেবে দেখো, টাকা রোজগারের ধান্দায় স্ত্রী-পুত্রদের কথাও মানুষের মনে থাকে না, নিজের শরীরকে পর্যন্ত বিকিয়ে দেয়, পরে দাসত্ব স্বীকার করতেও সে কুণ্ঠিত হয় না। ভগবানকে লাভ করবার জন্যে এরকম মোহ কি দেখা যায়? কখনোই নয়। তা যদি যেত, তাহলে তার ভগবান মিলে যেত।

স্নেহ হয় ছেলের প্রতি। যতক্ষণ ছেলে না হচ্ছে ততক্ষণ মানুষ ভালো খাবার যা-কিছু পায়, নিজেই খেয়ে নেয়। তারপর যখন ছেলে হল তখন ভালো খাবার নিজে না খেয়ে ছেলেকে খাওয়ায়, ছেলেকে ভালো ভালো পোশাক পরিয়ে আনন্দ পায়, কত পরিশ্রম করে টাকা রোজগার করে, সব পুঁজি করে রাখে ছেলের জন্যে। দেখছ তো স্নেহ কাকে বলে। স্নেহের একটা উদাহরণ দিচ্ছি, শোনো।

এক সাধুর এক শিষ্য ছিল। শিষ্য সাধুর ঘর ঝাঁট দিত, বাসন মাজত, এটা-সেটা ফাই ফরমাশ কাটত। একদিন গুরুর কাছে আসতে শিষ্যের দেরি হয়ে গেল? সাধু জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "আজ তোমার এত দেরি হল কেন?" শিষ্য বলল ঃ "বাবা আমার বিয়ের আজ পাকা দেখা হল।" সাধু বললেন ঃ "যাক্, তুমি তাহলে আমাকে ছেড়ে চললে। আর কি তোমাকে দিয়ে আমার কোনো কাজ হবে?" শিষ্য জিজ্ঞাসা করল ঃ "এমন কথা কেন বলছেন বাবা?" সাধু বললেন ঃ "তোমার বিয়ে হবে, তোমাকে এখন রোজগার করতে হবে, এখন আর আমার কাজকর্ম কী করবে?" কদিন বাদে শিষ্য এসে জানাল তার বিয়ে হয়েছে। এবার সাধু বললেন ঃ "বাবা, এবার তুমি তোমার বাপ-মাকেও ছাড়লে। এখন থেকে তুমি যা উপার্জনের টাকা সব তোমার বউয়ের হাতেই তুলে দেবে।" আরও কিছুদিন যায়। একদিন শিষ্য এসে গুরুকে বলল তার একটি ছেলে হয়েছে। শুনে সাধু বললেন ঃ 'যাক্, এবার তুমি নিজেকেও ছাড়লে। এতদিন তবু নিজেদের ভালো খাওয়া, ভালো পরার দিকে তোমার নজর ছিল, এখন তোমার ছেলে হয়েছে, এখন থেকে ভালো যা-কিছু পাবে, তুমি নিজে না খেয়ে বলবে আমার ছেলেকে খাওয়াব, ভালো পোশাক ছেলেকে পরাব। এইভাবে এখন তুমি নিজেও বঞ্চিত হলে।"

এখন দেখো, ছেলের প্রতি মানুষের এতই স্নেহ যে সে তার জন্যে নিজেকেও কীভাবে বঞ্চিত করে। এই স্নেহ যদি ভগবানের জন্যে হয়, যদি মনে এই ভাব জাগে যে যা-কিছু ভালো জিনিস মিলল তা প্রথমেই ইষ্টদেবকে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নিবেদন করে দেব, ভগবানকে অর্পন করব, তাহলেই স্নেহ উর্দ্ধগামী হবে। নইলে ছেলের প্রতি এই যে স্নেহ, তা নিচের দিকেই নিয়ে যায়, তা আর উপরে উঠতে দেয় না।

মোহ আর স্নেহের কথা হল। এবার প্রীতি। প্রীতি হয় স্ত্রীর প্রতি। স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসায় মানুষ কত কাণ্ডই না করে চলেছে, কিন্তু এই প্রীতি যদি সে ভগবানে অর্পণ করতে পারে, তাহলেই তা উর্দ্ধগামী হয়ে ওঠে।

মোহ, স্নেহ, প্রীতি, এই তিনটিই যখন উর্দ্ধগামী হয়, তখন তার নাম হয় ভক্তি। ভক্তি আলাদা কোনো ব্যাপার নয়। মোহ, স্নেহ, প্রীতি তো সকলের মধ্যেই রয়েছে। এদের ঈশ্বরমুখী করতে পারলেই তা উর্ধ্বগামী হবে আর তার নাম হবে ভক্তি। চিত্ত একেবারে নিষ্কাম হলে তবেই ভক্তি হতে পারে, নিষ্কাম না হলে হবে না।

ভক্তি তো এক কথায় লাভ করা যায় যায় না, ভক্তিলাভেরও একটা ক্রম আছে। তা হল সাধনসাপেক্ষ। ভক্তিসাধনের নটি ধাপ, 'নববিধা ভক্তি'। এই নববিধা ভক্তি যদি সাধন করতে পারো তাহলে ভক্তির চরম সীমায় তুমি পৌঁছে যাবে, তোমাকে আর অন্য কোন সাধন করতে হবে না এই নববিধা ভক্তিসাধনের দ্বারা শ্রীভগবান একেবারে আপনার জন হয়ে যান।

নববিধা সাধনের প্রথমেই হল শ্রবণ, শ্রী ভগবানের নাম শ্রবণ করতে হবে। দ্বিতীয় কীর্তন, তাঁর গুণকীর্তন করতে হবে। তৃতীয় স্মরণ, সর্বদা তাকে স্মরণ করতে হবে। চতুর্থ পাদসেবন, তাঁর পাদপদ্মের সেবা, পঞ্চম অর্চন, তাঁর পূজা উপাসনা, ষষ্ঠ বন্দন, তাঁর স্তব-স্তুতিতে মগ্ন থাকা। তারপর সপ্তমসাধন দাস্য, তোমাকে তাঁর দাস হতে হবে। অষ্টম হল সখ্য, তাঁর সঙ্গে বন্ধুর মতো সম্পর্ক স্থাপন আর নবম বা শেষ সাধন হল আত্মনিবেদন। এখানে নিজেকে শ্রীভগবানের চরণে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করতে হবে। এই আত্মনিবেদনের দ্বারা কী হবে? তুমি হবে ভগবানের, ভগবান হবেন তোমার। এতে কোনো সংশয় কোরো না। গীতাতে ভগবান নিজেই বলেছেন ঃ

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্তৈবমাত্মানং মৎপরায়ণ ঃ।।

তুমি মদ্‌গতচিত্ত হও, আমার ভজনশীল ও পুজনশীল হও। কায়মনোমাক্যে আমাকে প্রণাম করো। এইভাবে মৎপরায়ণ হয়ে, আমার শরণাপন্ন হয়ে আমাতে মন সমাহিত করলে তুমি আমাকেই লাভ করবে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এ হল ভগবানের নিজের মুখের কথা, মদ্‌গতচিত্ত হলেই তুমি আমাকে পাবে। দেখো ভাই, শ্রীভগবানের এমন আশ্বাসবাণী সত্ত্বেও মানুষ তাঁর দিকে ফেরে না। তাঁকে ভালোবাসতে চায় না, এমনই বেইমান হল মানুষ।

কত মায়েরা আমার কাছে এসে বলে বাবা, আপনার কাছে আমি দীক্ষা নেব। আমি জিজ্ঞাসা করি, মা, তুমি তোমার স্বামীকে প্রণাম করো তো? তারা বলে, না বাবা, প্রণাম করি না। আমি বলি, মা তুমি পতিভক্তি শিক্ষা করোনি আর এসেছ জগৎপতিকে ভক্তি করবার শিক্ষা করতে! কত ছেলে-ছোকরা এসে বলে, বাবা আপনার কাছ থকে দীক্ষা নেব। আমি জিজ্ঞাসা করি, তোমরা মাতাপিতাকে রোজ প্রণাম করো তো? তারা বলে, না বাবা, প্রণাম করি না। আমি হাসি আর ভাবি, পিতামাতা হলেন জীবন্ত দেবতা, তোমরা তাঁদের ভক্তি করো না, আর কোথায় রয়েছেন জগৎপিতা, তোমরা এসেছ তাঁকে ভক্তি করতে?

ভক্তিশিক্ষার প্রথম সিঁড়ি হল পিতামাতা। পিতামাতার প্রতি ভক্তি হলে তবে গুরুভক্তি হবে, গুরুভক্তি হলে তবে হবে ঈশ্বরভক্তি। মায়েদের জন্যেও আমার উপদেশ। প্রথমে পিতামাতাকে ভক্তি করবে, বিয়ের পর স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ীকে ভক্তি করবে, তবেই গুরুভক্তির অধিকারী হবে, পরে ঈশ্বরভক্তি লাভ হবে। মায়েদের ভক্তিশিক্ষার প্রথম সিঁড়ি হল স্বামী। ছেলে-মেয়েদের ভক্তিশিক্ষার প্রথম সিঁড়ি পিতামাতা।

৩। নিষ্কাম ভক্ত কাকে বলে?

কামনা ছাড়া কেউ কি কোনো কাজ করতে পারে? মানুষ যে ভগবানকে চায়, সে চাওয়া কি কামনা নয়? সেদিক থেকে দেখলে কেউই নিষ্কাম নয়। বিনা প্রয়োজনে কোনো কাজ হতে পারে না। তবে নিস্কামের কামনা কী রকম? নিষ্কামী অল্পে সন্তুষ্ট হয় না, সে ভগবানের সর্বস্ব অধিকার করে নিতে চায়। সে বলে ঃ "সংসারে যা-কিছু আছে সবই হল ভগবানের, কিন্তু ভগবান হলেন আমার।" ভক্ত এইভাবেই ভগবানকে আপন করে নেয়। ভগবানকেই যখন সে আপন করে নিল, তখন তার পাওয়ার আর বাকী রইল কী? ভগবানের সঙ্গে সঙ্গে তার যে সবকিছুই মিলে যায়। স্বয়ং ভগবানই যার কাম্য, তাকে তাহলে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নিষ্কাম বলা যায় কী করে? তবে এর মধ্যে একটা কথা আছে। ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তির জন্য যে সুখ, সেই সুখ হল কামনাযুক্ত আর ইন্দ্রিয়রহিত যে সুখকে নিষ্কাম বলা হয়। ভগবান তো ইন্দ্রিয়ের অতীত, তিনি তো ইন্দ্রিয়ের বিষয় নন, তাই ভগবানকে লাভ করবার যে প্রার্থনা, তাকে নিষ্কাম বলতে কোনো দোষ নেই! যে ভক্ত এইভাবে ভগবানকে চায়, তাকেই নিষ্কাম ভক্ত বলা হয়।

৪। সকাম আর নিষ্কাম ভক্তের মধ্যে পার্থক্য কী?

সকাম আর নিষ্কাম, এই দু রকমের সাধক আছে। সকাম সাধকের চেয়ে নিষ্কাম সাধক শ্রেষ্ঠ। সকাম সাধকের ভক্তি টেঁকে না, স্থায়ী হয় না। যতক্ষণ পর্যন্ত তার কামনা পূর্ণ না হলো ততক্ষণ পর্যন্তই তার প্রেম, কামনা পূর্ণ হয়ে গেলেই তার ছুটি হয়ে গেল। আর সে ভগবানকে ডাকবে না। নানারকম সকামী লোক আমার কাছে এসে বলেঃ বাবা, আমার ছেলের বড়ো অসুখ, কিছুতেই সারছে না, আশীর্বাদ করুন সে যেন রোগমুক্ত হয়। কেউ বলে ঃ বাবা, আমার একটা মামলা চলছে, মামলায় যেন জিততে পারি সেই আশীর্বাদ করুন। দেখতে পাই এইসব সকামী লোকেদের ভক্তি টেঁকে না। তাদের কামনা পূর্ণ হলেই তারা ভেগে যায়, পূর্ণ না হলেও ভাগে, সরে পড়ে। ভাবে, এতদিন স্বামীজীর কাছে যাতায়াত করছি, লাভ তো কিছুই হল না, বৃথা আর এখানে এসে কি হবে? কামনা যাদের পূর্ণ হয় তারাও আর আসে না। ভাবখানা এই, কামনা যা ছিল তা তো মিটে গিয়েছে এখানে আসবার আর দরকার কী? এইজন্যে নিষ্কাম ভক্তই ভালো, তারা কখনো এভাবে পালিয়ে যায় না। পুরাণে এর অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে।

নিষ্কাম ভক্তকে কতরকম দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে ফেলে ভগবান তাকে পরীক্ষা করে দেখেন, সে কিন্তু তার মধ্যেই অচল অটল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, এত দুঃখকষ্টের মধ্যেও তার ভক্তি এতটুকু হ্রাস পায় না। বুড়ির গরু মরার সেই গল্পটা জানো তো? পরম ভক্ত বুড়ির বাঁচবার একমাত্র অবলম্বন ছিল একটা গরু। ভগবান অতিথির ছদ্মবেশে এসে বুড়িকে বর দিয়ে গেলেন, তোমার গরুটি মরে যাক। তুমি হয়তো বলবে, যে-ভক্ত একমাত্র তাকে ছাড়া আর কিছুই চায় না, তাকে তিনি এমন দুর্দশায় ফেললেন কেন? কারণটা হল, তার ভক্তি খাঁটি কিনা, দুঃখ দিয়ে তিনি তা যাচাই করে নেন। তাছাড়া তার যদি অন্য কোনো বিষয়ে আসক্তি থাকে, সেই আসক্তি দূর করবার জন্যেই অভাব-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অনটনের মধ্যে ফেলে তাকে তিনি নিজের দিকে আকর্ষণ করতে থাকেন। প্রকৃত নিষ্কাম ভক্ত অনায়াসে এইসব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে একমাত্র তাঁরই উপর নির্ভর করে থাকে।

আবার দেখো, নিষ্কাম ভক্তের সমস্ত প্রয়োজনই ভগবান মিটিয়ে দেন। সে তো কিছু কামনা করে না, ভগবানের কাছে কিছু চায় না, তার যা-কিছু প্রয়োজন ভগবান তা আপনা থেকেই পূর্ণ করে দেন, তাঁর কাছে কিছু চাইতে হয় না। নিষ্কামীর অধিকার কি কম? রাজরাজেশ্বর ভগবানকে যে সে আপন করে নেয়, তাই তারা যা-কিছু পাপের ঋণ, তা তিনি মিটিয়ে দেন, পাপরূপী পাওনাদারেরা তার কিছুই করতে পারে না। চিত্রগুপ্ত যখন তার দলিল-দস্তাবেজ নিয়ে হাজির হয়, ভগবান তখন তাঁর প্রিয় সেবকের জন্যে পাপরূপী পাওনাদারদের সেই হ্যাণ্ডনোট ছিঁড়ে ফেলে তাকে তার পাদপদ্মে স্থান দেন।

সকাম ও নিষ্কাম ভক্তির মধ্যে নিষ্কাম ভক্তিই শ্রেষ্ঠ। তবে বাংলায় তোমাদের একটা কথা আছে না নেই মামার চেয়ে কানা মামাও ভালো', তেমনি একেবারে ভক্তি না থাকার চেয়ে সকাম ভক্তি থাকাও ভালো। সকাম ভক্তিও শেষকালে ভগবানের ছোঁওয়ায় সাক্ষাৎ সংস্পর্শে নিষ্কাম হয়ে যায়, যেমন ধ্রুবর ভক্তি। পিতৃস্নেহ আর সিংহাসনের কামনা করে ধ্রুব কঠিন তপস্যা আরম্ভ করেছিলেন। কামনাযুক্ত ভক্তিকে শাস্ত্রে বলা হয়েছে সকাম ভক্তি। ভগবানের প্রতি ধ্রুবর এই যে ভক্তি, তা হল সকাম ভক্তি। কিন্তু তপস্যা শেষ হওয়ার পর ভগবান যখন ধ্রুবর সামনে এসে দেখা দিলেন, তখন ধ্রুব তাঁকে বললেন ঃ 'আমার আর কোনো অভিলাষ নেই, আমি আপনার দর্শন পেয়েছি, তাতেই আমার সমস্ত কামনা পূর্ণ হয়ে গিয়েছে।" গোড়ার দিকে ধ্রুবর সাধনা ছিল সকাম, পরে ভগবানকে পেয়ে তা নিষ্কাম হয়ে গেল। সাধনার ক্ষেত্রে এইরকমই হয়ে থাকে, সকাম ভক্তিও পরিণামে নিষ্কাম হয়ে যায়, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

৫। ভক্তের কাছে ভগবান কী চান?

ভক্তের কাছে ভক্তি ছাড়া ভগবান আর কিছুই চান না। প্রেম ভক্তি ভালোবাসা ছাড়া অন্য কিছুতে তিনি খুশি হন না। তবে প্রকৃত ভক্ত তার সবচেয়ে প্রিয় বস্তুটিই ভগবানকে অর্পণ করে। মানুষের কাছে সবচেয়ে প্রিয় বস্তু কী? তন-মন-ধন। ভক্ত এই দিয়েই ভগবানকে পূজো করে, নিজের মতো

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভেবে তার সেবা করে। যে পরিমাণে সে তার 'তন-মন-ধন' ভগবানের সেবায় উৎসর্গ করতে পারে, সেই পরিমাণে সে ভগবানের বিভূতিস্বরূপ আনন্দ ও সন্তোষ লাভ করে। যে ভক্ত ভগবানের শ্রীচরণে যতখানি আত্মনিবেদন করতে পারে, ভগবানও ঠিক ততখানিই তার কাছে বিকিয়ে দেন। দেখো, তোমার টাকা-পয়সা না থাকতে পারে, তাতে কী হয়েছে? তুমি তোমার দেহ আর মনকে ভগবানের পায়ে সমর্পণ করে দাও। এখানকার টাকা-পয়সা সব এখানেই পড়ে থাকবে। তাই তোমার প্রতি আমার উপদেশ, জীবন-মরণের সাথী যে ধর্মধন, সেই ধন তুমি আহরণ করো।

৬। ভক্তির কি তারতম্য আছে?

ভক্তি দুরকমের হয়, গলাভক্তি আর প্রেমভক্তি। গলাভক্তির দৃষ্টান্ত হল ঘি। কী রকম? সূর্যের কিংবা আগুনের উত্তাপে ঘি গলে যায়, আবার ঠান্ডার স্পর্শ পেলেই বা শীতকালে তা জমে গিয়ে শক্ত হয়ে যায়। সাধকদের মধ্যেও দেখা যায় তারা যতক্ষণ গুরুর কাছে রইল, তাঁর কাছে ভগবান সম্বন্ধে উপদেশ শুনতে লাগল, ততক্ষণ ভগবানের বিষয় তারা বেশ বুঝতে পারে, কিন্তু গুরুর কাছ থেকে যেই তারা সংসারে ফিরে যায়, অমনি বিষয়ের সংস্পর্শে এসে তাদের হৃদয়ও শক্ত হয়ে ওঠে, ঘিয়ের মতো জমে যেতে থাকে। এই ধরনের সাধকদের যে ভক্তি, তাকে বলে গলাভক্তি। এদের দ্বারা ভগবানকে লাভ করা সম্ভব নয়।

প্রেমভক্তি কী রকম? সাধক গুরুর কাছেই থাকুক আর সংসারেই থাকুক, সব সময় ভগবানের প্রতি তার প্রেম যেন ঢল ঢল করতে থাকে। এই ভাবকেই বলা হয় প্রেমভক্তি। এইরকম ভক্তিতেই ভগবানের দর্শন মেলে।

৭। ভক্তকে ভগবানের চেয়ে বড় বলা হয় কেন?

শাস্ত্রে ভগবানের চেয়ে ভক্তকে শ্রেষ্ঠ আসন দেওয়া হয়েছে। দেখো, সীতাদেবী ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের পরম ভক্ত। কিন্তু যে কেউ শ্রীরামচন্দ্রের উপাসনা করবে, তাকেই আগে সীতাদেবীর নাম উচ্চারণ করে বলতে হবে সীতারাম! প্রথমে ভক্তের নাম, পরে ভগবানের নাম। এইভাবেই বলা হয় রাধাকৃষ্ণ, গৌরীশংকর, লক্ষ্মীনারায়ণ। এতে বুঝতে হবে ভগবানের চেয়ে ভক্ত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বড়ো। ভক্তকে বড়ো বলা হয়েছে কেন? ভগবান তো ভক্তকে আপন করে নিতে পারেন না, ভক্তই পারে ভগবানকে আপন করতে। ভগবান হলেন নির্গুণ, ভক্ত তাঁকে সগুণ করে নেয়। ভগবান নিরাকার, কিন্তু ভক্তের জন্যে তাঁকে সাকার মূর্তি ধারণ করতে হয়। যিনি অসীম, ভক্তের জন্যে তাঁকে সীমার বাঁধনে বাঁধা পড়তে হয়। রাম, কৃষ্ণ আদি যত অবতার দেখছ, সবাইকে আসতে হয়েছে ভক্তেরই জন্যে। এইজন্যেই বলা হয় ভক্ত ভগবানের চেয়ে বড়ো।

৮। শুধু অন্ধবিশ্বাসের দ্বারা কি ভগবানকে পাওয়া যায়?

ভেবেচিন্তে বুঝে শুনে তবে ভগবানকে জানতে হবে এমন কোনো কথা নেই। ছোটো ছেলের মুখে মধু দিলে সে তা চুক চুক করে চুষতে থাকবে, কেমন করে মধু তৈরি হচ্ছে, কীভাবে মৌমাছি মৌচাক তৈরি করছে, মানুষই বা কীভাবে মৌচাক ভেঙে মধু সংগ্রহ করছে, এসব কথা তার জানা নেই। কিন্তু মধু যে মিষ্টি, সে বোধটুকু তার মধ্যে রয়েছে, তাই সে পরমানন্দে মধু চুষতে থাকে। তেমনি এখানে যেসব আলোচনা হচ্ছে, এই মায়েরাও তো তা শুনছে, তারা যে কিছুই বোঝে না তা যেন মনে কোরো না। এসব আলোচনা তাদের কাছেও মিষ্টি লাগে। যুক্তি-তর্ক বা জ্ঞান-বিচার দ্বারা এরা হয়তো ভগবানকে বুঝতে পারবে না, কিন্তু আত্মবিশ্বাস আর অনন্যা ভক্তির দ্বারা এরা ঠিক ভগবানের বিষয় বুঝে নেয়।

মা যশোদা তো শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলে জানতেন না, তাঁকে তিনি নিজের ছেলে গোপাল বলেই জানতেন। নাই বা জানলেন ভগবান বলে, ছেলে মনে করেই তিনি ভগবানের যে সেবা করেছেন, তাতেই তিনি পরমা গতি লাভ করেছেন, তাঁর স্বধামপ্রাপ্তি ঘটেছে। এই যে মায়েরা এখানে বসে রয়েছে, এরাও যদি ভগবানকে নিজের ছেলের মতো দেখতে পারে, ডাকতে পারে, তাহলে এরাও যে ভগবানকে লাভ করবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

এরা জ্ঞানী না হতে পারে, কিন্তু দেখো কেমন অভিভূত হয়ে আমার কথা শুনছে। কেন শুনছে? মিষ্টি লাগছে বলেই শুনছে। মিষ্টি যদি না লাগত তাহলে এরা এখানে বসে থাকত না, উঠে চলে যেত। বালক বলো, বৃদ্ধ বলো, মিষ্টত্ব জ্ঞান সকলের মধ্যেই রয়েছে। ভগবানের কথা শুনতে মিষ্টি লাগে। এখানে তো যাত্রা থিয়েটার হয় না, তবু এত মানুষ আসে কেন? যারা আসে আমি তাদের আর কিছু তো দিইনে, শুধু ভগবানের কথাই তাদের শোনাই।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দেখো ভাই, এইসব মায়েদের ছোটো ভেবো না। ছোটো নদী যেমন নদী-সমুদ্রে গিয়ে মেশে, তেমনি এই মায়েরাও তাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে যদি অনন্য ভক্তি আর অন্ধবিশ্বাস স্থাপন করতে পারে, তাহলে তারাও ভগবানকে লাভ করবে! ভগবানকে শুধু পন্ডিতেরাই জানতে পারবে, মুর্খ বা ক্ষুদ্রেরা জানতে পারবে না, তা তো হতে পারে না। অন্ধবিশ্বাস আর অনন্যা ভক্তি যার আছে, তার কাছে ভগবানের প্রকাশ হবেই হবে। ভগবানের কাছে ক্ষুদ্র আর মহতের কোনো তফাত নেই, অন্ধবিশ্বাস আর অনন্যা ভক্তি আছে কিনা, তাই দিয়েই তিনি ভক্তকে বিচার করবেন।

৯। নামজপে ভগবানকে পাওয়া যায় একথা কি সত্যি?

তুমি নামজপ করছ, কিন্তু মন তোমার পড়ে রয়েছে বাজারে সওদা করতে। অমন জপে কোনো লাভ নেই। জপ যখন করবে তখন যাঁর জপ করছ, মনে মনে তাঁর মূর্তির ধ্যান করতে হবে। রূপ ভাবনা থেকেই ভাবোন্মাদ হবে, ভগবৎ সাক্ষাৎকার হবে। নাম থেকেই নামী মিলে যায়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রারব্ধ ও পুরুষকার

১। প্রারব্ধ ও পুরুষকার বলতে কি বোঝায়?

পূর্বজন্মের কৃতকর্মের যে ফল, তাকে বলে প্রারব্ধ বা অদৃষ্ট। এজন্মে মানুষ যা-কিছু পায় সবই সে প্রারব্ধের দরুন পেয়ে থাকে। প্রারব্ধের বশে কেউ হয় সুখী, কেউ দুঃখী, কেউ ধনী, কেউ গরীব। তুমি তো সব দিক দিয়েই আরামে রয়েছ। কিন্তু একজন কুলী-মজুরকে দেখো, কত কষ্ট তাকে ভোগ করতে হচ্ছে। কেন এমনটা হয়? ভগবান তো সকলকেই সুখী করতে চান, কিন্তু জগতে সকলে তো সুখী নয়। এর কারণ, মানুষকে তার কর্মফল বা প্রারব্ধ ভোগ করতে হয়।

একজন মানুষকে দেখে তার তিন জন্মের কথা বলে দেওয়া যায়। 'আছে আছে আছে'; 'নেই নেই নেই', 'আছে আর নেই', 'নেই আর আছে'। ব্যাপারটা হল, কোনো সংগতিসম্পন্ন, শুভ কাজে রত মানুষকে দেখলেই বোঝা যায় তার 'আছে আছে আছে' অর্থাৎ আগের জন্মে সে শুভ কাজ করেছে, দান-ধ্যান করেছে, তাই এই জন্মে তার ধন-সম্পদের অভাব নেই। এখনো সে শুভ কাজ করে চলেছে, এতেই বোঝা যায় পরের জন্মেও তার অর্থের অভাব হবে না। এইতো তার তিন জন্মের হিসেব হয়ে গেল।

এবার গরিব চাষীদের দেখো, কুলি-মজুরদের দেখো, তাদেরও তিন জন্মের কথা বোঝা যায়। তারা 'নেই নেই নেই'-এর দলে। পূর্বজন্মে কিছুই ছিল না, কোনো শুভ কাজও করেনি, দান-ধ্যানও করেনি। বর্তমানেও দেখা যাচ্ছে তাদের কিছুই নেই। পূণ্যকর্ম কিছুই করে না, তাই ভবিষ্যৎ জন্মটাও তাদের এভাবেই কাটবে, কিছুই তাদের মিলবে না। 'নেই আর আছে', এর মানে কী? কোনো কোনো গরীব মানুষকে দেখা যায় তাদের খাওয়ার কোনো সংস্থান নেই, থাকবার জায়গারও কোনো স্থিরতা নেই, তবু তাদের মধ্যে এত দয়া যে যা-কিছু মেলে, নিজেরা না খেয়েও অপরকে বিলিয়ে দেয়। এতে বোঝা যায়

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পূর্বজন্মে তাদের কিছু ছিল না, কোনো সৎকাজও করেনি, এজন্মেও কিছু নেই বটে, তবে এত দয়ালু তারা, এত দান করছে। তাতেই পরের জন্মে তাদের কিছু মিলবে। 'আছে আর নেই'-এর দৃষ্টান্ত হল, কেউ হয়তো প্রচুর ধন-সম্পত্তির মালিক, কোনো কিছুর অভাব তার নেই। এতে বোঝা যায় আগের জন্মে তার কিছু সৎকাজ করা ছিল, কিছু দান-ধ্যান করেছিল, এই এজন্মে তার এত বাড়-বাড়ন্ত। কিন্তু এই জন্মে সে কোনো সৎকাজও করছে না বা দান-ধ্যানও করছে না দেখে বোঝা যায় পরের জন্মে সে কিছুই পাবেনা।

দেখো ভাই, এখন তো তুমি বাসী জিনিস খাচ্ছ, পূর্বজন্মে তোমার ভালো কাজ করা ছিল, তাই এই জন্মে সবকিছু পেয়েছ। এখন এই জন্মেও কিছু সৎকাজ করে যাও, নইলে পরের জন্মে না খেয়ে মরতে হবে। চাষীরা ধান থেকে চাল উৎপন্ন করে, সেই চাল তারা খায়, কিন্তু পরের বছরে বুনবে বলে কিছু ধান তারা সঞ্চয় করে রাখে। নইলে পরের বছর তাদের উপোষ করতে হবে। তুমি ধনবান, বুদ্ধিমান, তাই বলছি এখন থেকেই পরের জন্মের জন্যে কিছু ধর্মধন সঞ্চয় করে রাখো।

প্রারব্ধ থেকেই এই শরীর উৎপন্ন হয়েছে। প্রারব্ধকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়—আগামী, সঞ্চিত আর ক্রিয়মান। ধানের দৃষ্টান্ত দিয়ে এই তিনপ্রকার প্রারব্ধের কথা বোঝানো যেতে পারে। পুরনো ধান কিছুটা রোপণ করে বাকিটা ঘরে রেখে দিলাম। ঘরে যা রইল, তা হল 'সঞ্চিত'। বীজধান থেকে যে ফসল হল, সেই ফসল এখন আমরা ভোগ করছি। এটি হল 'ক্রিয়মান'। এই ফসল পরের বছরের জন্যে যে বীজ রাখা হয় অর্থাৎ যে বীজ থেকে পরের বছর আবার ফসল ফলবে, তা হ'ল 'আগামী'। আমাদের মধ্যেও তেমনি আগেকার কত জন্ম-জন্মান্তরের কর্মফল সঞ্চিত হয়ে রয়েছে, এখনো তো প্রারব্ধ হয়ে দেখা দেয়নি। কিছু কর্মের ফল এজন্মে ফলেছে যা হল ক্রিয়মান। এজন্মে যেসব কাজ করছি তার ফল প্রারব্ধ হয়ে পরবর্তী কোনো জন্মে দেখা দেবে। এ হল আগামী প্রারব্ধ। জ্ঞানীদের সঞ্চিত আর আগামী প্রারব্ধ জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ হয়ে যায়, তবে তাঁদের ক্রিয়মান প্রারব্ধ দগ্ধ হয় না অর্থাৎ যে প্রারব্ধের বশে তাঁদের শরীর উৎপন্ন হয়েছে। সেই প্রারব্ধটুকুই কেবল তাঁদের ভোগ করতে হয়।

আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক আর আধিদৈবিক—এই তিন তাপ থেকে মুক্তির যে চেষ্টা, তাকে বলে পুরুষকার বা পুরুষার্থ। আধ্যাত্মিক তাপ কী? শরীরের রোগ আর মনের শোককে বলে আধ্যাত্মিক তাপ। এমন কোনো মানুষ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নেই যে বলতে পারে কখনো শোক হয়নি বা কোন রোগ হয়নি। মানুষমাত্রকেই শারীরিক রোগ আর মানসিক শোকে ভুগতে হয়। আধিভৌতিক তাপ কাকে বলে? যেমন সাপের কামড়, বিছের কামড়, চোর-ডাকাতের ভয়, রাজার ভয় অর্থাৎ অন্যের কাছ থেকে বিপদের যে আশংকা, তাকে বলে আধিভৌতিক তাপ। আর আধিদৈবিক তাপ, যেমন ঝড়-ঝঞ্ঝা-বিদ্যুৎপাত, গ্রহপীড়া, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বন্যা, মহামারী ইত্যাদি। এই তিনপ্রকার তাপকে নিবারণের যে চেষ্টা, তাকেই বলা হয় পুরুষকার। সমস্ত প্রাণী এই তিন তাপে তাপিত। কেউ বলতে পারে না যে এই ত্রিতাপ থেকে সে মুক্ত। তবে এই ত্রিতাপ থেকে মুক্তির চেষ্টা অর্থাৎ পুরুষকারের প্রয়োগ একমাত্র মানুষের পক্ষেই করা সম্ভব, আর কোন জীব তা করতে পারে না।

প্রারব্ধের উপর মানুষের কোনো হাত নেই, কিন্তু এই চেষ্টা করাটা তোমার হাতেই রয়েছে। একটা ঢ্যালা যতক্ষণ তোমার হাতে থাকে ততক্ষণ তার উপর তোমার অধিকার বজায় থাকে। কিন্তু একবার তা তোমার হাত থেকে বেরিয়ে গেলে তার উপর তোমার আর কোন অধিকার থাকে না, সে আর তোমার হাতে ফিরে আসবে না, যেখানে গিয়ে পড়বার সেখানেই পড়বে। প্রারব্ধ আর পুরুষকারের বেলাতেও এই নিয়ম। প্রারব্ধ তো তোমার হাত থেকে বেরিয়ে গিয়েছে, তার ক্রিয়া যতদূর হবার তো হবেই, কেউ তা রোধ করতে পারবে না। কিন্তু পুরুষকার তোমার হাতেই রয়েছে, ঢ্যালার মতো তুমি তা হাতে রাখতেও পারো, আবার ফেলে দিতেও পারো। প্রারব্ধ আর পুরুষকার আলাদা কোনো জিনিস নয়, দুটো একই জিনিস। ঢ্যালাকে যতক্ষণ হাতে রাখবে ততক্ষণ সে পুরুষকার, ফেলে দিলেই তা প্রারব্ধ হয়ে যাবে। প্রথমে হয় পুরুষকার, পরে সেই পুরুষকারই প্রারব্ধ হয়ে দেখা দেয়। পুরুষকার দ্বারা তুমি যেসব কর্ম করেছ, সেই কর্ম দ্বারাই তোমার প্রারব্ধ তৈরী হচ্ছে। সবাইকে প্রারব্ধ ভোগ করতেই হবে, তার উপর কারুর কোনো হাত নেই।

প্রারব্ধের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে থাকতে পারে কে? এক পারে পূর্ণজ্ঞানী, আর এক পারে পঙ্গু যার কোনো চেষ্টা করার সামর্থ্য নেই। শিশু যখন জন্মায় তখন তার কোনো জ্ঞান থাকে না, কোনো সামর্থ্যও থাকে না। তবু সে নিশ্চেষ্ট থাকতে পারে না, অনবরত হাত পা নাড়াচাড়া করতে থাকে। একেবারে নিশ্চেষ্ট প্রারব্ধবাদী তো নজরে পড়ে না। রোগ-শোক দুঃখ-তাপ দেখা দিলে জ্ঞানী বিচারের দ্বারা তাদের হাত থেকে রক্ষা পান বটে, কিন্তু জ্ঞানীকেও তো আহারের জন্যে চেষ্টা করতে হয়। নিজে আহারের কোনো

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

চেষ্টা যদি নাও করেন, অন্য কেউ মুখে খাবার তুলে দিলে জ্ঞানীকে নিজের চেষ্টায় তা চিবোতে আর গিলতে হয়। স্থূল শরীর যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ চেষ্টা না করে উপায় নেই।

দুঃখ-দুর্দশায় পড়লে সাধারণ অজ্ঞানী মানুষেরা প্রথমে হা-হুতাশ করতে থাকে, বাপরে মারে বলে চিৎকার করে, তারপরে শেষকালে শ্রান্ত হয়ে প্রারব্ধকে মেনে নেয়, বলে : 'কী আর করব, অদৃষ্টে আমার এই ছিল।' এইভাবে অদৃষ্টকে মেনে নিলে মানুষের বিশ্রান্তি মেলে বটে, তবে প্রথম থেকেই প্রারব্ধের দোহাই দিয়ে মানুষ নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকতে পারে না। পায়ে কাঁটা ফুটলে মানুষ তা বের করে নেয় কেন? কেউ তো বলে না প্রারব্ধে কাঁটা ফুটেছে, প্রারব্ধেই বেরিয়ে যাবে। রোগ হলে মানুষ ডাক্তার দেখায়, ওষুধ খাওয়ায়, কেউ বলবে না প্রারব্ধে রোগ ভালো হয়ে যাবে। খিদে পেলে কেউ বলবে না খিদে মেটাবার কোনো চেষ্টা আমি করব না। প্রারব্ধতেই আপনা থেকে খাবার আমার মুখে এসে যাবে। কেউ যদি খাবার এনে তার মুখে গুঁজে দেয়, তবুও নিজেকে তো চিবোতে হবে, গিলতে হবে। এইটুকু চেষ্টাও তো তাকে করতে হবে।

মানুষমাত্রেই কী চায়? সুখ চায়, শান্তি চায়। কিন্তু সে জানে না কোথায় শান্তি মিলবে। সে দেখছে প্রারব্ধের হাত থেকে তার নিষ্কৃতি নেই। তাহলে উপায়? উপায় আছে। কাজ যখন করবে তখন পুরুষকার অবলম্বন করবে আর সেই কাজের ফলাফলকে প্রারব্ধের উপর ছেড়ে দেবে। তবেই শান্তি মিলবে। নইলে দেখা যায় প্রাণপাত পরিশ্রম করে তুমি কোনো কাজ করলে, কিন্তু সে কাজে তুমি কৃতকার্য হলে না। তখন দারুণ হতাশায় তোমার মনের শান্তি নষ্ট হয়ে গেল। কর্মের ফলাফলকে তাই প্রারব্ধের উপর ছেড়ে দিতে হয়। চেষ্টা তো অনেক করলাম, কী আর করব, সাফল্য আমার অদৃষ্টে নেই—এই ভেবে একেবারে শেষকালে প্রারব্ধের উপর ফলাফলকে ছেড়ে দিতে পারলে মানুষের শান্তি মেলে। বিশ্রান্তির আর অন্য কোনো উপায় নেই।

২। প্রারব্ধ বড়ো, না পুরুষকার বড়ো?

কে যে বড়ো তা বলা কঠিন। পুরুষকার আর প্রারব্ধ হল বাপ ছেলের মতো। বাপ যখন যোয়ান, ছেলে তখন শিশু, তখন বাপের চেয়ে ছেলের জোর কম। আবার ছেলে যখন জোয়ান হয়, বাপ তখন বৃদ্ধ, তখন ছেলের চেয়ে বাপের জোর কম। এখানে ছোটো-বড়ো কীভাবে ঠিক করবে? বাপ যেমন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ছেলের জন্মদাতা, তেমনি পুরুষকার থেকেই প্রারব্ধের উৎপত্তি। অদৃষ্ট বা প্রারব্ধ আসে কোথা থেকে? তোমার শুভাশুভ কর্ম থেকে পুণ্য আর পাপ সঞ্চয় হয়, সেই পাপ-পুণ্য থেকেই অদৃষ্ট রচনা হয়। আগের জন্মের পুরুষকারই পরের জন্মে প্রারব্ধ হয়ে দেখা দেবে, যেন বাপের থেকে ছেলের জন্ম হল। ছেলেও আবার একদিন বাপ হয় অর্থাৎ এই প্রারব্ধই আবার পুরুষকার হয়ে পরবর্তী জন্মে নতুন কর্মফলের উদ্ভব করে। তাই প্রারব্ধ ও পুরুষকারের মধ্যে কে যে বড়ো তা বলা সহজ নয়।

প্রারব্ধ প্রবল, না পুরুষকার প্রবল তা কেউ বলতে পারে না। এ যেন দুই পালোয়ানের কুস্তি লড়া, কেউ কাউকে হারাতে পারছে না। তবে কখনো একজন আর একজনকে মাটিতে ফেলে তার উপর চেপে ব'সে তাকে হারিয়ে দিল। আবার যে নিচে পড়ছে সে এমন এক প্যাঁচ কষল যে উপরের পালোয়ান ছিটকে মাটিতে পড়ে গেল আর নিচের পালোয়ান তখন তার উপর চড়ে বসল। দুইই সমান বলবান, শক্তিতে কেউ কারুর চেয়ে কম নয়। এই দুই পালোয়ানের মতোই হল প্রারব্ধ আর পুরুষকার।

বহুকাল আগে জজসাহেব চন্দ্রমাধব ঘোষ এখানে এসেছিলেন। আমাকে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন প্রারব্ধ বড়ো, না পুরুষকার বড়ো? তাঁর এই প্রশ্নের উত্তরে আমি তাকে একটা গল্প শুনিয়ে তারপর বললাম : "আপনি তো জজসাহেব, আপনি এই মামলার নিষ্পত্তি করে দিন।" গল্পটা হল :

এক অন্ধ আর পঙ্গু একটা পাহাড়ের উপর থাকত। একদিন দাবানলে সমস্ত পাহাড়টা জ্বলে উঠল। পঙ্গু চলতে পারে না, অন্ধ চোখে দেখে না। কিন্তু পাহাড় থেকে পালাতে না পারলে দুজনেই মারা পড়বে। ভেবে ভেবে তারা পালাবার একটা উপায় স্থির করল। অন্ধের কাঁধে পঙ্গু চড়ে বসল, তারপর পঙ্গুকে কাঁধে নিয়ে অন্ধ চলতে শুরু করল আর পঙ্গু অন্ধকে পথ বলে দিতে লাগল। এইভাবে দুজনে পাহাড় ছেড়ে নিরাপদ জায়গায় এসে পৌঁছল। তখন দুজনের মধ্যে কে বড়ো তাই নিয়ে তাদের মধ্যে বেধে গেল ঝগড়া। অন্ধ বলছে, আমি তোমাকে কাঁধে না চাপালে তুমি আগুন থেকে বেরিয়ে আসতে কী করে? পঙ্গু বলছে, আমি তোমাকে রাস্তা বাতলে দিয়েছি বলেই তো তুমি প্রাণে বাঁচলে। এইভাবে দুজনেই নিজের নিজের শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করে ঝগড়া শুরু করে দিল।

এই মামলা আমি জজসায়েবের হাতে তুলে দিলাম। চন্দ্রমাধববাবু অনেকক্ষণ ধরে চিন্তা করে রায় দিলেন যে অন্ধই বড়ো। আমি তাঁকে বললামঃ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"আপনার বিচার তো ঠিক হল না বাবু। অন্ধ বড়ো নয়। পঙ্গুই বড়ো। কীভাবে? যেমন, কোনো লোককে যদি বলা যায়, হয় তোমার চোখ নষ্ট হবে, না হয় তোমার পা নষ্ট হবে, তুমি কোন্‌টা চাও? চোখ দেবে, না পা দেবে? সে নিশ্চিত বলবে, আমার চোখ থাক, পা নষ্ট হোক। দেখুন বাবু, এতেই বোঝা যায় চোখই হল সর্ব অঙ্গের সেরা। যার চোখ নেই সে নিকৃষ্ট, ছোটো, চক্ষুষ্মান মানুষই শ্রেষ্ঠ, বড়ো।" জজসায়েব আমার কথা মেনে নিয়েছিলেন।

তা দেখো ভাই, এখন তুমি নিজেই ভেবে বলো পুরুষকার বড়ো, না প্রারব্ধ বড়ো। প্রারব্ধ তো অন্ধ, পুরুষকারের চোখ আছে, সে দেখতে পায়, কাজ করতে পারে। সেই কাজ থেকেই আবার প্রারব্ধ জন্ম নেয়।

প্রারব্ধকে অস্বীকার করা যায় না বটে, কিন্তু তবুও প্রারব্ধকে পুরুষকারের চেয়ে বড়ো বলা চলে না। বাপের চেয়ে ছেলে কখনো বড়ো হতে পারে? প্রারব্ধের জন্ম পুরুষকারের থেকে, পুরুষকারই প্রারব্ধকে রচনা করে। প্রারব্ধ তো আলাদা জিনিস নয়, পুরুষকার থেকেই প্রারব্ধের উৎপত্তি। তাই পুরুষকার হল পিতা, প্রারব্ধ হল পুত্র। যোগবশিষ্ঠের মধ্যে তোমাদের বশিষ্ঠ ভগবান তো পুরুষকারকেই বড়ো বলে মত দিয়েছেন। তিনি এতদূর পর্যন্ত বলেছেন যে চেষ্টা দ্বারা মানুষের পক্ষে ব্রহ্মলোক, ইন্দ্রলোক লাভ তো তুচ্ছ কথা, সে স্বয়ং ভগবান পর্যন্ত হয়ে যেতে পারত।

৩। প্রারব্ধকে কি খণ্ডানো যায়?

না, প্রারব্ধকে কেউ খণ্ডন করতে পারে না। অদৃষ্টের প্রতিকার করা যদি সম্ভব হত তাহলে নল রাজা, শ্রীরামচন্দ্র আর যুধিষ্ঠিরকে এত দুঃখ-কষ্ট সইতে হল কেন? তাঁরা কি মূর্খ ছিলেন? তাঁদের সামর্থ্যের কি কোনো অভাব ছিল? তা তো নয়, সামর্থ্য তাদের যথেষ্টই ছিল, তবে প্রারব্ধকে তাঁরা রোধ করতে পারেননি বলেই তাঁদের তা ভোগ করতে হয়েছিল। মানুষের ভাগ্যে কী ঘটবে তা তার জন্মের আগে থেকেই ঠিক হয়ে যায়। যা হবার তা হবেই হবে, তাকে রোধ করবার ক্ষমতা কারুর নেই। প্রারব্ধকে স্বয়ং ভগবানও রোধ করতে পারেন না। তাহলেই প্রশ্ন উঠবে ভগবানকে তবে সর্বশক্তিমান বলা যাবে কী করে? তার উত্তর হল, ভগবান যে সর্বশক্তিমান তাতে কোন সন্দেহই নেই, ইচ্ছে করলে তিনি যে প্রারব্ধকে উলটে দিতে পারেন না, তা নয়। তবে তা তিনি করেন না কারণ অনেক ভেবেচিন্তেই তাঁকে কর্মফল নির্ণয় করতে হয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নিজে যা স্থির করে দেন, তাকে তিনি আর বদলান না। এইজন্য ভগবানও পারেন না প্রারব্ধের প্রতিকার করতে, মানুষের কথা না হয় ছেড়েই দাও।

প্রবল প্রারব্ধকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। বশিষ্ঠ এতবড় ঋষি, তিনি কি রামচন্দ্রের বনগমন রোধ করতে পারতেন না? কিন্তু তিনি তা করেননি কারণ তিনি জানতেন যে রামের জীবনে যা যা ঘটবে তা আগে থেকেই ঠিক হয়ে আছে। তোমাদের বাংলাদেশে একটা কথা আছে না 'রাম না হতেই রামায়ণ'। রামচন্দ্র বনে যাবেন, রাবণ সীতাকে হরণ করবে আর তার ফলে রাবণ বধ হবে। যা ঘটবার তা তো ঘটবেই, তাকে রুখবে কে? তবে অদৃষ্টে কী ঘটবে তা তো কেউ জানে না, তাই পুরুষকারের দরকার! নির্জীব হয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে সম্পূর্ণরূপে প্রারব্ধের উপর নির্ভর করে মানুষ থাকতে পারে না। যখন দেখা যায় যে পুরুষকার প্রয়োগ করেও কোনো ফল হয় না, একমাত্র তখনই প্রারব্ধকে মেনে নিতে হয়।

তুমি হয়তো বলবে ভাগ্যে যা আছে তা যখন ফলবেই তখন তা প্রতিকারের চেষ্টা করে লাভ কী? প্রথমত, ভাগ্যে কী আছে তা তুমি জানো না। দেখো ভাই, চেষ্টা না করে কেউ থাকতে পারে না। সমস্ত চেষ্টা যদি তুমি ছেড়ে দাও তাহলে তোমার দ্বারা কোনো কাজই চলবে না। আহারের চেষ্টা ছাড়া শরীর টিকবে না। তাই প্রথমে চেষ্টা করতে হয়, তাতে ফল না মিললে শেষে প্রারব্ধ মেনে নিতে হয়। চেষ্টা তোমাকে করতেই হবে। মানুষের চেষ্টা প্রবল হলে দৈব তার সহায় হন।

প্রারব্ধে কী আছে তা জানবার জন্যে অনেকেই জ্যোতিষীর কাছে যায়। গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থা গণনা করে জ্যোতিষীরা অনেক সময় অদৃষ্টে কী আছে তা বলে দিতে পারে। কিন্তু ভাগ্য গণনা করানো ভালো নয়। কী হবে আগে থাকতে ভাগ্যের কথা জেনে? যদি জানতে পারে যে এক বছরের মধ্যে আমার সর্বনাশ হতে চলেছে, তাহলে আগে থেকে এক বছর ধরে সেই শোক তোমাকে বহন করতে হবে। আবার গণৎকার যদি বলেন যে এক বছরের মধ্যে তুমি প্রচুর টাকার মালিক হবে, তাহলে আনন্দের ভাগ কমে যাবে, আগে থেকে সারা বছর ধরে তুমি আনন্দই করতে থাকবে। যা হবার তা তো হবেই, তবে ভাগ্য গণনার ফল এই হয় যে আগে থাকতে শোক বা আনন্দ ভোগ করতে হয়। এইজন্যেই ভাগ্য গণনা করা ঠিক নয়। ভূত-ভবিষ্যৎ ছেড়ে দিয়ে বর্তমানকে নিয়ে থাকাই ভালো। ভবিষ্যৎ জানতে পারলে যদি আমাদের কল্যাণ হত, ভগবান আমাদের এত বুদ্ধি দিয়েছেন, ভবিষ্যৎ জানবার বুদ্ধি কি তা দিতেন না? তা যখন দেননি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তখন বুঝতে হবে যে ভবিষ্যৎ জেনে আমাদের কোন লাভ নেই।

৪। প্রারব্ধ কি এই জন্মে ফলপ্রসূ হয়?

জন্মার্জিত সংস্কার মানতে হয়। শিশুদের মধ্যে কাউকে দেখা যায় খুব বুদ্ধিমান, আবার কেউ হয় বোকা। এর কারণ কী? বড় হলে পর শিক্ষায় আর সঙ্গগুণে বুদ্ধি মার্জিত হতে পারে, কিন্তু শিশুকালে যখন কোনো শিক্ষাই মেলে নি তখন শিশুদের মধ্যে বুদ্ধির এই যে তারতম্য, তাকে জন্মান্তরীণ সংস্কার ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে? জন্ম-সংস্কারের একটা দৃষ্টান্ত দেখো। অত্যন্ত গরীব কাঙালের ছেলেকে কোনো ধনবান পোষ্যপুত্র নিল, গরীবের সেই ছেলে কোনো রকম চেষ্টা না করেই হঠাৎ প্রচুর টাকার মালিক হয়ে গেল। তার প্রারব্ধে ছিল বলেই এটা সম্ভব হল। আবার অনেক লোক অনেক দিন ধরে টাকা রোজগারের চেষ্টা করে যাচ্ছে, তাদের কপালে হয়তো টাকা মেলে না। এই সবই হয় পূর্বজন্মের সংস্কারে। দেখা যায় কোনো ছেলের লেখাপড়াতে একেবারেই মন বসে না, শত চেষ্টাতেও সে কিছুই শিখতে পারে না, আজীবন মূর্খ হয়েই তাকে থাকতে হয়, অথচ আর একটি ছেলের শিশুকাল থেকেই পড়াশুনোর উপর অনুরাগ দেখা যায়, বড় হয়ে সে বিদ্বান বুদ্ধিমান হয়ে ওঠে। এই বিষয়ে একটি শ্লোক আছে ঃ

পূর্বদত্তা তু যা বিদ্যা পূর্বদত্তং তু যদ্ ধনম্!
পূর্বদত্তা তু যা ভার্যা অগ্রে ধাবতি ধাবতি।।

পূর্বজন্মের সংস্কার অনুসারেই বিদ্যা, ধন আর স্ত্রী লাভ হয়ে থাকে; তার জন্যে বিশেষ কোনো চেষ্টা করতে হয় না। বিদ্যা, বিত্ত, বিবাহ সবই যেন মানুষের আগে আগে ধেয়ে আসে অর্থাৎ সবকিছু পূর্বনির্দিষ্ট হয়েই আছে।

হত্যা, শত্রুতা আর ঋণ বদলা না নিয়ে মেটে না, এ জন্মেই হোক আর অন্য কোন জন্মেই হোক, তার শোধ হবেই হবে। দেখো, রাস্তায় চলতে চলতে দুজন লোকের সঙ্গে তোমার দেখা হয়ে গেল। দুজনেই তোমার অপরিচিত। তাদের একজনকে দেখে তোমার মন প্রফুল্ল হল, তাকে একান্ত আপনজন বলে ভালোবাসতে ইচ্ছে হল, অথচ আর একজনকে দেখামাত্রই তোমার মন বিরক্তিতে ভরে উঠল, তার চেহারা দেখেই তুমি অসুস্থ বোধ করতে লাগলে। এ জন্মে আগে তো তাদের দেখোনি, তাদের সঙ্গে পরিচয়ও হয়নি, তাই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জন্মান্তরের বন্ধুত্ব আর শত্রুতা ছাড়া আর কী কারণ থাকতে পারে বলো?

ঋণের বেলাতেও তাই, কাউকে টাকা দেবার কোনো কারণ নেই, তবু অকারণে তাঁকে টাকা দিতে হয়। পূর্বজন্মের ঋণ ছিল, তাই ওভাবে সেই ঋণ শোধ হয়ে গেল। হত্যার ব্যাপারেও ঐ একই কথা। ইচ্ছে নেই, তবু কারুর হাত দিয়ে খুন হয়ে গেল। পূর্বজন্মে কেউ তাকে খুন করেছিল, তাই এজন্মে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার হাত দিয়ে খুনের বদলা নিতে হল। তবে বলতে পারো, আগে কে খুন করেছে তা বুঝব কী করে? এ নিশ্চয় করে বলা মুশকিল। বীজ আগে, কী গাছ আগে তা কি বলা যায়? গাছ থেকে বীজ হচ্ছে, আবার বীজ থেকে গাছ হচ্ছে। কাজেই কে আগে কে পরে, তা কী করে বলা যাবে?

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পাপ-পুণ্য

১। পাপ-পুণ্যের উৎপত্তি কোথা থেকে হয়?

পূর্বজন্মে যেসব শুভ আর অশুভ কর্ম তুমি করেছ, সেই কর্মফলেই এজন্মে তোমার পূণ্য ও পাপের সঞ্চয় হয়েছে। পূর্বজন্মের শুভাশভ কর্ম থেকেই পাপ-পূণ্যের উৎপত্তি।

২। পাপের প্রতিকারে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন বা গ্রহদেবতার পূজোয় কি কোন ফল হয়?

জন্ম-জন্মান্তরের পাপ-পূণ্যের প্রভাবেই গ্রহদেবতারা রুষ্ট বা তুষ্ট হন। তবে গ্রহ দেবতার পূজো বা শান্তি-স্বস্ত্যয়ন দ্বারা রুষ্ট্র গ্রহও তুষ্ট হন। সেইজন্যেই ঋষিরা গ্রহদেবতার পূজোর বিধি রচনা করেছেন। বিধিমতো গ্রহ দেবতার পূজো, তাদের স্তব-স্তুতি করা উচিত, তাতে গ্রহশান্তি হয়। নিজকৃত শুভাশভ কর্মই মানুষদের পাপ-পুণ্য, সুখ দুঃখের কারণ। নইলে গ্রহদেবতা তুষ্ট বা রুষ্ট হয়ে মানুষকে সুখ-দুঃখ দিতে পারেন না। সেইজন্যে মানুষের উচিত সর্বদা শুভকর্মে নিযুক্ত থাকা, সর্বদা শুভ চিন্তা করা! পাপের ফল জ্ঞানী-অজ্ঞানী সবাইকেই সমান ভোগ করতে হয়।

পাপের দ্বারা যেমন পূণ্যের ফল কমে না, তেমনি পূণ্যের দ্বারাও পাপের খণ্ডন হয় না। পাপ-পূণ্য উভয়েরই ফল মানুষকে ভোগ করতে হয়। মানুষ নানা রকম পাপ করে চলেছে আর মনে মনে ভাবছে অনেক পূণ্য করব, তাতেই আমার সব পাপ ধুয়ে মুছে যাবে। কিন্তু সেটি হবার নয়। তবে পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্তের যে বিধি রয়েছে বোঝা যায় যে পাপেরও কিছু কিছু খণ্ডন হওয়া সম্ভব, নইলে শাস্ত্রকাররা প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেবেন কেন? সম্পূর্ণ পাপ খণ্ডন হয় না বটে তবে কিছু কিছু তো হয়। দেখো, সংসারে রোগ, শোক দুঃখ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যা দেখছ, সবই পাপের ফল। রোগশান্তির জন্যে ডাক্তাররা পুরুষকার করে অর্থাৎ রোগীকে ওযুধ খাওয়ায়, জ্যোতিষী আর পণ্ডিতেরা রোগশান্তির জন্যে গ্রহপূজা, শান্তি-স্বস্ত্যায়ন, প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেন। —

৩। ভগবান যখন আমায় দিয়ে সব কাজ করান, তখন পাপ-পুণ্য আমার হবে কেন?

দেখো ভাই, ভালোমন্দ সকল কাজই মানুষ যদি ভগবানের উপর ছেড়ে দিতে পারে, তবে তো হয়। কিন্তু মানুষ তো তা করে না। ভালো কাজের বেলায় বলবে আমি করেছি, আর যত মন্দ কাজ সব ভগবানের উপর চাপাবে। তাতো চলে না, এযে ফাঁকির কথা হল। ভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরতা যতক্ষণ না হচ্ছে, ততক্ষণ পাপ আর পুণ্যের ফল মানুষকে ভোগ করতেই হবে।

৪। সর্বত্র পরমার্থ দৃষ্টি দেবার উপদেশ দেওয়া হয়। চুরি-ডাকাতিতে কী পরমার্থ আছে?

সর্বত্র পরমার্থ দৃষ্টি হলে চুরি ডাকাতির মধ্যে পরমার্থ খুঁজে পাওয়া যায়। চুরির মধ্যে পরমার্থ কি কিছুই নেই? প্রথমত দেখো, চোরের কতখানি দৃঢ়তা ও একাগ্রতা থাকা দরকার। ধরা পড়লে জীবন সংশয় হতে পারে, জেলখানায় গিয়ে পচতে হবে, অপমানের একশেষ হতে হবে, এসব কথা তখন তার মনে আসে না। তখন তার একমাত্র চিন্তা, কীভাবে আমি চুরি করব যাতে ধরা না পড়ি। মনের এই একাগ্রতা কি একটা সদ্‌গুণ নয়? চোর চুরি করে যা পায়, তা দিয়ে সে কী করে? নিজে তো দশ-বিশ সের খেতে পারে না। দশ-বিশখানা কাপড়ও পড়তে পারে না। এসব সে চুরি করে আনে আর কাউকে না কাউকে দিয়ে দেয়। এতে তার নিজের কী স্বার্থসিদ্ধি হল? জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সে যা সংগ্রহ করল, তা সে পরকে বিলিয়ে দিল। এই যে নিঃস্বার্থতা, এও তো পরমার্থেরই এক দৃষ্টান্ত। মহাজনেরা তাই বলেন, কারুর দোষ খুঁজে বেড়িয়ো না, তার মধ্যে কী গুণ আছে সেইটাই দেখবার চেষ্টা করো।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রোগ-শোক/সুখ-দুঃখ

১। রোগ-শোক, দুঃখের সৃষ্টি হয়েছে কেন?

জগতে কেউ সুখী, কেউ দুঃখী। এই সুখ দুঃখের তত্ত্ব বোঝা সহজ নয়। ভগবান যদি দুঃখের সৃষ্টি না করতেন তাহলে সুখের বোধ হত কেমন করে? সুখকে বোঝাবার জন্যেই দুঃখের সৃষ্টি হয়েছে। অমাবস্যার অন্ধকার না থাকলে পূর্ণিমার প্রকাশের যে আনন্দ তা কিভাবে বোঝা যেত? রাত্রি যদি না থাকত তাহলে দিন হয়েছে কী করে বুঝতে? এই জন্যই ভগবান সৃষ্টিকে দ্বন্দ্বরূপে প্রকাশ করেছেন। সুখকে বোঝাবার জন্যেই দুঃখ, নইলে দুঃখ বলে কিছু নেই। যাদের আমরা দুঃখী মনে করি, তাদের মধ্যে কি সুখ নেই? সমস্ত প্রাণীর মধ্যেই সুখ রয়েছে। বিষ্ঠার যে পোকা, আমরা ভাবি কী দুঃখের জীবন এদের, কিন্তু তাতেও তাদের মধ্যে আনন্দ রয়েছে। কিছুমাত্র আনন্দ যদি না থাকত, তাহলে এক মুহূর্তও তারা বেঁচে থাকতে পারত না। অন্য কোনো আনন্দ যদি না-ও থাকে, আত্মার আনন্দ তো থাকতেই হবে। চৈতন্যরূপী পরমাত্মা আনন্দরূপে সকল প্রাণীর মধ্যেই বিরাজ করছেন।

২। সুখ-দুঃখের অবস্থান কোথায়?

সুখ-দুঃখ হল অন্তকরণের ধর্ম। কীভাবে বোঝা যায়? সুষুপ্তির সময় বোঝা যায়। দেখো, সুষুপ্তিতে মানুষ যখন গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন থাকে তখন তার মধ্যে সুখ-দুঃখের বোধ থাকে না। কেন থাকে না? কারণ তখন মানুষের অন্তঃকরণের কাজ স্তব্ধ হয়ে যায়, গভীর ঘুমের মধ্যে প্রাণবায়ু চলতে থাকে। তাতেই বোঝা যায় যে সেই সময় চৈতন্য বর্তমান থাকে, প্রাণের গতি থেকেই চৈতন্যের অবস্থিতি বোঝা যায়। চৈতন্যসত্তা কখনো লুপ্ত হয় না, সুষুপ্তিতেও তা বজায় থাকে। চৈতন্যে যদি সুখ-দুঃখ থাকত তাহলে গাঢ় ঘুমের মধ্যেও অর্থাৎ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সুষুপ্তিতেও মানুষ সুখ-দুঃখ অনুভব করত। সুষুপ্তিতে সুখ বা দুঃখ কিছুই যখন থাকে না, তখন বুঝতে হবে সুখ-দুঃখ হল অন্তকরণের ধর্ম অন্তঃকরণেই তাদের অবস্থান।

৩। মানুষ সুখ চায়, দুঃখ চায় না, তা কি সম্ভব?

সুখটি নেবে, দুঃখ নেবে না, এ কখনো হতে পারে না। সুখ আর দুঃখ পাশাপাশি চলতে থাকে। সুখকে চাইলে দুঃখকেও নিতে হয় একটা গল্প শোনো, তাহলেই কথাটা তোমার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

বৈশাখ মাস, বেলা দ্বিপ্রহর। এক চাষী সেই সময় ক্ষেতে কাজ করছিল। প্রচণ্ড গরমে গলদ্ঘর্ম হয়ে সে আকাশের পানে চেয়ে হাতজোড় করে বললঃ "হে ভগবান, আমার শরীরটাকে তুমি পাষাণের মতো করে দাও যাতে রোদের তাপ আমাকে দগ্ধ করতে না পারে।" এমন সময় আকাশ থেকে দৈব-বাণী হলঃ 'তথাস্তু'।

দৈববাণী হওয়ার পর থেকে রোদের তেজে চাষীর শরীর আর পুড়ছে না। চাষের কাজ সেরে সন্ধ্যেবেলা সে বাড়ি ফিরে এল। চাষার বউ প্রতিদিনকার মতো ঠাণ্ডা জলে তার পা ধুইয়ে দিয়ে সারা গায়ে তেল মাখিয়ে তাকে স্নান করতে পাঠিয়ে দিল। কিন্তু অন্যদিনের মতো আজ সে স্নান করে আরাম পেল না। বউ এবার তার খাবার দিয়ে গেল। খাবার খেয়েও আজ তার তৃপ্তি হল না। চাষা আপন মনে ভাবতে লাগল, আজ আমার এ কী হল! রোজ স্নানাহারের পর মনটা আমার আনন্দে ভরে যায়, আজ সেই আনন্দ গেল কোথায়? চাষাকে শুকনো মুখে বসে থাকতে দেখে চাষার বউ ভাবল কোনো কারণে চাষার মন হয়তো ভালো নেই। বউ জানত চাষা তার ছোট ছেলেটাকে খুব ভালবাসে, তাই সে ছোট ছেলেটাকে চাষার কোলে বসিয়ে দিয়ে গেল যাতে ছেলেকে আদর করে চাষার মনের আনন্দ ফিরে আসে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। চাষার মনের আনন্দ যেন নিঃশেষে মুছে গিয়েছে। চাষা যখন গভীরভাবে চিন্তা করছে কেন তাকে আজ এ-দুর্দশায় পড়তে হল, ঠিক তখনি সে আবার দৈববাণী শুনতে পেল ঃ "ওরে বোকা চাষা, আজকেই তো তুই আমার কাছ থেকে পাষাণের মতো হয়ে যাওয়ার বর চেয়ে নিলি, তাই পাষাণের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মতো তোর আর সুখ ও নেই, দুঃখও নেই। সুখ হবে অথচ দুঃখ হবে না, এমন পাষাণ আমি করতে পারিনে। যার দুঃখ থাকবে না, তার সুখও থাকবে না। সুখ নেবে, দুঃখ নেবে না, ভগবান হয়েও আমার পক্ষে তা করা সম্ভব নয়।" চাষা তখন হাতজোড় করে বলল ঃ 'প্রভু, এখন আমি বুঝতে পেরেছি, আমাদের জন্যে যে ব্যবস্থা আপনি করেছেন তা আমাদের মঙ্গলের জন্যেই করেছেন। সুখ আর দুঃখ যদি না রইল, তাহলে আমাদের রইল কী? আমরা যে একেবারে পাষাণ হয়ে যাব। হে ভগবান, আমি আগে যেমন ছিলাম আমাকে তেমনটিই করে দিন।" আবার দৈববাণী হল ঃ 'তথাস্তু'। চাষা আবার আগের মতো সুখ-দুঃখের বশবর্তী হয়ে দিন কাটাতে লাগল।

৪। মানুষের দুঃখ-শোকের কারণ কী?

ভগবান কাউকে দুঃখ দেন না, তিনি সবাইকে সুখী করতে চান। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও তিনি তা করতে পারেন না কেন জানো? মানুষকে যে তার কর্মফল ভোগ করতে হয়। পূর্বজন্মে ভালো কাজ করা থাকলে এজন্মে মানুষ সুখী হবে মন্দ কাজ করলে এজন্মে দুঃখী হবে। এর আর অন্যথা হয় না।

দেখো ভাই, একটা গল্প বলি শোনো। আমার মন্ত্রশিষ্য হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় একবার আমাকে তার বৈদ্যবাটির বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল। গঙ্গার ধারে বাড়ি, ছাদের উপর পুজোর ঘরে বসে আমি গঙ্গার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। দেখলাম পল্লীর এক মায়ী গঙ্গায় জল নিতে এসেছেন, কাঁখে তার প্রকাণ্ড এক ঘড়া আর তাঁর হাত ধরে সঙ্গে এসেছে একটি বছর পাঁচেকের ছেলে। মায়ী ঘড়ায় জল ভরলেন, তারপর ছেলের হাত ধরে বাড়ি ফিরবেন বলে তার দিকে হাত বাড়িয়ে ছিলেন। ছেলে বায়না ধরল সে হেঁটে যাবে না। মায়ের কোলে চড়ে যাবে। মা যত বোঝায় একঘড়া জল নিয়ে তোমাকে কীভাবে কোলে নেব, ছেলে কিন্তু কিছুতেই তা বুঝবে না। মা আর কী করেন, এক কাঁধে ঘড়া নিয়ে আর এক কাঁখে ছেলেকে নিতে গেলেন। ছেলের তা পছন্দ হল না, মাকে বলল আগে ঘড়া ফেলে দাও, তবে আমি তোমার কোলে উঠব। মা অনেক করে ছেলেকে বোঝাতে লাগলেন, কিন্তু ছেলে নাছড়বান্দা। সে কাঁদতে কাঁদতে গঙ্গার কাদার মধ্যে শুয়ে পড়ল। মা তখন তাকে আরও কাদার মধ্যে ঠেলে দিয়ে তার পিঠে ঘা কতক চড় মেরে ঘড়া নিয়ে বাড়ির পানে রওনা হলেন। ছেলে সেই কাদার মধ্যেই হাত পা ছুড়ে চিৎকার করে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কাঁদতে লাগল, মা আর সেদিকে ফিরেও তাকালেন না। ছেলে তখন কাদা মাখা গায়ে ফোঁপাতে ফোঁপাতে মায়ের পিছনে পিছনে চলতে লাগল। মা এবার ছেলের গায়ের কাদা ধুয়ে মুছে তাকে কোলে তুলে নিলেন।

ভগবান হলেন আমাদের মা, আমরা তাঁর দুষ্টু ছেলে। মা তো আমাদের কোলে নিতে চান, কিন্তু আমরা বিষয়রূপী কাদায় গড়াগড়ি দিতেই ভালবাসি। মা আর কী করবেন? তিনিও তখন আরও বেশি করে বিষয়ের কাদার মধ্যে ফেলে দিয়ে রোগ শোক দুঃখরূপ চড়-চাপড় মারতে থাকেন। তাতে জব্দ হয়ে দুষ্টু ছেলে যদি কাঁদতে কাঁদতে মায়ের শরণ নেয়, তবে তিনি তার সমস্ত ময়লা ধুয়ে পরিষ্কার করে তাকে অবশেষে নিজের কোলে তুলে নেন।

৫। শরীরে রোগ দেখা দেয় কেন?

'শরীরং ব্যাধিমন্দিরম্' শরীর থাকলেই তাতে জরা ব্যাধি দেখা দেবে। শরীরে ছ রকম দোষ দেখা দেয়, তাকে বলে ষড়বিকার। এই ছটি বিকার হল ১। অস্তি অর্থাৎ আছে, ২। জায়তে অর্থাৎ জন্ম হয়, ৩। বর্ধতে অর্থাৎ বাড়তে থাকে, ৪। বিপরিণমতে অর্থাৎ পরিবর্তন হয়, ৫। অপক্ষীয়তে অর্থাৎ দিন দিন ক্ষীণ হতে থাকে, ৬। বিনশ্যতি, অর্থাৎ শেষে বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

জ্ঞানী হোক আর অজ্ঞানী হোক, সকলের দেহেই এই ছ রকম বিকার দেখা দেয়। প্রথম 'অস্তি' অর্থাৎ আছে, না থাকলে আসবে কোথা থেকে? তবে অন্য রূপে আছে। তারপর মানুষের জন্ম হয়, 'জায়তে'। জন্মের পর সে বাড়তে থাকে, 'বর্ধতে'। তারপর 'বিপরিণমতে', তার পরিবর্তন হতে থাকে। এই পরিবর্তনটা স্বাভাবিক। স্বাভাবিক। মানুষ দিন দিন ক্ষীণ হতে থাকে, 'অপক্ষীয়তে' জরা আর ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। তারপর শেষে 'বিনশ্যতি', একদিন সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। এই হল স্বাভাবিক নিয়ম, আজ পর্যন্ত কেউ একে রোধ করতে পারেনি।

৬। রোগ-শোক নিবারণের উপায় কি?

শারীরিক রোগের নাম ব্যাধি, মানসিক রোগের নাম আধি। প্রথমে ব্যাধির কথা বলি। রোগ দু'রকমের হয়, এক প্রারব্ধিক যা প্রারব্ধ থেকে হয়, আর এক

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আগন্তুক। প্রারব্ধিক রোগ ওষুধ খাওয়ালে সারে না, তার জন্য দৈবের ব্যবস্থা করতে হয়। আগন্তুক রোগের বেলায় কিছু শারীরিক নিয়ম পালন করতে হয়, কিছু ওষুধও খাওয়াতে হয়, তাতেই আগন্তুক রোগ সেরে যায়। কিন্তু মানুষ তো জানে না কোন্ রোগটা প্রারব্ধিক আর কোন্‌টা আগন্তুক, তাই রোগ হলে ডাক্তারও দেখাও আবার শান্তি-স্বস্ত্যয়নও করাও।

শারীরিক ব্যাধির কথা হল। মানসিক শোক বা আধি দূর হবে কেমন করে? এই প্রশ্নের উত্তর হল। মনকে ভাগ করে দাও। মনের দুঃখকর বৃত্তি, তাকে ঘুরিয়ে দাও। যে সাধক, তার প্রতি উপদেশ, তোমার মনকে ইষ্টচিন্তায় লাগিয়ে রাখো, মনকে ইষ্টচিন্তায় লাগিয়ে রাখতে পারলে মনের দুঃখ দূর হবে। কিন্তু সাধারণ মানুষের বেলায় বলতে হয়, যেমন করে পারো মনকে ভুলিয়ে রাখো। তোমার শোক হয়েছে, ছেলে মারা গিয়েছে, যাও তীর্থদর্শন করে এসো। নানা দেশ ঘুরতে ঘুরতে, তীর্থসেবা, দেবসেবা করতে করতে অনেক দিন কেটে যাবে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শোকও ক্রমে ক্রমে কমতে থাকে। তাই শোকের সময় তীর্থ ভ্রমণের বিধি রয়েছে।

বিচারের দ্বারাও আধি বা শোকের হাত এড়ানো যায়। শোকের সময় বিচার করতে হয় যে ভগবান আমার মহাজন, সেই মহাজনের কাছে আমি পাপরূপী ঋণ করেছি, সেই ঋণের ফল দুঃখ আমাকে ভোগ করতে হচ্ছে। দুঃখ শোক যতই আসুক, মনে স্থির জানবে যে আমার, পাপের ঋণ শোধ হয়ে যাচ্ছে, এবার আমি ক্রমশঃ নিষ্পাপ হয়ে যাব। এখানে আর একটা কথা বলা দরকার। ভগবান এমন দয়ালু মহাজন যে একেবারে সমস্ত ঋণ তিনি একসঙ্গে উসুল করেন না, কিস্তিবন্দি করে আদায় করেন। একসঙ্গে সমস্ত ঋণ যদি আদায় দিতে হত তাহলে আমাদের দুর্দশার আর অন্ত থাকত না। ভগবান তো তা করেন নি, কিস্তিতে কিস্তিতে ঋণ শোধের ব্যবস্থা করে আমাদের বাঁচিয়ে দিয়েছেন। তাই কখনো আমরা সুস্থ শরীরে আরামে থাকি, কখনো রোগ-শোকের দুঃখ-কষ্টে কাতর হই। এইভাবে কিস্তিতে পাপের ঋণ শোধ করতে হয় বলে তাঁর কাছে যে মূল ঋণ সেটাও আস্তে আস্তে শোধ হয়ে যায়, আমাদেরও খুব বেশি অসুবিধের মধ্যে পড়তে হয় না।

হয়তো তুমি বলবে, ভগবান যখন এতই দয়ালু তখন সমস্ত ঋণটাই তিনি মাপ করে দেন না কেন? দেখো ভাই, কিছু কিছু তো তিনি ছেড়ে দেন। মূল

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ঋণ ছাড়েন না বটে, তবে সুদ তো তিনি মাপ করে দেন। ভগবানের যারা ভক্ত, তাদের মূল ঋণটাই শুধু শোধ করতে হয়, সুদ তাদের দিতে হয় না। তুমি বলবে, মূল যখন ছাড়বেন না তখন সুদ ছাড়লে আর লাভটা কী হল? আরে ভাই, সুদ কখনো কখনো যে মূলকে ছাড়িয়ে যায়। সুদেতেই তো দেনাদার কাবু হয়ে পড়ে। সুদ নেবে না, অথচ মূল ঋণও কিস্তিবন্দি করে নেবে, এমন মহাজনকে দয়াময় বলতেই হবে। এখন প্রশ্ন হল, মূল আর সুদ কাকে বলব? পাপের ফলে তোমার রোগ রয়েছে, যন্ত্রণায় তুমি অস্থির হয়েছ, এই হল ঋণ, এই ঋণের উসুল তোমাকে দিতেই হয় না।

তোমার জামাই মারা গিয়েছে বলছ। কচি বিধবাটির মুখের দিকে তাকালে তোমার বুকটা যে জ্বলে যাচ্ছে তা আমি বুঝি। কিন্তু কী করবে বলো? শোককে ত্যাগ করতেই হবে নইলে শোকাগ্নিতে তোমার প্রাণ যে জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে। ভাই, তোমার মেয়ের সুখ-দুঃখ তো তোমার হাতে নেই। সে নিজের প্রারব্ধ নিয়ে এসেছে, নিজের প্রারব্ধ নিয়েই তাকে যেতে হবে। তুমি তার বাবা, এই অভিমান যদি ছাড়তে পারো, তবেই তোমার শোক ঘুচবে। দেখো, সংসারে কত মেয়ের অদৃষ্টের তো এই বিপর্যয় ঘটছে, কই তুমি তো তাদের জন্য দুঃখ করো না। তোমার মেয়ের চেয়েও আরও বেশি দুঃখী কত মেয়ে রয়েছে। যখন নিজের দুঃখ হবে তখন নিজের চেয়ে ঢের বেশি দুঃখী যারা, তাদের দিকে চেয়ে দেখো, তাতে দুঃখের কিছুটা লাঘব হবে। কীভাবে? তুমি বর্তমান রয়েছ, তোমার এই মেয়ে যাতে সুখে থাকে, খাওয়া-পরার যাতে কোন কষ্ট না পায়, সেদিকে সব সময় তুমি নজর রাখতে পারবে। কিন্তু এমন অনেক মেয়ে আছে যাদের পিতা,, পুত্র, স্বামী কেউই নেই, সব মরে গিয়েছে, খাওয়া-পরার মতো একটা পয়সাও তাদের হাতে নেই। তাদের দেখলে তোমার মনে হবে, আমার মেয়ের চেয়েও কী ভয়ঙ্কর অবস্থা এদের। তা দেখেও তুমি কিছুটা সান্ত্বনা পাবে।

তুমি বলছ তোমার জামাই মারা গিয়েছে। বলো তো ভাই, তার উপর তোমার কিসের অধিকার? সে যদি তোমারই হবে, তাহলে তাকে যেতে দিলে কেন? কেন তাকে আটকে রাখলে না? আমার জিনিস, তা আমি ছাড়ব না, তা তো হয় না। ভগবানের জিনিস তিনিই নিয়েছেন, এর জন্য তুমি দুঃখ কোরো না। 'আমার' এই অভিমান ত্যাগ করো, তাহলে শোক দূর হবে। এ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সম্বন্ধে একটা ছোট্ট গল্প তোমাকে বলি, তার থেকেই আমার কথাটা তুমি সহজে বুঝতে পারবে।

মাড়োয়ার দেশের এক বণিক ব্যবসা করবে বলে কলকাতায় রওনা হল। ঘরে রইল তার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আর বৃদ্ধা মা। তখনকার দিনে রেলগাড়ী ছিল না, পায়ে হেঁটে অতি কষ্টে বহুদিন পরে বণিক কলকাতায় এসে পৌঁছল। বণিক রওনা হবার কিছুদিন পর তার স্ত্রীর একটি ছেলে হল। বণিক খবর পেল তার স্ত্রীর একটি ছেলে হয়েছে।

বহুদিন যায়। বণিকের ছেলে সাবালক হয়ে উঠেছে অথচ এখনো পর্যন্ত সে তার বাবাকে দেখেনি। এদিকে সেই সময় ব্যবসা করে বণিক প্রচুর অর্থ জমিয়েছে। তাই সে ভাবল, এখানে তো যথেষ্ট রোজগার হল, এখন এইসব টাকাকড়ি নিয়ে দেশে ফিরে যাই। এই ভেবে অনেক চাকর-বাকর সঙ্গে নিয়ে নিজ ডুলিতে চেপে সে দেশে ফিরে চলল। সন্ধ্যেবেলা এক চটিতে পৌঁছে বণিক চটিওয়ালাকে বলল : "আমার জন্য তিনখানা ঘরের ব্যবস্থা করে দাও।" চটিওয়ালা বলল : 'হুজুর, আমার চটিতে মোটে তিনখানাই ঘর, তার একটাতে একজন লোক রয়েছে, তার আবার কলেরা হয়েছে, অজ্ঞান হয়ে সে পড়ে আছে।' বণিক বলল : "আমার সঙ্গে এতজন লোক রয়েছে, তিনখানা ঘরের কমে তো আমার হবে না। তোমাকে আমি বেশি টাকা দেব, তুমি বরং লোকটাকে বাইরে বের করে দিয়ে ঘর ধুয়ে পরিষ্কার করে দাও।" চটিওয়ালা গরীব মানুষ, টাকার লোভে সে রাজি হয়ে গেল। অচৈতন্য কলেরা রোগীকে সে বাইরে এক গাছতলায় ফেলে রেখে এল। শীতের রাত। বিনা শুশ্রূষায় সমস্ত রাত গাছতলায় পড়ে থেকে ভোরের দিকে বেচারা মারা গেল।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে বণিক তার চাকরদের মুখে শুনল যে কালকের সেই রোগীটা সারারাত বেঁচে ছিল, ভোরবেলা সে মরেছে। কৌতূহলের বশে বণিক সেই গাছতলায় গিয়ে দেখে সেখানে বেশ ভিড় জমেছে আর মাড়োয়ার দেশের একজন লোক কাঁদছে আর বলছে : "আহা রে, ছেলেটা অমুক বণিকের ছেলে, দেশে ওর মা আর বুড়ি ঠাকুমা রয়েছে, কলকাতায় যাচ্ছিল বাপকে দেখবে বলে, কপালে তা আর ঘটল না, বেঘোরে ছেলেটা মারা পড়ল গো।" লোকটার কথা শুনেই বণিক বুঝতে পারল এ যে তারই ছেলে। 'আমার ছেলে মরে গিয়েছে' এই অনুভূতি জাগবার সঙ্গে সঙ্গে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শোকে বণিকের সকল অঙ্গ শিথিল হয়ে গেল। মরা ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে সে তখন বুক চাপড়ে হাহাকার করে কেঁদে উঠল।

এখন বলো তো ভাই, এই শোক কোথা থেকে এল? রুগ্ন ছেলেটাকে চটি থেকে বাইরে ফেলে দিল, তাতে বণিকের কোনো দুঃখ হল না, ছেলেটা মরে যাওয়ার পর পাঁচজনের সঙ্গে সেখানে গিয়ে তামাশা দেখতে তার বাধল না। কিন্তু যেই বুঝতে পারল ঐ ছেলে আমার, অমনি তার শোক উথলে উঠল। শোক-দুঃখ রয়েছে এই 'আমার' অভিমানটির মধ্যে। এই অভিমানটি ত্যাগ না করতে পারলে তো শোক ঘুচবে না। কিছুই তোমার নয়, সবই তাঁর। তাঁরই জিনিস তিনিই নিয়েছেন, এই কথাটি অনুভব করার চেষ্টা করো।

মা, তোমার দুটি ছেলেকে ভগবান তাঁর কাছে ডেকে নিয়েছেন বলে তুমি দুঃখ করছ। তোমার কাছে আমার এই উপদেশ, তুমি ঝি হয়ে থাকো, গৃহিণী হোয়ো না। ঝি মনিবের ছেলে-মেয়েদের দেখাশুনো করে, গৃহকর্ম সবকিছু তাকে করতে হয়, কিন্তু সবকাজ সে করে যায় আসক্তিশূন্য হয়ে, মমতায় সে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে না। জিজ্ঞাসা করলে সে বলে, আমার ছেলে, আমার মেয়ে, আমার বাড়ি, কিন্তু মনে মনে সে বেশ জানে ছেলেমেয়ে, বাড়ি-ঘর কিছুই তার নয়, সবই তার মনিবের। মা, তোমার মনিব হলেন ভগবান। তোমার ছেলেমেয়ে, বাড়ি-ঘর সবকিছুই ভগবানের। তুমি হলে তার ঝি, ঝি-এর মতোই ছেলেমেয়েদের পালন করা হল তোমার কাজ। গৃহকর্ম সবই করবে, কিন্তু সব সময় মনে রাখবে কিছুই তোমার নয়, সব হল তোমার মনিব ভগবানের। তাঁর ছেলেদের তিনি নিয়েছেন, তার জন্যে তুমি দুঃখ কোরো না।

দেখো মা, কারুর ছেলে দার্জিলিং গিয়েছে, তাতে তো তার মায়ের দুঃখ হয় না। ছেলে ভালো জায়গায় গিয়েছে, সেখানে সে ভালো আছে, এই ভেবে মা শান্তি পান। তোমার ছেলেরা স্থূল শরীর ছেড়ে সূক্ষ্ম শরীরে গিয়েছে, ইহলোক ছেড়ে পরলোকে গিয়েছে, দার্জিলিং গেলে তো দুঃখ হয় না, বরং ভালো জায়গায় গিয়েছে জেনে আনন্দ হয়, তাহলে ইহলোক ছেড়ে পরলোকে গেলে বা স্থূল শরীর ছেড়ে সূক্ষ্ম শরীরে গেলে দুঃখ হবে কেন? ছেলেরা ভালো জায়গায় গিয়েছে জেনে আনন্দ হবে না কেন? মা, তোমার ছেলেরা ভালো জায়গাতেই গিয়েছে, এই কথাটা বুঝে তুমিও আর দুঃখ কোরো না।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

৭। দৈব ওষুধে কি রোগ সারে?

তুমি তো নাতির অসুখের জন্যে এতদিন এখানে আসতে পারোনি। তা তোমার নাতি তো এখন ভালো হয়ে গিয়েছে। যাই হোক, এসেছ যখন, তখন যাওয়ার সময় নাতির জন্যে কিছু বিভূতি মরিচ নিয়ে যেয়ো। এই বিভূতি মরিচ এক দৈব ওষুধ। অনেক উৎকট রোগী আমার কাছে ওষুধ চাইতে আসে। কী আর করি? ঝুলি থেকে খানিকটা বিভূতি মরিচ নিয়ে তাদের হাতে দিই। ভগবানের কী বিচিত্র লীলা, তাতেই তাদের রোগ ভালো হয়ে যায়। কীভাবে যে ভালো হয় তা ভেবে আমি নিজেই অবাক হয়ে যাই। রোগীদের ভক্তির প্রভাবেই তাদের রোগ সারে। 'সংকল্প শুদ্ধ তো সংকল্প সিদ্ধ', মনের সংকল্প শুদ্ধ হলে, দৃঢ় হলে, সেই সংকল্প যে সিদ্ধ হয় তাতে কোনো সন্দেহ নেই। রোগীদের মনের দৃঢ় বিশ্বাস, মহাপুরুষ যখন ঝুলি থেকে ওষুধ দিচ্ছেন তখন তাতে রোগ ভালো হবেই। এই বিশ্বাসের জোরেই তারা ওষুধে ফল পায়। তবে এই বিভূতি ও মরিচও সিদ্ধ জিনিস। নাতির জন্যে তুমি নিয়ে যেয়ো। (সিদ্ধ বিভূতি মরিচের ইতিহাস)।

["গৌরীশংকর মহারাজজী নর্মদা কিনারায় বিশেষ পরিচিত ও প্রসিদ্ধ সিদ্ধ ব্রহ্মচারী ছিলেন। ......আমাদের গুরুমহারাজ পূর্বোক্ত বাল-ব্রহ্মচারী তাঁহার নিকট প্রায় ৬/৭ বৎসর কাল পরিক্রমাকালীন অবস্থান করতঃ সেবাদি দ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে যোগ-সাধনার গুহ্যতত্ত্ব সমুদায় শিক্ষা করিয়া তাঁহার অতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন।...

...উক্ত গৌরীশংকরজী নর্মদা তীরে বহুকাল খুব নিয়মপূর্বক জলে দাঁড়াইয়া গায়ত্রী জপ করেন, এমন কি মৎস্যাদি জলজন্তু তাঁহার পায়ের মাংস পর্যন্ত খাইয়া ফেলিয়াছিল কিন্তু সিদ্ধ হইতে পারেন নাই। অবশেষে তিনি উন্মাদ হইয়া ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়ান এবং কোনো দেব-দেবীর মূর্তি দেখিলেই ভাঙিয়া ফেলিতেন ও নর্মদায় নিক্ষেপ করিতেন। কেহ কেহ বলেন—তিনি সিদ্ধি লাভ করিতে না পারায় ইচ্ছা করিয়া পাগলের বেশ ধরেন, আবার কেহ বলেন যে যোগভ্রষ্ট হওয়ায় মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া যায়। যাহা হউক, তিনি ঐরূপ মূর্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ করিতে করিতে অমরকন্টকে গেলেন এবং সেখানে বহু মূর্তি ভাঙিয়া অবশেষে একদিন নর্মদার মূর্তিকে জলে ফেলিয়া দিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়া দ্বার আগলাইয়া বসেন। পান্ডাগণ কিছুতেই দ্বার খুলিতে পারিল না। দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে, তথাপি আজ মাতার দ্বার রুদ্ধ। পূজাদি বন্ধ হওয়ায় সকলেই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিশেষ চিন্তিত ও ভীত হইল। প্রায় দিবাবসানের পূর্বে কোনোরূপে সমাধা করিতে সমর্থ হয়। ঐ রাত্রেই নর্মদা মাতা স্বপ্নে গৌরীশংকর মহারাজকে প্রকৃতিস্থ করিয়া দর্শন দেন ও তাঁহাকে প্রসাদী স্বরূপ যজ্ঞীয় বিভূতি ও মরিচের এক থলি প্রদান করতঃ প্রাতেই ঐ স্থান ত্যাগ করিবার আদেশ দেন এবং ভবিষ্যতে কোনোরূপ অত্যাচার না করিয়া পরোপকার করিতে আদেশ দেন।

প্রাতে শয্যাপার্শ্বে ঐ থলি পাইয়া নর্মদা মাতার কৃপা হইয়াছে বুঝিয়া ঐ বাতুলতা ছাড়িয়া অগ্রে চলিয়া যান। ......ধীরে ধীরে গৌরীশংকর মহারাজের সিদ্ধির বিষয় প্রচার হইতে লাগিল এবং তাঁহার দত্ত বিভূতি ও মরিচ পাইয়া সকলের মানসিক কামনা পূর্ণ হইতে লাগিল। ঐ বিভূতি ও মরিচ আমাদের গুরুমহারাজের আশ্রমেও আছে।]-শ্রীশ্রীবালানন্দ জীবন। পূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ও পরমানন্দ ব্রহ্মচারী প্রণীত। নব সংস্করণ-১৩৮৯ সাল। পৃষ্ঠা ১৮৭-১৮৯।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অন্তঃকরণ

১। অন্তঃকরণ বলতে কী বোঝায়?

মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার—এই চারটিকে নিয়ে হয় অন্তঃকরণ। এই চারটির আলাদা কাজ আছে। আচ্ছা, তুমি তো প্রফেসর, তুমি বলো দেখি মন আর চিত্তের মধ্যে তফাত কী?

-মন মনন করে, চিত্ত চিন্তন করে।

-না ভাই, তুমি ফেল হয়ে গেলে। 'সংকল্পবিকল্পাত্মকং মনঃ'- এ তো সবাই জানে, এখন মনের কাজ কী এবং চিত্তের কাজ কী তা আমাকে বুঝিয়ে দাও।

- মহারাজ, চিন্তার দ্বারা যখন বিচ্ছিন্ন হতে থাকে তখন তাকে বলে মন, আর তৈলধারার মতো অবিচ্ছিন্নভাবে যখন চিন্তার ধারা চলতে থাকে, তখন তাকে বলে চিত্ত।

- না ভাই, এ কথাটা ঠিক হল না। আমি অনেকের কাছে এই প্রশ্ন করেছি, দু-চারজন মহাত্মা ছাড়া কেউ এর সঠিক উত্তর দিতে পারেনি।

যে চারটি জিনিস নিয়ে অন্তঃকরণ গঠিত, তাদের প্রত্যেকটিরই আলাদা আলাদা কাজ আছে। মনের কাজ হল সংকল্প আর বিকল্প। মন যা-কিছু দেখে, যা-কিছু শোনে, কেবল সেইগুলিই কল্পনা করতে পারে, যা শোনেনি বা দেখেনি সে-বিষয়ে সে কল্পনা করতে পারে না। বুদ্ধি হল নিশ্চয়াত্মিকা। বুদ্ধি কোনো বস্তুর নিশ্চয়তা বুঝিয়ে দেয়। চিত্তের এমন সামর্থ্য রয়েছে যে অগম্য বিষয়েও সে গমন করতে পারে অর্থাৎ সে যা দেখেনি, যা শোনেনি সেখানেও তার যাওয়ার কোনো বাধা নেই। আর রইল অহংকার, এর উপরে আর কিছু নেই। মন, বুদ্ধি, চিত্ত আর অহংকার-এই নিয়েই হল অন্তঃকরণ। অন্তঃকরণই সুখ-দুঃখের উৎপত্তি হয়, অন্তঃকরণেই ভগবানকে উপলব্ধি করা যায়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

২। অহংকারকে কী আত্মা বলা চলে?

হ্যাঁ ভাই, অহংকারকেই আত্মা বলে মেনে নিতে হবে। অহংকারকে ছাড়িয়ে আর এগিয়ে যাবার রাস্তা তো নেই। তবে কথা হল, শুদ্ধ অহংকার আর অশুদ্ধ অহংকার। যেমন অহং শূদ্র, অহং বৈশ্য, অহং ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, অহং দরিদ্র, অহং ধনী, অহং চন্ডাল-এগুলি হল অশুদ্ধ অহংকার। শুদ্ধ অহংকার কাকে বলে? অহং ব্রহ্মাস্মি, আমিই ব্রহ্ম। এই ভাব দৃঢ় হয়ে অন্তঃকরণে বসে গেলে আত্মভাবে পরিণত হবে। আমিই ব্রহ্ম, আমিই আত্মা, আমি জীব নই, এই ভাব বা শুদ্ধ অহংকার থেকেই আত্মজ্ঞান ফুটে উঠবে। আমি ব্রহ্ম, জীব তা জানে না, তাই সে জীবভাব নিয়েই পড়ে রয়েছে।

৩। ত্রিগুণের সংস্পর্শে মন কী ভাবে কাজ করে?

সত্ত্ব, রজ আর তম, এই তিনগুণের বশবর্তী হয়ে একই মন তিন রকম কাজ করে। পা থেকে নাভিমণ্ডল পর্যন্ত যখন মনের গতি থাকে তখন তমোগুণ বৃদ্ধি পায়। নাভিমন্ডল থেকে কণ্ঠ পর্যন্ত যখন মনের গতি থাকে তখন রজোগুণ বৃদ্ধি পায় আর কণ্ঠ থেকে ভ্রূমধ্য পর্যন্ত মনের গতি থাকলে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি পায়। সত্ত্বগুণ প্রবল হলে চিত্তমল একেবারে পরিষ্কার হয়ে যায় আর তখন চিত্তে কতকগুলি সৎবৃত্তি জাগ্রত হয়। এই সৎবৃত্তিগুলি হল নির্ভীকতা, চিত্তপ্রসাদ, জ্ঞান, যোগনিষ্ঠা, দান, ইন্দ্রিয়সংযম, যজ্ঞ, তপ, স্বাধ্যায়, সরলতা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, পরনিন্দাবর্জন, সর্বভূতে দয়া, নির্লোভতা, মৃদুতা, লজ্জা, অচাঞ্চল্য, তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য্য, অন্তর্বহিঃশুদ্ধি, জিঘাংসারাহিত্য, অনভিমানিতা।

সত্ত্বগুণের উদয় হলে এই সৎবৃত্তিগুলি মানুষ লাভ করে আর এদের সহায়তায় সে. ভগবানের অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকে। সত্ত্বগুণ মানুষকে ভগবানের কাছে পৌঁছে দেয়। যাদের মধ্যে রজ আর তম বৃত্তিগুলি প্রবল, তাদের মধ্যে কয়েকটি অসৎ বৃত্তি জেগে ওঠে, যেমন দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, কর্কশতা, অজ্ঞতা। এইসব বৃত্তি মানুষের বন্ধন বাড়িয়ে দেয়, ভগবানের কাছ থেকে তাকে দূরে সরিয়ে দেয়। তাই রজ তম বৃত্তি যাতে বাড়তে না পারে সেদিকে যেমন নজর রাখতে হয়, তেমনি দেখতে হয় কীভাবে সত্ত্ববৃত্তিকে বাড়ানো যায়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

৪। মনকে স্থির করবার উপায় কী?

মন হল চঞ্চল, এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকতে চায় না, বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে ছুটে যায়। এই চঞ্চল মনকে স্থির করতে হবে। কীভাবে তা সম্ভব? ঘোড়া যদি দুরন্ত হয় তাহলে সে পিঠে সওয়ার নিতে চায় না, তখন তাকে সায়েস্তা করবার জন্যে ময়দানে নিয়ে গিয়ে খুব জোরে ছোটাতে হয়। ছুটতে ছুটতে যখন সে একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখনই সে জব্দ হয় আর সওয়ার নিতে আপত্তি করে না। দুষ্ট ঘোড়ার মতো মনকেও সেইভাবে জব্দ করতে হয়।

জ্ঞানরূপী গঙ্গা বয়ে চলেছেন, দুপাশে রয়েছে বিচাররূপী তট। মনরূপী ঘোড়াকে বেশ কয়েক ঘা চাবুক মেরে বিচাররূপী তটে ছেড়ে দাও। অমনি সে ছুটতে শুরু করবে। কিন্তু কতদূর সে ছুটবে? জ্ঞানগঙ্গার তীর শুধু যে বালিতে ভরা, সে বিচারের বালি ভেদ করে তো মনরূপী ঘোড়া বেশিদূর ছুটতে পারবে না, আপনিই থেমে যাবে। আর একবার বসে গেলেই সে স্থির হয়ে যাবে। তবে জ্ঞানগঙ্গার এই যে বিচাররূপী তটের কথা বলা হল সে কেমন বিচার? 'নিত্যানিত্য বিবেকঃ', নিত্যবস্তু কাকে বলে, অনিত্যবস্তুই বা কাকে বলে, তাই বিচার করে দেখা। বারে বারে বিচার করতে থাকলে ভগবানই যে একমাত্র সত্য, আর জগৎসংসার যা-কিছু সব মিথ্যা, তা বোঝা যায়। তাই সব সময় বিচার করতে হয়। মনকে স্থির করতে বিচারই সার।

এখানে বসে তুমি আমার উপদেশ শুনছ, আর মন যে তোমার কলকাতায় উধাও হয়ে গেল! এখন মনকে বাগে আনবার কী উপায় করবে? দেখো ভাই, মনকে বেশ খানিকটা ছুটিয়ে মারো, ছুটতে ছুটতে যখন আর পারবে না, তখনই মন স্থির হবে। হঠযোগে মনকে স্থির করবার নানারকম প্রক্রিয়া রয়েছে। এইসব ক্রিয়ায় জোর করে মনকে থামিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু তোমাদের পক্ষে তা সহজ নয়, তোমাদের পক্ষে সহজ হল রাজযোগ। রাজযোগে মনের উপর কোনো জবরদস্তি করতে হয় না, যেন পিঠে হাত বুলিয়ে বুঝিয়ে শুনিয়ে মনকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে হয় অর্থাৎ মনকে বিচারে নিযুক্ত করে দিতে হয়। জ্ঞানগঙ্গার দুপাশে বিচাররূপী তট, মনরূপ দুরন্ত ঘোড়াকে সেই তটে ছুটিয়ে মারো। কতদুর সে যাবে? 'যত্র-যত্র মনো যাতি তত্র-তত্র সমাধয়ঃ,' মন যেখানে যেখানে যাক, সেখানেই তার সমাধি করে দাও। ভগবান সর্বব্যাপী, তাঁর চৈতন্য সত্তা, ছেড়ে, তাঁর রাজত্ব ছেড়ে মন যাবে কোথায়? তাঁর এলাকা ছেড়ে একেবারে উধাও হয়ে যাওয়ার মতো জায়গা তো নেই, কাজেই যে জিনিস

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নিয়ে ভাবতে বসবে, সে জিনিসেই যে ভগবানের চৈতন্যসত্তা রয়েছে তা তাকে বিচারের দ্বারা বুঝিয়ে দাও। তার মধ্যেই ভগবানকে উপলব্ধি করে মন সমাধিস্থ হয়ে যাক।

মন সর্বদা জীবাত্মারূপী রাজাকে বিষয়ের দিকে ঠেলতে থাকে। জীবাত্মার এতে বড়ো কষ্ট হয়। যদি সদ্‌গুরু মিলে যায়, তাহলে তিনি উপদেশ দেন যে মণিরামকে অর্থাৎ মনকে প্রাণায়ামরূপী বাঁশের উপর ওঠানামা করাও, একবার উঠতে বলো, একবার নামতে বলো অর্থাৎ সব সময় মন যেন শ্বাস-প্রশ্বাসের দিকে লক্ষ্য রাখে। তাহলেই মন জব্দ হয়ে যাবে, জীবাত্মাকে আর বিষয়ের দিকে টানতে পারবে না, জীবাত্মাও তখন নিশ্চিন্ত হয়ে পরমাত্মার সঙ্গে মিলতে পারবে। মনকে কখনো খালি রাখবে না, খালি রাখলেই সে তোমাকে হয়রান করে মারবে। তাই তাকে শ্বাস-প্রশ্বাসের দিকে লক্ষ্য রাখবার কাজে নিযুক্ত করে দাও।

৫। মনের নিম্নগতিকে ঊর্ধ্বমুখী করা যায় কীভাবে?

পূজো করতে বসে তোমরা হয়তো অনেকে লক্ষ্য করেছ যে ভগবানকে ডাকবার সময় মনকে স্থির করতেই তোমাদের কতটা সময় চলে যায়। মন কিছুতেই যেন স্থির হতে চায় না, মন যে কোথায় চলে যায় তার আর পাত্তা পাওয়া যায় না। অথচ গুরুজনের সামনে মা মহৎজনের সামনে ইষ্টচিন্তা করতে বসলে মন সঙ্গে সঙ্গে ঊর্ধ্বগামী হতে থাকে। এর কারণ কী? দেখো বাছা, গুরুজনের চিত্তের সঙ্গে চিত্ত মেলাতে পারলে বিনা চেষ্টায় মনের গতি ঊর্ধ্বমুখী হয়ে যায়, মন একেবার স্থির হয়ে যায়। এর কারণ হল, গুরুজন কখনো তা আপন হৃদয়কে খালি রাখেন না, তিনি তাঁর ইষ্টের মধ্যে সর্বদা তাঁর মনকে ডুবিয়ে দিতে পারে, তবে গুরুজনের মনের মধ্যে যদি কোনো ভক্ত তার মনকে ডুবিয়ে দিতে পারে, তবে গুরুজনের মনের গতির সঙ্গে সঙ্গে তারও মনের গতি ঊর্ধ্বগামী হতে থাকবে। এই বিষয়ে একটা উদাহরণ দেখো—ক্ষুদ্র স্রোত মহৎ স্রোতে মিলিয়ে দাও। কীভাবে মেলাবে? যেমন নদ-নদী মিলিত হয়। নদ-নদী দেখলেই বোঝা যায় তাদের মনের বাসনা কী? তাদের একান্ত বাসনা সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হওয়া। কত মরু, কত পাহাড়, কত পর্বত লঙ্ঘন করে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অবশেষে একদিন সমুদ্রে গিয়ে মিলবে, এই হল তাদের একমাত্র ধ্যান-ধারণা। তাদের গতি দেখলেই সেকথা বোঝা যায়।

যে নদীর জল বেশি আর স্রোতও তীব্র, আপন শক্তিতেই তার অভীষ্ট লাভ হতে পারে, তার বাসনা চরিতার্থ করে সে সমুদ্রে গিয়ে মিশতে পারে, তবে যে নদীর জল অল্প, স্রোত ক্ষীণ, তার পক্ষে সমুদ্রে পৌঁছন কঠিন বটে। তার ক্ষুদ্র ধারা হয়তো পথের মরুবালুকাতেই শুকিয়ে রুদ্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু এই ক্ষুদ্র নদী যদি বুদ্ধিমান হয় তবে সে তার ক্ষুদ্র ধারাকে কোনো বড়ো নদীর স্রোতের সঙ্গে মিলয়ে দেয়। বড়ো নদীতে জল বেশি থাকায় সে তো আর শুকোবে না, ছোটো নদীও তাই বড়ো নদীর সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রকে লাভ করবে। এ ছাড়া সমুদ্রকে পাওয়ার আর কোনো উপায় তার নেই! নদীর বেলায় যেমন, মানুষের বেলাতেও সেই একই ব্যাপার। মানুষেরও একান্ত বাসনা পরমাত্মারূপ সেই মহাসমুদ্রকে লাভ করা। সেই অভীষ্ট লাভ হলে তার শান্তি মিলবে।

তবে কথা হল, অভ্যাস ও বৈরাগ্যবলে যে বলীয়ান, সে তো অতি সহজেই তার অভীষ্টদেব পরমাত্মাকে লাভ করতে পারে। কিন্তু যার সাধনা ক্ষীণ, তার পক্ষে পরমাত্মারূপ সমুদ্রকে পাওয়া কঠিন। তেমন লোক বিষয়-বাসনারূপ মরুভূমিতে পড়ে শুকিয়ে মরে, ভগবান লাভের কামনা তার পূর্ণ হয় না। তবে কোনো ভাগ্যবান মানুষ যদি কোনো অভ্যাসবান বৈরাগ্যবানের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিতে পারে অর্থাৎ কোনো গুরুজনের, কোনো মহৎজনের মনের সঙ্গে যদি নিজের মনকে মিলিয়ে দিতে পারে, তবে তার সাধনা ক্ষীণ হওয়া সত্ত্বেও সে ভগবানের সঙ্গ লাভ করতে পারে। তাতেই তার বাসনা পূর্ণ হয়ে যায়, তার পরম শান্তি মেলে। মহৎ শক্তির সঙ্গে ক্ষুদ্র শক্তি মিলতে পারলে তার কত সুবিধা হয় জাহাজের দৃষ্টান্ত দিয়ে তা তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি।

কোনো জাহাজ তার গন্তব্যস্থলে তাড়াতাড়ি পৌঁছে যেতে পারে, কিন্তু নৌকো তা পারে না। তবে ঐ ক্ষুদ্র নৌকোকে মজবুত কাছি দিয়ে যদি কোনো জাহাজের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া যায়, তাহলে ঐ জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে নৌকোও বিনা চেষ্টাতে তাড়াতাড়ি গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাবে। তেমনিভাবে কোনো সুচতুর ভক্ত কোনো মহৎজন বা গুরুজনের চরণকমলের সঙ্গে আপনার মনরূপী ক্ষুদ্র নৌকোখানিকে যদি ভক্তিকাছি দিয়ে বেঁধে ফেলতে পারে, তাহলে সেই ভক্তও গুরুজনের শক্তিতে ভবসমুদ্র বিনা চেষ্টায় পার হয়ে যেতে পারে। তবে ভক্তিকাছিটি মজবুত ও বন্ধনটি শক্ত হওয়া চাই, অর্থাৎ ভক্তি আর বিশ্বাস দৃঢ়,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নির্মল, পরিশুদ্ধ হওয়া চাই। অহৈতুকী অনন্যা ভক্তির দরকার, নইলে বাঁধন ছিঁড়ে যেতে পারে। তাই বলছি মনের গতিকে যদি ঊর্ধ্বমুখী করে তুলতে চাও, তবে গুরুজন ও মহৎজনের সঙ্গে চিত্ত মিলিয়ে দাও।

গুরুজনের চরণকমলে ভক্তি হলেই আপনা থেকেই তাঁদের চিত্তের সঙ্গে তোমার চিত্ত মিলে যাবে। প্রথমে 'অন্নময়কোষ', দ্বিতীয় 'প্রাণময়কোষ', তৃতীয় 'মনোময়কোষ', চতুর্থ 'বিজ্ঞানময়কোষ' আর পঞ্চম 'আনন্দময়কোষ'। অন্নময় কোষ হল এই স্থূল শরীর, প্রাণময়কোষ আর মনোময়কোষ হল সূক্ষ্ম শরীর, বিজ্ঞানময়কোষ আর আনন্দময়কোষ হল কারণ শরীর। স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ এই তিনটিই মিলে যায়, তখন গুরুজনের যে আনন্দ অর্থাৎ আত্মানন্দ তার ভাব মিলতে পারে, দেখো বাছা, মনের যা গতি তা হল নিম্নমুখী, মনের স্বভাব হল জলের মতো। নীচু জমি পেলে জল সেদিকেই বয়ে যাবে, তখন তার নাম হয় 'ধারা'। কোনো কৌশল যদি ঐ জলের গতির উপর দিকে ওঠানো যায়, তাহলে তার নাম হবে 'ফোয়ারা'।

'যোগঃ কর্মসু কৌশলম্', কর্মের কৌশলই যোগ, কৌশল করে কর্ম করতে পারলে যা অসাধ্য, তাও সুসাধ্য হয়ে ওঠে। এই জলের গতি দিয়েই মনের গতি বুঝে নিতে হবে। মনের গতি স্বভাবতই নিম্নদিকে, যেমন ছেলেমেয়ের প্রতি মোহ জাগে, টাকা-পয়সা বা পরিবারের প্রতি মোহ জন্মায়, এ মোহ আপনা আপনিই জেগে ওঠে, জলের ধারার মতো এই মোহের স্রোতে মন একেবারে ভেসে যায়। তবে হুঁশিয়ার হতে পারলে ঐ ধারাকে কৌশল করে উপরের দিকে তুলে ফোয়ারা বানিয়ে নেওয়া যায়। কীভাবে? যেমন পিতা-মাতা বা গুরুজনদের প্রতি একবার এই ভক্তি জাগলেই মনের গতি ঊর্ধ্বমুখী হয়ে যায়। একই মনোবৃত্তি পুত্র আদিতে হলে হয় মোহ আর গুরুজনদের প্রতি হলে হয় ভক্তি ও শ্রদ্ধা।

৬। অন্তঃকরণকে কিভাবে শুদ্ধ করা যায়?

অন্তঃকরণেই সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়, আবার অন্তঃকরণেই ভগবানকে উপলব্ধি করা যায়। মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য হল জ্ঞান উপার্জন করা। মানুষ অন্তঃকরণকে মলিন করে রেখেছে, তাই সেখানে চৈতন্যের উপলব্ধি হয় না। লণ্ঠনের কাঁচে কালি মাখানো থাকলে ভিতরের আলো যেমন দেখা যায়না,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কালি পরিষ্কার করে দিলেই আলো যেমন প্রকাশ পায়, তেমনি রজ আর তমোগুণ অন্তঃকরণকে মলিন করে রাখে। শুদ্ধ সত্ত্বগুণ অন্তঃকরণে স্থিতিলাভ করলে তবেই অন্তঃকরণ শুদ্ধ হবে, পরিষ্কার হবে আর তখনই জ্যোতিরূপী চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মাকে অন্তঃকরণে অনুভব করা যায়।

চিত্তশুদ্ধির এক সহজ উপায় তোমাকে বাতলে দিচ্ছি। তুমি মধুকর হয়ে যাও। হিমালয়ে ভ্রমণ করবার সময় দেখলাম গাছে গাছে লাল ফুল ফুটে রয়েছে আর সেই ফুল থেকে মৌমাছিরা মধু সংগ্রহ করছে। আমার সঙ্গে যে পাহাড়ী কুলিরা ছিল তারা বলল ও হল কালকূট বিষের গাছ, ঐ ফুলের গন্ধ নাকে গেলে মানুষ মরে যেতে পারে। আমি তো শুনে অবাক, ভগবানের এ কী বিচিত্র লীলা। অমন বিষের মধ্যে থেকেই মৌমাছিরা মধু সংগ্রহ করছে! তোমাদের প্রতি তাই আমার উপদেশ, তোমরা সবকিছুর মধ্যে থেকে দোষকে ত্যাগ করে গুণকে গ্রহণ করবে, তাহলেই দেখবে তোমাদের চিত্ত একদম মৌচাকে পরিণত হবে, তোমাদের পরম কল্যাণ সাধিত হবে। চিত্তশুদ্ধির এক সুগম পন্থা হল পরের দোষ অণ্বেষণ করা থেকে বিরত হওয়া আর সকলের মধ্যে যে গুণ আছে, তা গ্রহণ করা। দোষে-গুণে মিশ্রিত এই সংসার, এমন কোনো বস্তু এখানে নেই যার সমস্তটাই দোষে বা গুণে ভরা। মৌমাছির স্বভাব দেখো, বিষের থেকেও সে কেমন অমৃতটুকু গ্রহণ করে। এই হল তার স্বভাব। আর বিষমক্ষিকার স্বভাব হল, যেখানেই বসবে সেখান থেকেই অমৃত ছেড়ে বিষ সংগ্রহ করবে। দেখো ভাই, কী সহজ রাস্তা তোমাকে বলে দিলাম, তুমি মধুমক্ষিকা হয়ে যাও, কেবল পরের গুণ দেখতে চেষ্টা করো, তাহলে আপনা থেকেই তোমার চিত্তশুদ্ধি হয়ে যাবে, তার জন্যে অন্য কোনো চেষ্টা তোমাকে করতে হবে না।

কোনো মানুষের মধ্যে দশটা দোষ থাকতে পারে, কিন্তু অন্ততঃ একটা না একটা গুণ থাকবেই। তুমি সেখানে দোষ দেখতে যেওনা, তার গুণটাকেই দেখো। কোনো গুণ নেই, এমন কোনো জিনিস ভগবান সৃষ্টি করেননি। পরের দোষ অনুসন্ধান করতে থাকলে হৃদয় মলিন হয়ে যায়, সেইজন্যেই আমার আদেশ ওটি তোমাদের ছাড়তে হবে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

৭। জপ-তপেও অনেকের চিত্তশুদ্ধি হয় না কেন?

শঙ্কর ভগবানকে পার্বতী দেবী জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "হে দেব, চিত্তশুদ্ধির প্রধান উপায় কী?" ভগবান শঙ্কর বললেন ঃ "জপাৎ শুদ্ধি জপাৎ শুদ্ধি জপাৎ শুদ্ধি", অর্থাৎ হে পার্বতী, জপ যজ্ঞ দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়। দেখো ভাই, অনেকে আমার কাছে এসে বলে, বহুদিন ধরে আমি জপ করছি, তবু আমার চিত্তশুদ্ধি হচ্ছে না কেন? আমি তাদের বলি, তোমরা জপ তো করছ, কিন্তু সেইসঙ্গে পরের দোষও যে খুঁজে বেড়াচ্ছ, তাতেই শুদ্ধ অন্তঃকরণ আবার মলিন হয়ে যাচ্ছে। কীরকম জানো? বাড়িখানাকে বেশ করে ধুয়েমুছে পরিষ্কার করলে, কিন্তু দরজা-জানলাগুলোকে বন্ধ করলে না। ঝড়-বাতাসে যত রাজ্যের ময়লা আবর্জনা ঢুকে বাড়িখানাকে আবার নোংরা করে ফেলল। এ হল হাতির স্নান করা। হাতি স্নান করবার পর আবার গায়ে ময়লা মেখে নেয়। তাই বলছি বাড়ি একবার ধোয়া হয়ে গেলে দরজা-জানলা বন্ধ করে দিতে হয় যাতে আর ময়লা ঢুকতে না পারে। তোমরা তো অনেক জপ করলে, অন্তঃকরণও শুদ্ধ হল, কিন্তু পরের দোষ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ময়লার চিত্তকে যে আবার মলিন করে ফেললে। সকল ধর্মেই চিত্তমল ক্ষালনের কথা বলা হয়েছে। মুসলমান ফকিররা বলে 'দিল্ সাফ্ করো', আমরা বলি 'অন্তঃকরণ শুদ্ধ করো'।

ধর্মের পথে যারা চলে তার অন্তঃকরণকে শুদ্ধ করে বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পরের দোষ অনুসন্ধানরূপ ময়লাকেও হটাতে পারে না। তাই তোমাদের প্রতি আমার এই উপদেশ যে পরের দোষ অনুসন্ধানরূপ মালিন্য যাতে না তোমাদের স্পর্শ করে তার জন্য তোমরা বিশেষভাবে চেষ্টা করবে। এ বিষয়ে তোমাদের খুব সাবধান হতে হবে, নইলে হাজার জপযজ্ঞেও কোনো ফল হবে না।

৮। শুদ্ধ অন্তঃকরণে কী ভবিষ্যৎ জানা যায়?

মল, বিক্ষেপ, আবরণ ভঙ্গ হলেই ভবিষ্যতের সবকিছু জানা যায়। আবরণ অর্থাৎ আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিতে একটা পর্দা পড়ে গিয়েছে, চিত্তদর্পণে ময়লা পড়েছে, সেই ময়লা যখন পরিষ্কার হয়ে যাবে, চিত্ত যখন স্বচ্ছ স্ফটিকের মতো নির্মল হবে, তখন ভবিষ্যৎ আর অগোচর থাকবে না। এই ময়লা রজোগুণ থেকে উৎপন্ন হয়। তাই প্রথমে রজোগুণকে কমানো দরকার। সাধারণের পক্ষে রজোগুণকে হটানো কঠিন। তবে অধিকারীর পক্ষে কঠিন নয়। চাষাকে যদি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তুমি ইংরেজি বই পড়তে দাও, তাহলে তার কাছে তা খুব কঠিন বলে মনে হবে, কিন্তু তোমার কাছে তা একটুও কঠিন ঠেকবে না। এর কারণ কী? কারণ তুমি ইংরেজি ভাষা তুমি আয়ত্ত করেছ, ইংরেজি ভাষাতে প্রতিপত্তি লাভ করবে বলে ছেলেবেলা থেকেই কত চেষ্টা করেছ, তবেই না ক্রমে ক্রমে ঐ ভাষায় তোমার অধিকার জন্মেছে। বাইরের জিনিস আয়ত্ত করতে যখন এত সময়, এত চেষ্টার দরকার, তখন আন্তরবস্তু আয়ত্ত করতে হলেও অনেক যত্ন ও পরিশ্রম করতে হয়। একদিনেই আয়ত্ত হয়ে যাবে তা তো হয় না। অধিকারী না হওয়া পর্যন্ত শক্ত ঠেকবে, কিন্তু অধিকার জন্মে গেলে সব সহজ হয়ে যায়। তুমি অন্তর্জগতকে আয়ত্ত করো, দেখবে ভূত, ভবিষ্যত, বর্তমান সব তোমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। তবে কথাটা হল এই যে ভবিষ্যৎকে জানতে পারবে বটে, কিন্তু যা হবার তা তো হবেই হবে, তাকে তুমি রোধ করতে পারবে না।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সৃষ্টি/মায়া

১। সৃষ্টি কোন্ কোন্ জিনিসে গঠিত?

সৃষ্টির মধ্যে আছে কী? পঞ্চভূত, তিন গুণ, মায়া আর চৈতন্য। এছাড়া আর কিছুই নেই। সৃষ্টিতে যা-কিছু আছে এইগুলিরই অন্তর্গত।

২। এই জগৎ কি মিথ্যা?

ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। কিন্তু তাই বলে জগৎ যে একদম অশ্বডিম্ব, আকাশকুসুম, সোনার পাথরবাটি বা বন্ধ্যার পুত্রের মতো একেবারে মিথ্যা অস্তিত্ববিহীন, তা নয়। কিছু সত্য এর মধ্যে আছে। কী রকম জানো? যেন একটা প্রদীপ জ্বলছে, তার পাশে তুমি একটা হাজার পাওয়ারের বিজলী বাতি নিয়ে এসে রাখলে। তখন প্রদীপের আলো যেমন মিথ্যা হয়ে যায়, জগৎ সেইরকম মিথ্যা। অমিত প্রভাবশালী ব্রহ্মকে মানুষ যখন অনুভব করতে পারে তখন তার কাছে জগৎ সংসার, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা সব হীনপ্রভ ক্ষীণ হয়ে পড়ে থাকে, তবে একেবারে মিথ্যা হয়ে যায় না। আকাশকুসুম কিংবা অশ্বডিম্বের কোনো অস্তিত্ব নেই, ওগুলো শুধু কথার কথা। কিন্তু জগৎ সংসার তো কেবল কথার কথা নয়। ব্রহ্মজ্ঞান হলে প্রকৃতি বলো, মায়া বলো আর জগৎ সংসারই বলো, সব ক্ষীণ হয়ে যায়, অস্তিত্ববিহীন মিথ্যা হয়ে যায় না। জগৎকে মিথ্যা বললে ভগবানও তো মিথ্যা হয়ে যান, কেননা ভগবান হলেন সর্বব্যাপী বিভু, তিনি কি জগতের বাইরে রয়েছেন? তাহলে যে তাঁর সর্বব্যাপিত্বে দোষ পড়বে। ভগবানের সত্তাতেই জগৎসংসার ভাসমান।

দেখো ভাই, জগৎকে মিথ্যা বললে ভগবানও মিথ্যা হয়ে যান। যেমন সমুদ্র আর তার তরঙ্গ অভেদ, কিন্তু তরঙ্গ ক্ষণধ্বংসী, উঠছে আর পড়ছে। ক্ষণে ক্ষণে তা বদলে যাচ্ছে, কিন্তু তবু তাকে তুমি মিথ্যা বলতে পারবে না।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সত্যস্বরূপ সমুদ্রে তরঙ্গের স্থিতি, তাই তা মিথ্যা নয়। সমুদ্রের সঙ্গে সঙ্গে তার ক্ষণধ্বংসী তরঙ্গও যেমন সত্য, ব্রহ্মসত্তায় স্থিত জগৎও তেমনি সত্য। সমুদ্র আর তার তরঙ্গ অভেদ, কিন্তুসমুদ্রেই তরঙ্গ, তরঙ্গের সমুদ্র কেউ বলবে না। ব্রহ্ম হলেন সমুদ্রের মতো, আর জগৎসংসার সেই সমুদ্রের তরঙ্গ। এবার এই দৃষ্টান্ত থেকে তুমি আসল কথাটি বুঝে নাও।

৩। সৃষ্টির মধ্যে মনুষ্যজীবনকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হয় কেন?

এই মনুষ্যজীবন হল মোক্ষের দ্বার। এই দরজা দিয়ে মানুষ ভূলোক, স্বর্গলোক, জনলোক, তপলোক, মহর্লোক এবং সত্যলোকেও যেতে পারে, একেবারে মোক্ষ পর্যন্ত লাভ করতে পারে। এই যে মনুষ্য জীবন, এই জীবন কর্মের উপার্জন হয়, কিন্তু স্বর্গ ইত্যাদি লোকে যে দেবতারা থাকেন সেখানে তাঁদের কিছুই উপার্জন হয় না। মর্ত্যালোক হল কর্মভূমি, স্বর্গ আদি ভোগভূমি। এই মর্ত্যালোকে মনুষ্যজীবনে শুভ কর্ম দ্বারা পুণ্য উপার্জন হয় আর ত্যর প্রভাবে দেবযোনি লাভ করে স্বর্গ আদি ভোগ করা যায়। ক্রমে সেই পুণ্যের ফল ক্ষীণ হলে দেবযোনিতে আর থাকা চলে না, স্বর্গ থেকে আবার এই মর্ত্যালোকে ফিরে আসতে হয়। দেবতারাও মর্ত্যলোককে আর মনুষ্য জীবনকে শ্রেষ্ঠ বলে মানেন। কেন মানেন? মানেন এই কারণে যে মানুষ সাধনার বলে ভগবানকে পর্যন্ত লাভ করতে পারে, একেবারে মোক্ষ পর্যন্ত লাভ করতে পারে। দেবতাদের তো সে সুযোগ নেই, তাঁরা ভোগভূমিতে যান, স্বর্গ আদি ভোগ করেন, পুণ্য ক্ষীণ হলেই সেখান থেকে তাঁদের নেমে আসতে হয়। সৃষ্টিকর্তা যে ব্রহ্মা, পুণ্য ক্ষীণ হলে তাঁরও পতন হয়, অন্য দেবতার আর কথা কী? এক মোক্ষলাভ হলে, ভগবানকে লাভ করলে আর পতনের সম্ভাবনা থাকে না, আর সেটা সম্ভব হয় একমাত্র এই মনুষ্যজীবনে। এ হল মোক্ষের দ্বার, তাই সৃষ্টির মধ্যে মনুষ্য জীবনকেই সর্বশ্রেষ্ঠ জীবন বলা হয়।

৪। জড় ও চেতনে প্রভেদ কী?

তুমি বলছ, যাকে ক্রিয়াশীল দেখা যায়, তাই হল চেতন আর যার মধ্যে কোনো ক্রিয়া দেখা যায় না, তাই হল জড়। তাহলে তো ভাই ইঞ্জিনকে চেতন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বলতে হয়, ঘড়িকেও চেতন বলতে হয়, কারণ তাদের মধ্যে ক্রিয়া দেখা যায়। তোমার এ যুক্তি ঠিক হল না। চৈতন্য তো সর্বব্যাপী, জড় আর চৈতন্যকে তুমি যদি আলাদা বলতে চাও তাহলে চৈতন্য যে ছেদ পড়ে গেল, তার সর্বব্যাপিত্ব রইল কোথায়? জড়ের মধ্যে যে চৈতন্য নেই, কোন্ যুক্তি দিয়ে তুমি তা প্রমাণ করবে? জড় আর চৈতন্য কোনো আলাদা জিনিস নয়। তবে আলাদা মনে হয় কেন? এই ভেদ-ভ্রান্তি সৃষ্টি করে মায়া। দড়ি দেখে যেমন সাপ বলে ভুল হয়, যদিও বাস্তবিক সেখানে সাপের অস্তিত্বই নেই, তেমনি জড়ে আর চৈতন্যেও একটা ভ্রান্তিদেখা যায়। একমাত্র চৈতন্য সত্তাই সর্বত্র বিদ্যমান, জড় বলে কোথাও কিছু নেই। জগৎসংসার সব চৈতন্যময়। যেমন বিম্ব আর প্রতিবিম্ব। বিম্বে আর প্রতিবিম্বে ভেদ কোথায়? কোনো ভেদ নেই। মায়ারূপী আয়না সামনে থাকলে তবেই বিম্ব আর প্রতিবিম্ব আলাদা হয়ে ধরা দেয়। প্রতিবিম্ব রয়েছে কোথায়? বিম্বতেই রয়েছে। জগৎ সংসার যা-কিছু দেখছ, সব সেই চৈতন্যময় বিম্বেরই প্রতিবিম্ব, তারই ছায়া। মায়ারূপী আয়নাখানা ভেঙে গেলেই ঐ ছায়া কায়াতে মিশে যাবে, তখন আর তাদের আলাদা বলে বোঝা যাবে না, জড় চৈতন্য সব এক হয়ে যাবে।

৫। মায়া, প্রকৃতি বা অবিদ্যার উদ্ভব এবং অবস্থান কোথায়?

অবিদ্যার উৎপত্তি হয়েছে কোথা থেকে? ঈশ্বর থেকে। অবিদ্যা বা প্রকৃতি বা মায়া কোন্ আঁধারে অবস্থান করে? ঈশ্বরেই অবস্থান করে, কীভাবে অবস্থান করে? যেমন কোনো সর্বাঙ্গসুন্দর লোকের সৌন্দর্যে কোনো খুঁত নেই, কেবল এক জায়গায় একটা কালো তিল রয়েছে, তিল থাকার দরুণ তার কোনো বাধা জন্মাচ্ছে না, এমন কি তিল যে রয়েছে তা সে খেয়ালও করে না। এইভাবে ঈশ্বরের মধ্যে মায়া বা অবিদ্যার স্থিতি। তাই বলা হয় 'একাংশেন স্থিতং জগৎ'।

ব্রহ্মের এক অংশে জগৎ অবস্থিত, ব্রহ্ম ছাড়া আর কোনো বস্তুরই অস্তিত্ব নেই। মায়ার দুই শক্তি—বিদ্যাশক্তি আর অবিদ্যাশক্তি। বিদ্যাশক্তি শুদ্ধ, সত্ত্ব, স্বচ্ছ, আর অবিদ্যাশক্তি রজস্তমযুক্ত, বিদ্যাশক্তি সগুণ ব্রহ্মে অবস্থিত, অবিদ্যাশক্তি জীবে অবস্থিত। স্বচ্ছ স্ফটিকের মতো কাঁচের ঘরে কেউ যদি আবদ্ধ থাকে তাহলে ভিতরের ও বাইরের সবকিছু সে দেখতে পায়, তেমনি মলিন কঠিন ইঁটের প্রাচীর দেওয়া ঘরে কেউ বাস করলে সে বাইরের কিছুই দেখতে পাবে না। মায়ার অধীন সগুণ ব্রহ্ম যেন এমনি কাঁচের ঘরের ভিতর

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রয়েছেন, তিনি সর্বজ্ঞ, সবকিছু দেখছেন, কিছুই তাঁর দৃষ্টির অগোচরে নেই। আর জীব বসে আছে ইঁটের প্রাচীর-ঘেরা ঘরে। জীব কেমন? যেন কুয়োর ব্যাঙ, কুয়োর বাইরে কী আছে কিছুই জানে না। রয়েছে তো জলেরই মধ্যে, কিন্তু সমুদ্র কেমন সে খবর রাখে না। যেমন সোনার আর লোহার শৃঙ্খল। কারুর গলায় যদি লোহার শৃঙ্খল থাকে তাহলে বোঝা যায় যে সে কয়েদী, আর কেউ যদি গলায় সোনার শৃঙ্খল পরে তাহলে তাকে কয়েদী বলে মনে হবে না, বুঝতে হবে সে গলায় সোনার অলংকার পরেছে। এইভাবে মায়ার যে বিদ্যাশক্তি, তা হল সগুণ ঈশ্বরের কণ্ঠভূষণ, তাতে ঈশ্বরের শোভা বর্ধন হয় অথচ তার দ্বারা তাঁকে কোনো কষ্টভোগ করতে হয় না। কিন্তু মায়ার অবিদ্যাশক্তি লোহার শৃঙ্খলে আবদ্ধ কয়েদীর মতো জীবকে অশেষ ক্লেশ দিতে থাকে। এক নির্গুণ ব্রহ্ম মায়ার অধীন নন, তিনি মায়াধীশ, অর্থাৎ মায়ার অধীশ্বর।

৬। জগৎপ্রপঞ্চকে মায়ার খেলা হয় কেন?

মাটির পিণ্ড থেকে ঘড়া, থালা, ঘটি, বাটি আর কতরকম পুতুল তৈরি হয়, কিন্তু এদের ভিতরকার মূল বস্তুটি হল মাটি, মাটি ছাড়া এদের অন্য কোনো অস্তিত্ব নেই। এখানে মূল বস্তু অর্থাৎ মাটির পিণ্ড হল ভগবান আর মাটি থেকে এইযে ঘটি-বাটি-পুতুল তৈরি হল, এরা হল মায়া। এই দৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চ যা দেখছ, এই ঘর-বাড়ি, লোক-জন সমস্তই হল মায়ারই খেলা, কিন্তু সবকিছুর মূল হলেন ঈশ্বর। ঈশ্বরের তিন গুণ—অস্তি, ভাতি, প্রিয়, তিনি আছেন, তিনি প্রকাশ পাচ্ছেন, তিনি আনন্দরূপে সবকিছুর মধ্যে বিরাজ করছেন। মায়ারও তিন গুণ—নাম, রূপ, ক্রিয়া। যেমন সোনার তাল থেকে অলংকার তৈরি হল, তার নাম হল বালা, রূপ হল গোলাকার আর ক্রিয়া হল হাতে পরা। এই নাম-রূপ ক্রিয়া নাশ হয়ে যায়। বালাকে গলিয়ে ফেললে সে আবার সোনার ডেলা হয়ে যাবে, তার নাম-রূপ-ক্রিয়া লোপ পাবে। মায়ার গুণ নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু ঈশ্বরের যে তিন গুণ তা কখনো নষ্ট হয় না। ঈশ্বরের অস্তিত্ব ছাড়া কিছুই থাকতে পারে না, এই দৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চ মায়ার খেলায় বহুরূপে প্রকাশ পাচ্ছে, কিন্তু এর মূলে রয়েছেন একই ঈশ্বর, যেমন এক সোনার তাল থেকে নানারকম অলংকার তৈরি করা হয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

৭। মায়া কীভাবে মানুষকে ভোলায়?

মায়ার কাজই হল জীবকে ভুলিয়ে রাখা যাতে সে ভগবানের কাছে যেতে না পারে। কীভাবে ভোলায়? মা যেমন নিজের ছেলেকে দাসীর কাছে দিয়ে বলে দেন, তুমি ছেলেটাকে খেলা দিয়ে ভুলিয়ে রাখবে, চট্ করে আমার কাছে আসতে দেবে না। তবে যদি খুব বেশি কান্নাকাটি করে আর তাকে ভুলিয়ে রাখতে না পারো, তখনই কেবল আমার কাছে নিয়ে এসো, তার আগে নয়। ভগবান বিশ্বজননী, জীব তাঁর ছেলেমেয়ে, অবিদ্যারূপিনী মায়া তাঁর দাসী। সেই দাসীই আমাদের ভুলিয়ে রেখেছে, মায়ের কাছে যেতে দিচ্ছে না। মায়ের কাছে যাওয়ার জন্যে আমরা কাঁদতে শুরু করলেই দাসী অমনি আমাদের ভোলাবার জন্যে কতকগুলি খেলনা এনে আমাদের সামনে হাজির করে। সেই খেলনাগুলি কী? ধন, যশ, মান, পুত্র-কলহ, এইসব হল মায়ার হাতের খেলনা। এইসব নিয়েই জীব মুগ্ধ হয়ে খেলা করতে থাকে, মায়ের কথা তার আর মনে পড়ে না।

৮। মা হয়ে বিশ্বজননী সন্তানকে মায়ার হাতে সঁপে দেন কেন?

সংসারে সর্বদাই তো তোমরা দেখতে পাও মা যখন ঘরের নানারকম কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকেন তখন ছেলেকে সামলাবার জন্যে দাসীর হাতে তুলে দেন। নইলে তাঁর গৃহকর্মে ব্যাঘাত ঘটে। কিন্তু ছেলে একবার কান্না শুরু করলে মা সব কাজ ফেলে দাসীর কাছ থেকে ছেলেকে নিজের কোলে তুলে নেন। বিশ্বজননীও তেমনি আমাদের ভুলিয়ে রাখবার জন্যে অবিদ্যারূপিণী মায়ার হাতে আমাদের তুলে দেন।

৯। মায়ার হাতে থেকে কীভাবে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়?

বিশ্বজননী ভগবান ছেলেকে মায়ার হাতে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে চান। মায়াও ধন-মান-যশ প্রভৃতি নানারকম খেলনা দিয়ে ছেলেকে ভুলিয়ে রাখে। কিন্তু ছেলে যদি তেমন চালাক হয় কী করে? যত খেলনাই তাকে দাও না কেন, সে সব ছুড়ে ফেলে দেবে আর মায়ের কাছে যাওয়ার জন্যে কান্নাকাটি জুড়ে দেবে। দাসী তাকে কোলে তুলে যতই আদর করতে যায় ততই সে তার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

চুলের মুঠি ধরে টানে, কাপড় ছিঁড়ে দেয়, আঁচড়ে কামড়ে তাকে অস্থির করে মারে। নাস্তানাবুদ হয়ে তখন দাসীকে বলতে হয় ঃ 'বাবারে বাবা, এ ছেলেকে সামলানো কি আমার কাজ? চলো বাপু, তোমাকে তোমার মায়ের কাছে দিয়ে আসি।'' যে-মায়া জীবকে ভুলিয়ে রেখেছিল, সেই মায়াই আবার জীবকে কোলে করে তার মায়ের কাছে পৌঁছে দেয়।

সাধন পথে যে-মায়া বিঘ্ন সৃষ্টি করে, সিদ্ধিলাভের পর সেই মায়াই সহায়করূপে দেখা দেয়। মানুষের সাধনার সময় দুর্দান্ত ইন্দ্রিয়গণ যেভাবে মানুষের অনিষ্ট করতে তৎপর হয়, সিদ্ধ অবস্থায় সেই ইন্দ্রিয়রাই ইষ্টদেবের সেবাকার্যে নিযুক্ত থাকে। মায়ার হাতে থেকে নিষ্কৃতি পেতে হলে তাই ভগবানের জন্যে কাঁদতে হয়, আকুল প্রাণে তাঁকে ডাকতে হয়, তবেই সেই ডাক তার কাছে পৌঁছয় আর মানুষও তখন মায়ার হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে।

মায়াপ্রপঞ্চে মানুষ ঘুরে মরছে, তুব ভগবানের আশ্রয় কেউ নেবে না। ভগবানের শরণাপন্ন হলে তবেই মায়াপ্রপঞ্চ থেকে নিষ্কৃতি মেলে আর মায়াপ্রপঞ্চ ঘুচলেই জন্মমরণশীল এই যে ভবরোগ, তার থেকে মানুষ মুক্তি পায়। ভগবানের শরণাগত হলেই ভবরোগ থেকে মুক্তি। বলো তো ভাই, ভবব্যাধি নিবারণের এমন সহজ পন্থা আর কি কিছু আছে? মায়া তো ভগবানের দাসী, আমি যদি সেই ভগবানেরই আশ্রয় নিই, দাসী কি আমাকে আর দুঃখ দিতে সাহস পাবে?

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ধর্মপথের অন্তরায়
ও
তাদের অপসারণ

১। দেহের প্রতি আসক্তিকে কিভাবে দূর করা যায়?

বিচার করে দেখো, তাহলেই দেখবে শরীরের প্রতি এক ঘৃণা জন্মাবে। শরীরে আছে কী? মল, মূত্র, রক্ত, মাংস অথচ এই ঘৃণিত শরীরের উপর আমাদের আসক্তির অন্ত নেই। নিজের শরীরের উপর প্রত্যেকেরই আসক্তি রয়েছে, আর স্ত্রী-পুত্রের দেহের প্রতিও কত না আসক্তি আমাদের! স্ত্রী-পুত্রের প্রতি এইযে আসক্তি, তা আমাদের নিজেদের স্বার্থের জন্যে। যেখানেই যার স্বার্থ, সেখানেই তার প্রীতি, যেখানে স্বার্থ নেই, সেখানে প্রীতিও নেই। যে যার স্বার্থ নিয়েই কাজ করে চলেছে। এই স্বার্থকে উল্‌টে দাও, অমনি তা পরার্থ হয়ে যাবে। আসক্তির সঙ্গে কাজ করলে তা বন্ধনের সৃষ্টি করে, কিন্তু বিচারবুদ্ধির সহায়তা নিয়ে পরের কল্যাণে কাজ করাকে স্বার্থ বলে না, তা পরার্থ হয়ে যায়। আসল কথা হল দৃষ্টিটাকে উল্‌টে দেওয়া। মল-মূত্র ভরা এই শরীরটাকেও অন্য দৃষ্টিতে দেখো। দেখতে পাবে শরীর ঘৃণ্য নয়। এই শরীরটাকে আশ্রয় করে কে বিরাজ করছেন? আত্মারাম। আত্মা যেখানে বিরাজ করেন তা কি কখনো ঘৃণার বস্তু হতে পারে? এই দেহ হল শ্রীমন্দির। এরই মধ্যে রয়েছেন চৈতন্যরূপী আত্মা।

দেহের বিষয় ভোগ করবার জন্যে মন যখন চঞ্চল হয়ে উঠবে, তখন শরীরের উপর ঘৃণিত ভাব নিয়ে আসা উচিত। তখন বিচার করে দেখতে হয় এ শরীরের মধ্যে রয়েছে কী? মল, মূত্র, রক্ত, মাংস। এ শরীরের পরিণাম কী? চিতাভস্ম। এইভাবে বিচারের দ্বারা ভোগলালসা দূর হয়ে যায়। আবার যখন ভগবানের আরাধনায় মন যাবে তখন মনে করতে হবে যে আমার এদেহ হল শ্রীমন্দির, এখানে ভাগবান নিবাস করছেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

২। ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব থেকে কীভাবে মুক্তি পাওয়া যায়?

জীবজীবনে মনুষ্যজীবন হল সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ জীবন। মানুষের চেয়ে বাঘ, সিংহ হাতি, ঘোড়া প্রভৃতি জানোয়ারের দৈহিক শক্তি কত বেশি। কিন্তু মানুষের বুদ্ধি আর কৌশলের সঙ্গে তাদের কোনো তুলনা হয় না। আমাদের এই কায়ারূপী জঙ্গলে দুর্জয় ইন্দ্রিয়রূপী বাঘ-সিংহরা ঘোরাফেরা করছে, কৌশল করে তাদের বন্দী না করতে পারলে তারা তো আমাদের খেয়ে ফেলবে। তাইতো শাস্ত্রে বলেছেন ঃ 'যোগ ঃ কর্মসু কৌশলম্' কর্মের কৌশলই হল যোগ। কৌশল করেই দুর্দান্ত ইন্দ্রিয়গণকে জয় করতে হবে। দেখো ভাই, এই দুর্লভ মনুষ্যজীবন লাভ করে অনেক দিনই তো ইন্দ্রিয়-সেবায় কাটিয়ে দিলে, এখন কিছু আত্মধন সংগ্রহের চেষ্টা করো। ইন্দ্রিয়দের সুখ তো ক্ষণিকের, তা নিয়ে মেতে থাকা বোকামি ছাড়া কিছু নয়। আচ্ছা, রসনা ইন্দ্রিয় তো খুব প্রবল কিন্তু তার সুখের স্থায়িত্ব কতটুকু? খাদ্য মুখে দিলে, আস্বাদ মিলল, কিন্তু যেই গলা থেকে নেমে গেল আর কোনো আস্বাদ নেই, পেটের মধ্যে গিয়ে মল মূত্রে পরিণত হচ্ছে। তাহলে বলো, রসনার ক্ষণিক তৃপ্তির জন্যে মনকে ব্যাকুল করে তোলা উচিত, না মন ব্যকুল হলে তাকে বিচারের দ্বারা দাবিয়ে রাখা উচিত?

বিচার-বুদ্ধিতেই ইন্দ্রিয়-দাসত্ব মোচন হয়। তৃষ্ণার ক্ষয় করা চাই। তৃষ্ণা কিন্তু দিন দিন তরুণ হতে থাকে, 'তৃষ্ণাপি তরুণায়তে'। এর এক সুন্দর দৃষ্টান্ত রয়েছে। সকাল বেলা যখন সূর্য ওঠে তখন মানুষের ছায়া খুব লম্বা হয়ে আগে আগে চলতে থাকে। সেই ছায়াকে ধরবার জন্যে তুমি যতই ছুটবে, ছায়াও ততো সামনের দিকে লম্বা হয়ে আগে বাড়তে থাকবে। মানুষের ছায়ার মতো তৃষ্ণাও আগে বাড়তে থাকে। যতই তুমি তৃষ্ণার পিছনে ছুটবে, তৃষ্ণাও তোমার সামনে প্রভাতের ছায়ার মতো লম্বা হয়ে চলবে। তাই বলা হয়েছে 'তৃষ্ণাপি তরুণঅয়তে'। এ অবস্থায় তোমাকে কী করতে হবে? তৃষ্ণার পিছনে ছুটোনা। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকো। দুপুর বেলা সূর্য যখন ঠিক মাথার উপর আসবে তখন ছায়া তোমার পায়ের তলায় এসে লুটিয়ে পড়বে, অর্থাৎ জ্ঞানরূপী সূর্য মাথার উপরে এলে ছায়ারূপী তৃষ্ণা পায়ের তলায় এসে যাবে। আবার বিকেলবেলা ছায়া যেমন পিছনে সরে যায়, তৃষ্ণারূপী ছায়াও তেমনি তোমাকে ছেড়ে পিছনে চলে যাবে। তাই বলি, তৃষ্ণার পিছনে ছুটো না, বিচারকে সম্বল করে দাঁড়াও, জ্ঞান-সূর্যের আরাধনা করো, জ্ঞান হলে তৃষ্ণা আপনিই চলে যাবে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তুমি বলছ, ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব করাই তোমার স্বভাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। সে কি কথা? এটা তোমার স্বভাবে দাঁড়ায়নি, বলো অভ্যেসে দাঁড়িয়েছে। দেখো ভাই, স্বভাবের কখনো পরিবর্তন হয় না, জলের স্বভাব শীতলতা, জলকে তুমি যতই গরম করো, কিছুক্ষণ পরে তা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। আগুনের যে উষ্ণতা, তা সে কখনো ছাড়ে না, কয়লাকে হাজারবার ধুলেও তার কালো রং ঘুচবে না। ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব করতে করতে তোমার ধারণা জন্মে গিয়েছে যে তোমার স্বভাবই হল ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব করা। স্বভাব নয় ভাই, ওটা তোমার অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে। স্বভাবের তো পরিবর্তন হয় না, পরিবর্তন হয় অভ্যাসের। অভ্যাসের যদি পরিবর্তন না-ই হত, তাহলে এত সাধন-ভজন, এত শাস্ত্র-আলোচনা, এত জ্ঞান-বিচার, সবই যে ব্যর্থ হয়ে যেত। তাই বলছি, ইন্দ্রিয়-দাসত্বটা তোমার স্বভাব নয়, ওটা তোমার অভ্যাস। সাধন করো, ভজন করো, তাহলে এই অভ্যাস হটে যাবে, ছুটে যাবে তুমি ইন্দ্রয়ের দাস নও, ইন্দ্রিয় তোমার দাস, তুমি ভগবানের দাসানুদাস, ইন্দ্রিয়দের তুমি ভগবানের আরাধনায় সেবকের মতো নিযুক্ত করে দাও। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় আর মন, এই একাদশ ইন্দ্রিয়কে তুমি ইষ্টসেবায় লাগিয়ে দাও। তাতেই তুমি শান্ত, শুদ্ধ হয়ে যাবে, তাতেই তুমি ভগবানকে লাভ করবে।

ইন্দ্রিয় দুর্দান্ত, এতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু এদের কৌশল করে জয় করতে হয়। তার মানে এই নয় যে ইন্দ্রিয়দের নষ্ট করে ফেলতে হবে নষ্ট না করে তাদের নিয়মের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখতে হয়, সুনিয়মিত করে আটকে রাখতে হয় এবং তার ফলেই তারা সুসংযত হয়ে যায় এবং শেষে সুসংযুক্ত সুসংন্যস্তও হয়ে যায় অনায়াসে। জ্ঞানী কী করে? জ্ঞানী বিচারের দ্বারা বিষয়ের মধ্যে দোষ দেখিয়ে ইন্দ্রিয়দের নিয়মাবদ্ধ করে রাখে, যোগী যোগের পথে ইন্দ্রিয়দের বশীভূত করে তাদের নিয়মাবদ্ধ রাখে, কর্মী ক্রিয়াকাণ্ডের সহায়তায় ইন্দ্রিয়দের নিয়মাবদ্ধ রাখে আর ভক্ত প্রেমিক ভাগবানের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন ক'রে ইন্দ্রিয়দের নিয়মাবদ্ধ রাখে। এই নিয়ম বা 'নেম' থেকেই জাগে প্রেম।

জ্ঞানী কীভাবে বিষয়ের দোষ দেখায়? মন তো হরদম বিষয়ের দিকে ধাবিত হচ্ছে, রসনা ইন্দ্রিয়টি তো সর্বদাই সুমিষ্ট আহারের দিকে মন টানছে। জ্ঞানী তখন বোঝাতে থাকে, জিভকে তুমি ভোগ্যবস্তু দিয়ে তৃপ্তি দিতে পারবে না। কতক্ষণ তৃপ্তি দেবে তাকে? ভালো ভালো খাদ্যবস্তু তাকে খাওয়াতে পারো, কিন্তু তার স্বাদ থাকে কতক্ষণ? ঐ গলা পর্যন্তই যা স্বাদ, গলা থেকে নেমে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গেলেই তো স্বাদ ফুরিয়ে গেল, তখন পেটের মধ্যে গিয়ে সেই সুখাদ্য দুর্গন্ধ অখাদ্য বিষ্ঠার সৃষ্টি করবে।

এই হল প্রথম বিচার। দ্বিতীয় কথা, ভোগে রোগের ভয়। ভোগ বেশিমাত্রায় হলে রোগের সৃষ্টি করে। দেখো, একটা গাছের পাতা তুমি শুকিয়ে রেখে দাও, তা বহুদিন থাকবে, কিন্তু রসশুদ্ধ রাখতে পারবে না, অল্প সময়েই তা পচে যাবে। তেমনি এই শরীরের ইন্দ্রিয়দেরও বিষয়রস থেকে বাঁচিয়ে শুকনো পাতার মতো রেখে দিতে হয়, তাতে তারা অনেকদিন সুস্থ থাকবে। আর তাদের যদি বিষয়রসের মধ্যে ফেলে রাখো, তাহলে তারা পচে উঠবে ও দ্রুত মরণের দিকে তারা তোমাকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে। অপরূপ সুন্দরী কোনো নারীকে দেখেছো কি অমনি চক্ষু ইন্দ্রিয় মনকে সেদিকে টানতে থাকবে। জ্ঞানী তখন মনকে বোঝাতে থাকবে, সুন্দরী নারীকে দেখে অত মুগ্ধ হচ্ছ কেন? যে এত সুন্দরী, তারও দেহ তো একদিন চিতাভস্মে বিলীন হয়ে যাবে। সুন্দরী নারীর মধ্যে আছেই বা কী? রক্ত, মাংস, হাড়, চামড়া, এগুলোকে তুমি আলাদা আলাদা করে দেখো তো, দেখলে তোমার মনে ঘৃণা জাগবে। প্রতিটি ইন্দ্রিয়দ্বার থেকে এইভাবে বিচার করে জ্ঞানী মনকে বিষয় থেকে ঘুরিয়ে আনে। যোগী চিত্তবৃত্তি নিরোধ ক'রে মনকে দাবিয়ে তাকে নিজের আয়ত্তে নিয়মাবদ্ধ করে রাখে। কর্মী নিজের কর্মকাণ্ডের মধ্যে মনকে একদম ডুবিয়ে রেখে দেয়, মনের আর ইন্দ্রিয়ের দিকে যাবার ফুরসতই মেলে না। প্রেমিক ভক্ত ভগবানের সঙ্গে প্রীতি স্থাপন ক'রে মনকে ইন্দ্রিয়ের কাছে ঘেঁষতে দেয় না।

দেখো ভাই, দুর্দান্ত ইন্দ্রিয়রা প্রেমের কাছে কীভাবে পরাজয় মেনে নেয়। পরামাত্মা অনেক ভেবেচিন্তে সর্ববস্তু সৃজন করেছেন। দেখো, তিনি যেমন আগুনের সৃষ্টি করেছেন, তেমনি তাকে দমন করবার জন্যে জলের সৃষ্টি করেছেন। ক্ষুধা যেমন সৃষ্টি করেছেন, তেমনি সেই ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যে নানারকম সুস্বাদু খাদ্য সৃজন করেছেন। রোগ যেমন সৃষ্টি করেছেন, তেমনি ওষুধের ব্যবস্থা করেছেন।

দুর্দান্ত ইন্দ্রিয়গণ মদমত্ত হাতির মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু তাদের প্রতিহত করবার মতো অঙ্কুশও তো ভগবান সৃষ্টি করেছেন। ঐ অঙ্কুশের ব্যবহার মানুষ জানে না। ইন্দ্রিয় দমনের কথা শুনলেই তারা ভেবে নেয়, ইন্দ্রিয়দের বুঝি উচ্ছেদ করে ফেলতে হবে। না না না, তার কোনো দরকার নেই, ইন্দ্রিয়দের পরমাত্মাদেবের সেবাকার্যে নিযুক্ত করে দাও। ভগবানের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হলেই সেই প্রেমে ইন্দ্রিয়রা আনন্দের সঙ্গে পরাজয় মেনে নেবে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

৩। ভোগের দ্বারাই কি ত্যাগ আসে না?

ভোগ দ্বারা ভোগের তৃষ্ণার নিবারণ হয় না, যেমন আগুন আর কাঠের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। আগুনে যতই ইন্ধন যোগাতে থাকবে, আগুন ততই প্রবল হয়ে উঠবে। আর ইন্ধন না পেলে আপনা থেকেই আগুন নিবে যাবে। ইন্দ্রিয়রূপী আগুন আমাদের মধ্যে জ্বলছে, যতক্ষণ বিষয়রূপী কাঠ তাতে দিতে থাকবে, ততক্ষণ সে প্রবল হয়ে জ্বলবে, কমবে না বিষয় থেকে তুমি নিরস্ত হও, ইন্ধন না পেয়ে আগুন নিবে আসবে, ইন্দ্রিয় আপনা থেকেই দমন হয়ে যাবে। আগুনে ঘৃতাহুতি দেবে, কাঠ দেবে অথচ মনে মনে ভাববে আমার ইন্দ্রিয় অগ্নি নিবে যাক, তা কি কখনো সম্ভব?

তবে হ্যাঁ, ভোগ করেও ত্যাগ আসে। কীভাবে জানো? এক সাধু সাধন-ভজনে মনকে ডুবিয়ে রাখবার জন্যে কঠোর সংযম অভ্যাস করেছেন। কিন্তু তবু ধ্যানে বসলেই তাঁর পায়েস খেতে ইচ্ছে হয়। এই পায়েস খাওয়ার বাসনা সাধু কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারে না। এই একটি মাত্র লোভ জয় করতে না পারায় সাধুর মনে দুঃখের আর অন্ত নেই। একদিন সাধু এক বড়োলোকের বাড়ি ভিক্ষে করতে গিয়েছেন, গৃহস্বামী পরম সমাদরে তাঁকে অপ্যায়ন করে বসালেন। সাধু বললেন তিনি শুধু পরমান্ন খেতে চান, অন্য কোন আহারে তাঁর প্রয়োজন নেই। সাধুর জন্যে প্রচুর পায়েস রান্না করা হল। দেবতাকে ভোগ দিয়ে সাধু পায়েস খেতে বসলেন। খেতে খেতে পেট ভরে গেল, তবু সাধু পায়েস খেয়েই চলেছেন। আকণ্ঠ খেয়েও তিনি নিবৃত্ত হলেন না, খাচ্ছেন আর নিজের মনকে বলছেন ঃ ‘ওরে মন, তুই পায়েস খেতে এমনই ব্যাকুল হয়েছিলি যে আমাকে তুই ধ্যানে পর্যন্ত বসতে দিসনি। আজ চিরজন্মের মতো তোকে পায়েস খাওয়াচ্ছি, দেখি তুই কত পায়েস খেতে পারিস। পায়েস খেতে খেতে সাধুর এবার বমি হয়ে গেল, তবু তিনি খাওয়া বন্ধ করলেন না, সেই অবস্থাতেও আরও পায়েস খেতে লাগলেন। তারপর যখন দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হল, গলা দিয়ে আর এতটুকু পায়েস নামছে না, সাধু তখন পায়েস খাওয়ায় ক্ষান্তি দিলেন। সেইদিন থেকে পায়েসের উপর তাঁর এমন বিতৃষ্ণা জন্মে গেল যে পরে পায়েসের কথা মনে হলেই তাঁর বমি আসত।

দেখো ভাই, এই গল্প থেকেই বুঝতে পারলে, ভোগ করে ত্যাগ কীভাবে হতে পারে। বিবেকী পুরুষ ভোগ করে ত্যাগ করতে পারেন, কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে ভোগ বাসনাকে দমন করাই উচিত।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

৪। ধনদৌলতের অভিমান কীভাবে ত্যাগ করা যায়?

কলকাতায় বরানগর জয় মিত্রের কালিবাড়িতে আমি কিছুদিন ছিলাম। সেইসময় একদিন যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। নিজের কর্তব্য সম্বন্ধে তিনি আমার কাছে উপদেশ চাইলেন। আমি বললাম, তুমি তো রাজা, মস্তবড়ো লোক, লোকে তোমাকে বলে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর। তোমার প্রতি আমার এই উপদেশ যে তুমি রাজা হয়ো না, ম্যানেজার হয়ে যাও। বিচার করে দেখো তো তুমি কার রাজা। তুমি যখন জন্মাওনি, তখনো এই রাজ এস্টেট ছিল, তুমি যখন থাকবে না, তখনো এই এস্টেট থাকবে। তুমি তো দুদিনের জন্যে এখানে রাজা সেজে বসেছ। 'আমি রাজা' এই অভিমান তুমি ছেড়ে দাও। বিচারই সার। তুমি সব সময় বিচার করতে থাকো, তাহলেই তোমার রাজ-অভিমান চলে যাবে, প্রাণে শান্তি পাবে। বিচার ছাড়া শান্তি মেলে না। তুমি ম্যানেজার বনে যাও। ম্যানেজার মন দিয়ে এস্টেটের দেখাশুনো করে, কিন্তু জানে এস্টেট তার নয়, রাজার। 'আমার আমার' করে মানুষ বন্ধনে জড়িয়ে পড়ে। তুমিও আসক্তিশূন্য হয়ে সব কাজ করে যাও, শুধু জেনে রাখো এই রাজ এস্টেট তোমার নয়, মালিকের, ভগবানের, তাহলে তুমিও বন্ধনে জড়িয়ে পড়বে না। তাই তোমাকে ম্যানেজার হওয়ার কথা বললাম।

তুমি তো মস্তবড়ো লোক। একবার বিচার করে দেখো তো কেমন বড়োলোক তুমি। সাড়ে তিন হাতের চেয়ে তো বড় নও। বড়োই যদি হবে তাহলে দশ-বিশ সের ভাত একবার খেয়ে নাও না, দশ-বিশখানা কাপড় একবারে পরে ফেলো, দশ-বিশ হাত জমি জুড়ে শোও তো দেখি। তা যখন পারবে না তখন তুমি বড়ো কিসের? তুমি যা করো গরিবেরাও তাই করে, গরিবরো শাক আর ছাতু খায়, তুমি নাহয় পোলাও খাও, উদ্দেশ্য কিন্তু সেই একই, ক্ষুধা নিবৃত্তি। তুমি শাল-দোশালা গায়ে চড়াও, গরিবেরা কম্বল গায়ে জড়ায়। তোমার দোশালা দামে ভারি। ওদের কম্বল ওজনে ভারি। দুই এর কাজ কিন্তু একই, শীত নিবারণ। গরিব ইচ্ছে করলে তার কম্বল বিছিয়ে শুতে পারে, তোমার দোশালায় সেটি হবে না। তোমারও স্ত্রী আছে, ছেলেপিলে আছে, তুমি আর গরিবের থেকে বেশি কী করলে?

সূর্যদেব গরিব আর আমিরকে সমানভাবে আলো দেন, একই বায়ু গরিব আমিরকে সমান আরাম দেয়, একই জল গরিব আমিরকে সমান তৃপ্তি দেয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তবে আমাকে বলো তো রাজা হয়ে গরিবের চেয়ে কোন্ জিনিসটা তুমি বেশি ভোগ করো? তুমি গাড়িতে চড়ে বেড়াও, কিন্তু গাড়িতে তোমার কোচম্যানের স্থান তোমার উঁচুতে। তাছাড়া কোচম্যান যদি ইচ্ছে করে তাহলে গাড়ি শুদ্ধ তোমাকে খানায় ফেলে দিতে পারে। তাহলে দেখো, রাজা হয়েও তুমি তোমার কোচম্যানের কাছে পরাধীনতা স্বীকার করেছ।

তোমার যারা প্রজা, তারাই তোমাকে মহারাজা বলে। কিন্তু যারা তোমাকে চেনে না তারা তো তোমাকে রাজসম্মান দেবে না। শরীরটা তো তোমার, কিন্তু তার উপর তোমার কোনো অধিকার আছে কি? যদি থাকে, তাহলে শরীরে জরা আসতে দাও কেন? রোগ আসতে দাও কেন? রাজা, তুমি কেমন মহারাজা, কিসের মহারাজা তা একবার বিচার করে দেখো, বিচার করলেই সব বুঝতে পারবে, তখন 'আমার রাজত্ব', 'আমি মহারাজা', তোমার এইসব অভিমান আর থাকবে না।

৫। ক্রোধকে তো সব সময় দমন করা যায় না, তখন কী করা উচিত?

এর তো সুন্দর উপায় বলে দেওয়া হয়েছে, ফোঁস করবে কামড়াবে না। জানো তো এই গল্প? নারদ ঋষি বীণা বাজিয়ে চলেছেন, সাপ ফণা তুলল তাঁকে ছোবল মারবে বলে। নারদ তাকে ক্রোধ দমন করতে বললেন, তারপর তাকে অনেক উপদেশ দিয়ে তার কানে হরিনাম মহামন্ত্র দিলেন। নারদ চলে গেলে সাপ রাস্তার একধারে পড়ে থেকে একমনে হরিনাম জপ করতে লাগল। এদিকে পাড়ার ছেলেরা দেখল রাস্তার ধারে একটা সাপ মরার মতো পড়ে আছে। তাই দেখে কাঠি দিয়ে কেউ তাকে খোঁচা দেয়, কেউ তার ল্যাজ ধরে টানে, তবু সাপ কিছু বলে না দেখে তার তার ল্যাজ ধরে তুলে ঘুরপাক দিয়ে মাটিতে ছুড়ে ফেলতে লাগল, কেউ বা তাকে লক্ষ্য করে ঢ্যালা ছুড়তে লাগল। সাপের দুর্দশার আর অন্ত রইল না। বহুদিন পর নারদ আবার সেই পথ দিয়ে চলেছেন। সাপকে দেখে তিনি বললেন ঃ "হ্যাঁরে, এমন দুর্দশা তোর কেমন করে হল?" সাপ বলল ঃ "আপনি আমাকে ক্রোধ করতে বারণ করেছেন, কাউকে কামড়াতে বারণ করেছেন, তাই ছেলেরা সাহস পেয়ে আমার এই দুর্দশা করেছে।" নারদ শুনে বললেন ঃ "আচ্ছা বোকা তো তুই! তোকে ক্রোধ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করতে বারণ করেছি, কাউকে কামড়াতে বারণ করেছি, কিন্তু ফোঁস ফোঁস করে ভয় দেখাতে তো বারণ করিনি। তুই একবার ফোঁস করলেই তো ছেলেরা ভয়ে পালাত। এবার থেকে তাই করবি, বুঝলি?" সেইদিন থেকে ছেলেরা কাছে এলেই সাপ ফোঁস করে গর্জন করত আর ভয় পেয়ে ছেলেরা ছুটে পালাত। সাপও সেদিন থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে ভগবানের নাম জপ করতে লাগল।

এই গল্প থেকে কী বুঝলে? ক্রোধের বশে কারুর অনিষ্ট কোরো না। নিজের কাজ চালিয়ে নেবার জন্যে যতটুকু দরকার ততটুকু কপট ক্রোধ প্রকাশ কোরো। একেবারে চুপ করে থাকলে তো চলে না, লোকে তাহলে তোমাকে মানবে না। তাই একটু ফোঁস করা দরকার। সেইজন্যই আমার উপদেশ সাপের মতো ফোঁস ফোঁস করবে, কিন্তু কারুর ক্ষতি কোরো না, কাউকে কামড়িয়ো না।

৬। লোভকে জব্দ করা যায় কী ভাবে?

শোনো তবে একটা গল্প বলি। এক তেজস্বী ব্রহ্মচারী রাজার কাছে এসেছেন ভিক্ষা করতে। তাঁর চেহারা দেখে মুগ্ধ হয়ে রাজা তাঁকে তাঁর রাজ্য সমেত সর্বস্ব দান করতে প্রস্তুত হলেন। ব্রহ্মচারী হাতে একটুকরো হাড় ছিল সেই হাড় দেখিয়ে ব্রহ্মচারী বললেন : "মহারাজ, এই হাড়খানার সমান ওজনের কিছু আমাকে ভিক্ষা দিন, তার বেশি আমার আর কিছু চাইনে।" রাজা হেসে বললেন : "এতটুকু হাড়, এর কতই বা ওজন হবে, আপনি বরং আমার কাছ থেকে আরও বেশি কিছু ভিক্ষা গ্রহণ করুন।" ব্রহ্মচারী রাজী হলেন না। তখন দাড়িপাল্লা আনিয়ে একদিকে হাড়খানাকে রাখা হল, কিন্তু কী আশ্চর্য, অন্যদিকে যা কিছু রাখা হয়, কিছুতেই ওজন হাড়ের সমান হয় না, হাড় নিচেই পড়ে থাকে। রাজার রাজকোষ শূন্য হয়ে গেলে, রাজা, মন্ত্রী, সভাসদ সকলে মিলে সেদিকে চড়ে বসলেন, কিন্তু তাতেও ওজন হাড়ের সমান হল না। রাজা তখন হাতজোড় করে বললেন : "হে সিদ্ধপুরুষ, আমি আপনার কাছে হার মানছি। আপনি দয়া করে বলুন কী করে আমার সংকল্প পূর্ণ হবে। কীভাবে ঐ হাড়ের সমান ওজনের জিনিস আপনাকে আমি দিতে পারব।" ব্রহ্মচারী হেসে বললেন : "রাজা সামান্য একটা কাজ করলেই হাড়ের ওজনের জিনিস মিলে যাবে। আপনার রান্নাঘর থেকে খানিকটা ছাই আনতে বলুন।" ছাই এল।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ব্রহ্মচারী সেই ছাই মুঠো মুঠো নিয়ে হাড়ের উপর ছড়িয়ে দিতে হাড়ের দিকের পাল্লা উপরে উঠে গেল। সবাই তো অবাক। রাজা ব্রহ্মচারীর পা জড়িয়ে ধরে বললেন ঃ "প্রভু, এ অলৌকিক কাণ্ডের রহস্য আমাকে বুঝিয়ে দিন।" ব্রহ্মচারী হাসতে হাসতে বললেন ঃ "রাজা, এই হাড়ের নাম লোভী হাড়। লোভ এমনই খারাপ জিনিস যে যত কিছুই তাকে তুমি দাও না কেন, কিছুতেই তার, পেট ভরবে না, বরং যত পাবে ততই লোভ আরও বেড়ে যাবে। লোভের মুখে ছাই দিলে তবেই তার খিদে মিটবে। সেইজন্যই এই লোভী হাড়ের মুখে আমি ছাই ঢেলে দিলাম। লোভকে তুমি যত জিনিস দেবে, ততই লোভ বেড়ে যেতে থাকবে, জিনিস দিয়ে কোনো দিন কেউ লোভকে পূর্ণ করতে পারবে না। রাজা, আমি তোমার কাছে ভিক্ষা নিতে আসিনি, লোভ যে কীরকম খারাপ জিনিস তাই বোঝাব বলেই আমি তোমার কাছে এসেছিলাম।"

দেখো ভাই, কাম, ক্রোধ, লোভ, এই তিনটি হল নরকের দ্বার। এই তিনটির কবল থেকে সর্বদা সাবধানে থাকবে। আবার দেখো, এক জায়গায় লোভ কিন্তু পরাস্ত হয়ে যায়। খাওয়ার ব্যাপারে তুমি যত লোভীই হও না কেন, ঐ একটি জায়গায় তুমি লোভকে পরাস্ত করতে পারবে। পেটে যতটা ধরবে ততটাই তুমি খেতে পারবে, পেট ভরতি হয়ে গেলেই তোমাকে বলতে হবে, না বাবা, আর আমার চাইনে। আবার জোর জবরদস্তি করে যদি খাও তা-ও সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসবে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

লোক-ব্যবহার

১। জাতিভেদ মানা উচিত না অনুচিত

ব্রাহ্ম সমাজের নেতা রাজনারায়ণ বসুর সঙ্গে এই বিষয়ে আমার অনেক কথা হয়েছিল। একদিন তপোবনে এসে তিনি আমাকে প্রশ্ন করেন ঃ "বাবা জাতি বিচার করার উদ্দেশ্য কী?" আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ "বাবু, আপনি জাতি বিচার করেন?" রাজনারায়ণ বাবু বললেন ঃ "মানুষের তৈরির জাতি আমি মানিনে, ঈশ্বর যে জাতি করেছেন আমি সেই জাতি মানি। কামার, কুমোর, মেথর, এসব হল মানুষের তৈরি জাতি, ওসব আমি মানিনে, ভগবানের তৈরি জাতি, যেমন ঘোড়া এক জাতি, গরু এক জাতি বিড়াল এক জাতি, বাঁদর এক জাতি, মানুষ এক জাতি, এসব মানি। আর মানুষের মধ্যে তিন রকম জাতি মানি—স্ত্রী জাতি, পুরুষ জাতি আর ক্লীব জাতি। এ ছাড়া আর কিছু মানিনে।"

আমি বললাম ঃ "বাবু, এতেই সব প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে যাবে। আপনার বাড়িতে মেয়েরা কেউ আছেন? রাজনারায়ণ বাবু বললেন ঃ "হ্যাঁ বাবা, ঘরে আমার মা আছেন, স্ত্রী আছেন, বোন আর নাতনী আছে;" আমি তখন তাঁকে বললাম ঃ "বাবু এত জাতি কোথা থেকে বের করলেন? আপনি তো একই স্ত্রীজাতি মানেন। তাহলে সেই এক স্ত্রী জাতির মধ্যে থেকে আবার আলাদা আলাদা করে মা, বউ বোন আর নাতনী পেলেন কোথায়? দেখুন বাবু এক স্ত্রী জাতি থেকেই আপনি কত জাতি বের করলেন। স্ত্রী জাতির মধ্যে এত রকম এই ভেদ তো ঈশ্বরের করা নয়, এ তো মানুষের করা। ঈশ্বর তো এক স্ত্রী জাতি করেছেন। কিন্তু আপনি সেই স্ত্রী জাতিকে কত ভাগে ভাগ করলেন। আচ্ছা বাবু, আপনি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে যে ব্যবহার করেন, আপনার মা মেয়ে, বোন বা নাতনীর সঙ্গে কি তেমনি ব্যবহার করতে পারেন?"

রাজনারায়ণবাবু একদম চুপ হয়ে গেলেন। পরে বললেন ঃ "না বাবা সকল স্ত্রীলোককে একই দৃষ্টিতে দেখা ঠিক নয়।" তখন আমি বললাম ঃ "বাবু

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যতক্ষণ না আপনার পূর্ণ অভেদ জ্ঞান হচ্ছে, সব এক, এই অদ্বৈত বোধ জন্মাচ্ছে, ততক্ষণ আপনাকে জাতি বিচারে করতেই হবে। আপনি আপনার নিজের ঘরেই এত রকম জাতি নিয়ে বসে আছেন আর বাইরে বলছেন জাতিবিচার মানিনে, এ কেমন কথা? এক পূর্ণ জ্ঞানীর জাতিবিচার থাকে না, আর থাকে না পশুদের। সাধারণ মানুষের পক্ষে জাতিবিচার অনিবার্য, তা থাকতেই হবে। স্ত্রী, কন্যা, মাতা, ভগ্নি এই সব ভেদ-বিচার যখন আছে, তখন আপনি জাতিবিচার রাখতে হবে। আপনার যদি সর্বত্র সমজ্ঞান এসে যায় তো তখন আপনি জাতির বিচার ছেড়ে দিতে পারেন।"

তোমাকেও তাই বলি, যতক্ষণ মানুষের পূর্ণ জ্ঞান না হয় ততক্ষণ জাতিবিচার মেনে নিয়ে ব্যবহারকার্য করে যাওয়া উচিত। দেখো ভাই, আমাকে কেউ কেউ বলে যে আমাদের শাস্ত্রে তো সমদর্শী হওয়ার উপদেশ শাস্ত্র দিয়েছেন। আমি তাদের বলি, হ্যাঁ ঠিক কথা, সমদর্শী হওয়ার উপদেশ শাস্ত্র দিয়েছেন, কিন্তু সমবর্তী হতে তো বলেননি, সকলের সঙ্গে একরকম ব্যবহার করতে তো বলেন নি। তোমরা সবাই সমদর্শী হও। সবাইকে নিজের মতো দেখো, কাউকে কখনো ঘৃণা কোরো না।

২। ধর্মান্তর গ্রহণ বাঞ্ছনীয় নয় কেন?

তপোবনে একদিন দুই পাদরী আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। তারা বলল: "স্বামীজী তুমি আমাদের ধর্মে এসে যাও।" আমি তাদের বললাম: "না সায়েব, আমি তা যাব না।" পাদরীরা বলল: "কেন আসবে না? আমাদের খৃষ্টান ধর্ম খুব ভালো ধর্ম।" আমি বললাম: "হ্যাঁ বাবা যার ধর্ম তা তার কাছে শ্রেষ্ঠ। তোমার ধর্ম তোমার কাছে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু আমার পক্ষে তা শ্রেষ্ঠ হবে না। আবার আমার ধর্ম আমার পক্ষে শ্রেষ্ঠ হলেও তোমার পক্ষে তা শ্রেষ্ঠ হবে না। আমি যুক্তি দিয়ে কথাটা তোমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছি।" এই বলে একটা ছক এঁকে আমি তাদের ব্যাপারটা এইভাবে বোঝালাম।

দেখো, ধর্ম হল একটি বৃত্ত যার কেন্দ্রস্থলে রয়েছেন ভগবান বৃত্তের পরিধির এক এক জায়গায় এক এক ধর্মাবলম্বী মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। এক একটি দাঁড়ি দিয়ে কেন্দ্রের অর্থাৎ ভগবানের সঙ্গে প্রত্যেক ধর্মের মানুষে যোগ রয়েছে। যে ধর্মের মানুষ যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, তারপক্ষে সেখানে থেকেই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নিজের দাঁড়ি ধরে ভগবানের কাছে যাওয়া সবচেয়ে সোজা পথ। কিন্তু কেউ যদি নিজের দাঁড়ি ছেড়ে দিয়ে অন্য কোনো দাঁড়ি ধরে সেখানে যেতে চায় তাহলে তাকে অনেকটা পথ ঘুরে যেতে হবে! এখন আমি যদি তোমার ধর্মে যেতে চাই তাহলে আমাকে কত ঘুরপাক খেতে হবে দেখো। আমি সন্ধ্যা-বন্দনা করি, কত আচার-বিচার নিয়ম পালন করি, এসব আমার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। এখন এইসব অভ্যাসের পরিবর্তে তোমার ধর্মের নিয়ম-কানুন অভ্যাস করতে গেলে আমার কতটা সময় চলে যাবে বলো তো? প্রথমত আমার এখানকার অভ্যাসগুলো আমাকে ভুলতে হবে অর্থাৎ মন থেকে হটিয়ে দিতে হবে, তারপর তোমাদের মতকে আমার মনে গড়ে তুলতে হবে আর এইসব করতে করতেই তো আয়ু আমার খতম হয়ে যাবে। তখন আমার এ কূলও গেল ওকূলও গেল, ভগবান লাভ তা হলে আর আমার কপালে ঘটবে না। তাই আমাদের ধার্মশাস্ত্রে বলে ঃ 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ'।

পাদরী তখন জিজ্ঞাসা করল ঃ "স্বামীজী, তোমাদের ধর্মের বিশেষত্ব কী আমাদের বলো।" আমি বললাম ঃ "বিশেষত্ব তো অনেকই রয়েছে, কত আর তোমাদের বলব। আমাদের ধর্ম-ধনের গুদামে হীরা মোতী সব ঠাসা রয়েছে। তবে আমাদের গুদাম তোমাদের মতো সাজানো-গোছানো নয়। কত হীরা মোতি হয়তো মাটিতেই এখানে-ওখানে ছড়ানো পড়ে রয়েছে। তোমরা কিন্তু তোমাদের দোকানকে খুব সুন্দরভাবে সাজিয়ে রেখেছ, আর সেই সাজগোজ দেখে অনেক হিন্দু ছোকরা নিজেদের ধর্ম ছেড়ে তোমাদের ধর্মে ভিড়ে পড়ছে। নিজেদের ধর্মে যে কত রত্ন ছড়িয়ে রয়েছে, তা তারা দেখতে পায় না। তা দেখো সায়েব, আমার ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব এইখানেই যাতে তোমাদেরও আজ আমার কাছে আসতে হল।"

৩। নিরামিষ আহার শ্রেষ্ঠ কেন?

কীভাবে সত্ত্ববৃত্তি বাড়ানো যায় মানুষকে তা দেখতে হয়। সাত্ত্বিক দ্রব্য আহার করলে, সাত্ত্বিক দ্রব্য ব্যবহার করলে সাত্ত্বিক বৃত্তি বাড়ে। আহারের উপর শরীর আর মনের গতি নির্ভর করে। মাছ খাওয়া ঠিক নয়। মাছ খারাপ যা কিছু পায়, তাই খেয়ে নেয়। মড়া, বিষ্ঠা, পচা, গলা, এইসবের কুৎসিৎ জীবাণু মাছের মধ্যে থাকে। যারা মাছ খায়, মাছের সঙ্গে এইসব অখাদ্য তাদের খেতে হয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মাছ-মাংস খেলে রজ আর তমোভাব বেড়ে যায়। আমিষ আহারীদের মধ্যে রোগও বেশী হতে দেখা যায়। আমি দেখেছি বাংলাদেশে ডাক্তাররা এমন সব কঠিন কঠিন রোগের নাম বলে, যেসব রোগের নাম আমরা কস্মিনকালেও শুনিনি। আমার ধারণা বাঙালি মাছ-মাংস খায় বলে তাদের মধ্যে এত কঠিন রোগ জন্মায়। মাছ মাংস মানুষের উপযোগী খাদ্য নয়। যেসব জানোয়ার মাংসাশী তাদের দাঁতের অগ্রভাগ খুব তীক্ষ্ণ হয়, যেমন সিংহ, বাঘ, বিড়াল, কুকুর ইত্যাদি। যেসব জানোয়ার গাছপালা খায় তাদের দাঁত হয় চ্যাপটা, যেমন গরু, ছাগল, বাঁদর ইত্যাদি। মানুষের দাঁতও কিন্তু এই রকমের। খাওয়ার বাধা-নিষেধ না মেনে মানুষ মাছ মাংস খায়, খেয়ে হজম করতে পারে না আর তার ফলে রোগ ভোগে। কেউ-কেউ আমাকে বলে, মহারাজ, মাছ-মাংস না খেলে মানুষ দুর্বল হয়ে পড়ে। আমি বলি, তা হতেই পারে না, তোমাদের কথা আমি একদম মানব না। হাতি ঘোড়া তো মাংস খায় না, তাদের শক্তি কি কম? পশ্চিমের লোকেরা মাছ-মাংস খায় না, ডাল-রুটি খায়, ওদের মতো শক্তি তুমি কোথায় পাবে?

এক যুবক একদিন আমাকে বলেছিল, বাবা, আমাদের ধর্মশাস্ত্রে বেদে-পুরাণে মাংস খাওয়ার উল্লেখ আছে। মাংস খাওয়া যখন বিধি নয়, তখন ধর্মশাস্ত্রে এর উল্লেখ রয়েছে কেন? আমি তাকে বললাম, দেখো বাপু 'আপত্তিকালে মর্যাদা নাস্তি'। পুরাণে যেসব মাংস খাওয়ার উল্লেখ রয়েছে তার তাৎপর্য হল এই যে বিপদকাল উপস্থিত, অন্য কোনো খাবার মিলছে না, তাই তখন মাংস না খেয়ে উপায় ছিল না। যেমন বিশ্বামিত্র ঋষি কঠোর তপস্যার পরে উঠে দেখলেন যে ইতিমধ্যে বারো বৎসরব্যাপী দুর্ভিক্ষে খাদ্যদ্রব্য সব নষ্ট হয়ে গিয়েছে, খাবার তিনি কিছুই সংগ্রহ করতে পারলেন না। কিন্তু পেটের আগুন তো তা মানবে না, কিছু আহার না পেলে যে প্রাণ যায়। এক ডোম কুকুরের মাংস সেদ্ধ করছিল, তিনি তার কাছ থেকে খানিকটা মাংস চেয়ে নিয়ে আহার করলেন। তবে কি বিশ্বামিত্র ঋষিকে মাংসাহারী বলতে হবে? বৃষ্টি নামলে পর বিশ্বামিত্র আর কুকুরের মাংস গ্রহণ করলেন না, কেশুর মূল সংগ্রহ করে তা সিদ্ধ করে জীবন ধারণ করতে লাগলেন। বিপত্তিকালে বিচার-আচার চলে না। পুরাণে যে মাংস খাওয়ার উল্লেখ রয়েছে তা এইরকম পরিস্থিতির জন্যই।

যারা বলে আহারের সঙ্গে মনের কোনো সম্পর্ক নেই তাদের খানিকটা মাদকদ্রব্য খাইয়ে দিলেই বোঝা যাবে আহারের সঙ্গে মনের সম্বন্ধ কতখানি।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মাদক দ্রব্য খেলে মনের অবস্থা যে কী রকম হয় তা সবাই জানে। এমন হয় কেন? দ্রব্যগুণকে না মেনে উপায় নেই।

৪। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক মানুষের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য কী?

মানুষ হয় তিন শ্রেণীর—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। সাত্ত্বিককে বলা যায় দেবশ্রেণী, রাজসিককে মনুষ্যশ্রেণী আর তামসিককে পশুশ্রেণী। মানুষের মধ্যে তিন শ্রেণী দেখা যায়। যে শরীরে পুণ্য বেশি, পাপ কম, সে শরীর হল দেব শরীর, যে শরীরে পাপ আর পুণ্য সমান, তা হল মনুষ্য শরীর আর যে শরীরে পাপ বেশি, পুণ্য কম, তা হল পশু শরীর। মানুষের মধ্যে এমন সব ভয়ানক জানোয়ারদের দেখা পাওয়া যায়, যারা বাঘ সিংহ বা সাপের চেয়েও হিংস্র। দেবশ্রেণীর মানুষেরা পরস্পর মেলামেশা করতে পারে, মনুষ্যশ্রেণী নিজেদের মধ্যে মিলতে পারে আর পশুশ্রেণীও মিলতে পারে পশুশ্রেণীর সঙ্গে। কিন্তু দেবশ্রেণীর সঙ্গে পশুশ্রেণীর মানুষের মিল হতে পারে না।

সাত্ত্বিক, রাজসিক ব্যক্তিদের আহারের বৈশিষ্ট্যও ভগবান গীতায় নির্দেশ করছেন ঃ

আয়ুঃসত্ত্বলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ।। ১৭/৮।।

যেসব খাদ্যবস্তু আয়ু উদ্যম, বল, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতিবর্ধক, সরস, স্নিগ্ধ ও পুষ্টিকর এবং মনোরম, সেইসব খাদ্য সাত্ত্বিক ব্যক্তিদের প্রিয় হয়।

কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনং।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ।। ১৭/৯।।

যেসব আহার দুঃখ, শোক ও রোগপ্রদ, অতি তিক্ত, অতি অম্ল, অতি লবণাক্ত, অতি উষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ, অতি শুষ্ক এবং অতি প্রদাহকর, সেইসব খাদ্য রাজসিক ব্যক্তিদের প্রিয় হয়।

যাতযামং গতরসং পূতি পর্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসিপ্রেয়ম্।। ১৭/১০।।

মন্দপক্ক, রসহীন, দুর্গন্ধময়, বাসি, উচ্ছিষ্ট ও নিষিদ্ধ অপবিত্র আহার তামসিক ব্যক্তিদের প্রিয়।

গীতায় শ্রীভগবান এইভাবে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক, এই তিন প্রকৃতির মানুষের প্রিয় তিনরকম আলাদা আহারের কথা জানিয়ে দিয়েছেন। সাত্ত্বিক আহার করলে মানুষের শরীরও ভালো থাকে, মনও ভালো থাকে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

৫। দুর্জনের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করা উচিত?

'শঠে শাঠ্যং সমাচারেৎ, শাস্ত্রও তো একথা বলেছেন। শঠের সঙ্গে, বঞ্চকের সঙ্গে শিষ্ট ব্যবহার কখনো করবে না, তাহলে তোমার টাকা আদায় করা মুশকিল হবে। এটর্নীবাবু আমার শিষ্য ব'লে যে তোমার টাকা অন্যায়ভাবে মেরে দেবে, তা চলবে না। দেখো ভাই, তুমি হলে সাত্ত্বিক পুরুষ অর্থাৎ দেবশ্রেণীর মানুষ, তুমি তো আর ভিতর থেকে গরম হতে পারবে না, তবে বাইরে একটু গরম ভাব তোমাকে দেখাতেই হবে। এই বিষয়ে একটা কথা আছে ঃ "হাকিম হোগা গরম কি, দোকানদার হোগা নরম কি, বহু-বেটী হোগা শরম কি।" হাকিম যদি গরম না হয় তবে তাকে কেউ মানবে না, দোকানদার নরম না হলে কেউ তার কাছে জিনিস কিনতে যাবে না, বউ আর মেয়েদের সলজ্জ নরম স্বভাব না হলে মানায় না। দেখো ভাই, এক্ষেত্রে তোমাকে একটু গরম হতেই হবে, তবে ভিতর থেকে নয়, বাইরে। অন্তরে নিবৃত্তি, বাইরে প্রবৃত্তি।

শঠের সঙ্গে তুমি যদি শঠতা না করো তাহলে তাকে দাবিয়ে রাখতে পারবে না। তা না পারলে তার সাহস আরও বেড়ে যাবে আর তার ফলে তার শঠতাও সঙ্গে সঙ্গে আরও বাড়তে থাকবে। কাজেই তোমার এটর্নীকে শায়েস্তা করতে হলে তোমাকেও নিশ্চয়ই শঠতার আশ্রয় নিতে হবে।

৬। ব্যাবসা-বাণিজ্যে মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া কি বাঞ্ছনীয়?

তুমি বলছ মিথ্যা না বললে ব্যবসার উন্নতি হয় না। এক টাকার মাল খদ্দেরকে বলতে হয় পাঁচ সিকেয় কিনেছি, তা নইলে তোমার লাভ হয় না। তুমি জানতে চাইছ এতে তোমার পাপ হয় কিনা। দেখো ভাই, আমি একটা দোঁহাতে তোমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি।

সতীয়া সৎ মৎ ছোড়ীয়ে, সৎ ছোড়ে পথ জায়।
সৎ কী বাঁদী লছমী, ফির মিলেগী আয়।।

দেখো ভাই, এ দোঁহায় কী নিশ্চয় হল? নিশ্চয় হল সত্যবাদী কখনো আপন সত্যকে ছাড়বে না। সত্যের পথ আঁকড়ে ধরে থাকলে আপাতত লক্ষ্মীর দেখা না পেতে পারো, কিন্তু পরে লক্ষ্মীদেবীকে আসতেই হবে, কারণ লক্ষ্মী

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হলেন সত্যদেবের বাঁদী। বাঁদী প্রভুকে ছেড়ে যাবে কোথায়? হয়তো তার আসতে কিছু দেরি হতে পারে, সাময়িক ছেড়েও যেতে পারে, কিন্তু তাকে আসতেই হবে, প্রভুকে ছেড়ে সে থাকতে পারবে না। তুমি সত্যদেবকে ধরে থাকো, সত্যদেবের বাঁদী লক্ষ্মীদেবী ফের আপনি এসে যাবেন। এবার তোমার প্রশ্নের উত্তর মিলল তো?

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নারী

১। মেয়েরাই ধর্মকে বাঁচিয়ে রেখেছে এ কথা কতদূর সত্য?

ধর্মকর্মে মেয়েদের যেমন মতি দেখা যায়, পুরুষদের মধ্যে ততটা দেখা যায় না। সকলের মুখের উপরেই আমি বলে দিই মায়েরাই ধর্মকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। দেখো বাবু, আমি তোমাকে একটা দৃষ্টান্ত দেখাচ্ছি। কোথাও ভগবান সম্বন্ধে কথা হোক বা ভাগবত পাঠ কি কীর্তন হোক, তুমি দেখতে পাবে ওই সভাতে তিনভাগ শ্রোতা মেয়েরা, একভাগ পুরুষ। এর কারণ কী ম্যাজিক, সার্কাস, ফুটবল কিংবা টপ্পা গানের আসরে দেখবে তিনভাগ পুরুষ একভাগ মেয়ে।

এর কারণ হল ভগবানের কথা শুনতে পুরুষদের ভালো লাগে না। সরলমতি মায়েরা ভগবানের কথা শুনিতে সহজেই আগ্রহী হয়ে ওঠে, ধর্মকর্মের ব্যাপারে পুরুষদের চেয়ে তারা অনেক এগিয়ে যায়। তাছাড়া আচার-বিচারের ব্যাপারটাও দেখো। পুরুষ বাইরে থেকে ঘরে এসে কাপড় ছাড়ল না, মায়েরা বললেন ঃ কাপড় না ছাড়লে তোমাকে ঘরে ঢুকতে দেব না। নিজের ইচ্ছে না থাকলেও তাঁদের গঞ্জনার ভয়ে এবং অশান্তি এড়াতে পুরুষকে অগ্যতা কাপড় ছেড়ে ঘরে ঢুকতে হয়। এইভাবে মায়েদের জন্যই এখানো আচার-বিচারটিকে আছে। পুরুষ দীক্ষা নিতে চায় না, ভগবানকে ডাকবার দিকেও তাদের মন নেই, কিন্তু স্ত্রী যখন বলে আমার জন্যে তোমাকে দীক্ষা নিতে হবে, তখন বাধ্য হয়ে তাকেও দীক্ষা নিতে হয়। শাস্ত্রকার সস্ত্রীক দীক্ষা নেবার বিধান দিয়েছেন, তাই স্ত্রীলোক আগ বাড়িয়ে তো দীক্ষা নিতে পারে না, কাজেই পুরুষকে পাকাড়ও ক'রে দীক্ষার জন্যে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়।

দেখো ভাই, নিজের তো ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু স্ত্রীর পাল্লায় পড়ে দীক্ষা নিতে হল। কানে ব্রহ্মমন্ত্র পড়ল, ভগবানকে ডাকবার পথ পেয়ে গেল। স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে দীক্ষা নিল, কিন্তু দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী ভগবানকে ডাকতে শুরু

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করল, কিন্তু পুরুষ এত সহজে ভগবানকে ডাকতে পারে না। তাহলেই প্রশ্ন ওঠে, স্ত্রী ভগবানকে ডাকে, পুরুষ ডাকে না কেন? এর কারণ কী? কারণ হল, মায়েদের হৃদয়ে ভগবানের প্রতি বিশ্বাস খুব সহজেই স্থায়ী হয়ে যায়। গুরু বলে দেন, মা এই রাম ভগবান অথবা শ্রীকৃষ্ণ ভগবান তোমার ইষ্টমূর্তি, আর তোমার ইষ্টমন্ত্র হল 'শ্রীরামচন্দ্র রঘুনাথয় নমঃ 'শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেবায় নমঃ,' এই মন্ত্র জপ করলে তোমার ইষ্টদর্শন হবে।

গুরুদেবের কথা মায়েদের মনে দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত হয়ে বসে যায়, সে ছাপ কখনো আর ওঠে না। পুরুষকেও তো গুরুদেব ওই একই কথাই বলেন, কিন্তু পুরুষের হৃদয় মায়েদের চেয়ে কিছুটা কঠিন, গুরুর কথার ছাপ সেখানে পড়তে দেরি হয়। মায়েদের মতো ভগবানের প্রতি অন্ধবিশ্বাস পুরুষদের হয় না। মায়েরা ঘরের ভিতরেই থাকেন, বাইরের লোকের সঙ্গ বিশেষ পান না। পুরুষদের অনেক রকম লোকের সঙ্গে মেলামেশা করতে হয়। নাস্তিকদের সঙ্গে থেকে থেকে নাস্তিক ভাব আসে, খৃষ্টানদের সঙ্গে মিশে খৃষ্টানভাব আসে। এইজন্য পুরুষদের মধ্যে গুরুদত্ত ধন নষ্ট হয়ে যেতে থাকে, লাখে একজন হয়তো গুরুদত্ত ধন রক্ষা করতে পারে। পুরুষ দু-চার পাতা ইংরেজি বই পড়ে সনাতন হিন্দু ধর্মে আস্থা হারায় আর বলতে থাকে যে ধর্ম-কর্ম বলো দীক্ষা-আদি বলো, ওসবে কোনো লাভ নেই, ওসব হল মনের দুর্বলতা, কুসংস্কার। অতএব ধর্মকর্ম বাদ দাও। মায়েরা কিন্তু সনাতন হিন্দুধর্মকে আজও আগলে ধরে বসে আছেন। তাই আমি সব সময় বলি মায়েরাই ধর্মকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। এ আমার কারুর প্রতি পক্ষপাত করে বলা নয়, যেমন দেখছি, তেমন বলছি।

২। মায়ের স্বভাব শিশুর স্বভাবকে কীভাবে প্রভাবিত করে?

ছেলেমেয়ে যখন খুব ছোট থাকে তখন প্রথমে মায়ের কাছ থেকেই তারা শিক্ষালাভ করে। সেই সময় তারা সর্বদা মায়ের কাছে থাকে বলে মায়ের সঙ্গই পায়। সেইজন্যই মায়ের স্বভাবই বিশেষ করে ছেলেমেয়েদের মধ্যে ফুটে উঠতে দেখা যায়। শাস্ত্রেও এর প্রমাণ মেলে। জননী কয়াধু ছিলেন পরম ভক্তিমতী, তাই তিনি প্রহ্লাদের মতো ভক্ত সন্তান পেয়েছিলেন। পরম ভক্তিমতী বনবাসিনী জননী সুনীতি, তাঁরই ছেলে হলেন ভক্ত ধ্রুব। মাকে ধ্রুব জিজ্ঞাসা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করেছিলেন ঃ 'মা ভগবানকে আমি কি বলে ডাকি?' মা তাঁকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন ডাকতে ঃ কোথায় পদ্মপলাশলোচন হরি।'

ধ্রুব তাঁর মায়ের এই শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। ছেলেবেলায় প্রহ্লাদ মা কয়াধুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ঃ 'মা ভগবান কোথায় থাকেন?' মা বলেছিলেন ঃ ঈশ্বর সর্বব্যাপী বিভু। সব জায়গায়, সকল বস্তুতে ভগবান বিরাজ করছেন।' মায়ের এই কথা প্রহ্লাদের মনে এমন দৃঢ়ভাবে গেঁথে গিয়েছিল যে সেই সুদৃঢ় বিশ্বাসকে প্রমাণ করার জন্যেই ভগবানকে স্তম্ভ ভেদ করে আবির্ভূত হতে হয়েছিল। মায়ের স্বভাব সহজেই সন্তানের স্বভাবে প্রকাশ পায়।

তত্ত্বদর্শিনী পরম জ্ঞানী মা মদালসার ছেলে ছিলেন জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ কাশীরাজ অলর্ক। শিশুপুত্রকে কোলে নিয়ে দোল দিতে দিতে মদালসা বলে যেতেন ঃ

শুদ্ধহসি বুদ্ধোহসি নিরঞ্জনোহসি
ত্বং মায়ামোহৈঃ পরিবর্জিতোহসি।
সংসারস্বপ্নং ত্যজ মোহনিদ্রাং
মদালসা বাক্যমুবাচ পুত্রম্।।

হে পুত্র, মদালসার কথা তুমি শোনো, তুমি শুদ্ধ, বুদ্ধ, নিরঞ্জন। মায়া-মোহ-বর্জিত তুমি। সংসার স্বপ্নবৎ, এই সংসারের মোহনিদ্রা তুমি ত্যাগ করো।

দেখো ভাই, পরম জ্ঞানের এই বাণী শিশুকাল থেকে যদি মায়ের মুখ থেকে শুনতে থাকে, তাহলে সে ছেলেও যে পরম জ্ঞানী হয়ে উঠবে তাতে কি আর কোনো সন্দেহ আছে?

৩। স্ত্রীর কাছে গুরু বড়ো, না স্বামী বড়ো?

এ বিষয়ে একটি দোঁহা আছে ঃ
গুরু গোবিন্দ সামনে খাড়া
কিসকো লাগে পায়।
বলিহারি—বলিহারি গুরু তুহারী
জো গোবিন্দ চিনায় দেয়।।

গুরু আর গোবিন্দ দুজনেই আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, তবে আগে কাকে প্রণাম করব? এঁদের মধ্যে কে বড়ো? গোবিন্দ বড়ো ঠিকই, তবে এক্ষেত্রে গুরুদেবকেই আমি বড়ো বলে মানব, কারণ গুরুদেবই তো আমাকে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গোবিন্দদেবকে চিনিয়ে দিয়েছেন, নইলে গোবিন্দকে চিনতাম কী করে? তাই হে গুরু! তোমারই বলিহারি, তোমারই বলিহারি।

দেখো মা, তোমার স্বামীই তোমাকে আমার কাছে নিয়ে এসেছেন, আমিই যে তোমাদের গুরুদেব তা তিনিই তোমাকে বলে দিয়েছেন, আর বলেছেন আমার উপদেশ শুনলে তোমাদের কল্যাণ হবে। তাইতো তুমি আমাকে গুরুদেব বলে চিনতে পারলে। স্বামী হল স্ত্রীর পরম দেবতা, আর যত দেবতা সবই স্বামীর নীচে। আমাকে প্রণাম করবার আগে তোমাকে তাই বললাম, আগে তোমার পতিদেবতাকে প্রণাম করো, তাতে তুমি লজ্জা পেলে। দেখো মা, তোমাদের এই হালচাল আমার ভালো লাগে না। স্ত্রীর মনে এই ভাব থাকা চাই যে পতিদেব নারায়ণ।

৪। শংকরাচার্য মেয়েদের পিশাচিনী বলেছেন কেন?

ভগবান শঙ্করাচার্য মণিরত্নমালায় মেয়েদের যে পিশাচিনী বলেছেন তা নিয়ে তুমি দুঃখ কোরো না, মা। সকলের জন্য তিনি ওকথা বলেন নি। যে সব সাধক নারী জাতিকে মাতৃচক্ষে দেখতে শেখেনি, তাদের মনে বৈরাগ্যের উদয়ের জন্যই তিনি নারীকে পিশাচিনী বলেছেন। নইলে সকল নারীকে পিশাচিনী বলা কখনোই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। নারী সম্বন্ধে দু'ধরনের দুটি দোঁহা আছে, শোনো। একদল বলছে ঃ

নাগন সে নারী বুরী, তিন ঠোর সে খায়।
ধন ঘটে, যৌবন হটে, মরে নরক লে যায়।।

অর্থাৎ নাগিনীর চেয়েও নারী অধম, কারণ সাপ মাত্র এক জায়গায় কামড়ায়। কিন্তু নারী কামড়ায় তিন জায়গায়, নারী ধন নাশ করে, যৌবন নাশ করে আর মৃত্যুর পর নরকে পাঠিয়ে দেয়।

আর একদল প্রতিবাদ করে বলছে ঃ
নারীনিন্দা মৎ কর, নারী নর কী খান।
নারী সে নর হোতা হ্যায় ধ্রুব প্রহ্লাদ সমান।।

অর্থাৎ নারীর নিন্দা করো না কারণ নারী নরের খনি, নারীর গর্ভেই ধ্রুব প্রহ্লাদের মতো নরশ্রেষ্ঠগণের জন্ম হয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সংসার

১। জ্ঞানীরা সংসারকে কীভাবে দেখে থাকেন?

সংসারঃ স্বপ্নতুল্যোহি রাগদ্বেষসমাকুলঃ।
অবোধ সত্যবৎ ভাতি প্রবোধেহসত্যবৎ ভবেৎ।।

এই সংসার স্বপ্নতুল্য, মানুষ যেন ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে। বাস্তব বস্তু সেখানে কিছুই নেই, মিথ্যাকেই সত্য বলে বোধ হচ্ছে। এই সংসার অনুরাগ আর বিদ্বেষে ভরা, অনুকূল কাজে সবারই অনুরাগ হয় আর প্রতিকূল কাজে সবারই বিদ্বেষ জাগে। ঘুমন্ত অবস্থায় রাজা দেখে সে কাঙাল হয়ে গিয়েছে আর কাঙাল দেখে সে রাজা হয়েছে। স্বপ্ন যেমন মিথ্যা, এই সংসারও তেমনি মিথ্যা।

কিন্তু 'অবোধ সত্যবৎ ভাতি,' যতক্ষণ ঘুম না ভাঙে, বোধ না জাগে, সংসার সত্য বলে বোধ হয়। সকালবেলা যখন নিদ্রাভঙ্গ হল তখন বোধ জন্মাল যে আমি ঘুমের ঘোরে এক মিথ্যা স্বপ্ন দেখছিলাম। ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্ন ছুটে গেল, স্বপ্নের সুখ-দুঃখও সব চলে গেল, আমি বাস্তবে ফিরে এলাম। কিন্তু এই স্বপ্নসংসার তো ভাঙে না। কাল রাতে আমি যে স্বপ্ন দেখছিলাম, সেই স্বপ্ন এখন আমি দেখছিনে বটে, কিন্তু কালকে আমি এই যেসব বাড়ি-ঘর মানুষ দেখেছি, আজকেও সেই সমস্তই তো ঠিক তেমনি দেখতে পাচ্ছি। তাহলে সংসারকে স্বপ্ন বলব কেমন করে? সেইজন্যই সংসারকে বলা হয় দীর্ঘ স্বপ্ন।

'প্রবোধেহসত্যবৎ ভবেৎ'—একমাত্র প্রবোধ অর্থাৎ জ্ঞানলাভ করলে সংসারের সত্যাসত্য নির্ণয় হয়ে যায়। যতক্ষণ না জ্ঞানলাভ হচ্ছে ততক্ষণ সংসারকে সত্য বলেই মনে হয়। জ্ঞানলাভ হলে দেখবে, যাকে তুমি সত্য ভেবেছিলে তা মিথ্যা হয়ে গিয়েছে। তখন বুঝতে পারবে যে সংসার সত্যই স্বপ্নতুল্য, দীর্ঘ এক স্বপ্ন মাত্র। জ্ঞান হলে এ স্বপ্ন টুটে যায়।

জ্ঞানীরা সংসারকে নানাভাবে দেখে থাকেন। প্রথমত জ্ঞানী বললেন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সংসারের বাস্তব কোনো অস্তিত্ব নেই। সবই স্বপ্ন, মিথ্যা। এবার জ্ঞানী বললেন সংসার 'পাগলা গারদ'। কেন? একবার চেয়ে দেখো মানুষের কাণ্ডকারখানা। কখনো পাগলের মতো হাসছে, কখনো কাঁদছে, কখনো কারুর সঙ্গে বন্ধুর মতো গালাগালি করছে, পর মুহূর্তেই তার সঙ্গে ঝগড়া-মারামারি শুরু করে দিল, কারুর খুব আনন্দ হয়েছে, সেই আনন্দের আতিশয্যে একেবারে নাচতে শুরু করে দিল, হঠাৎ শুনল তার ছেলে মরে গিয়েছে, ব্যস্, সঙ্গে সঙ্গে ধূলোয় গড়াগড়ি দিয়ে বুক চাপড়ে কাঁদতে লেগে গেল। দেখো ভাই, দূরে দাঁড়িয়ে এই সংসারের কাণ্ডকারখানা যদি দেখতে পারো, তাহলেই বুঝবে মানুষ কেমন পাগলের মতো ব্যবহার করে চলেছে। সেইজন্যই সংসার হল পাগলা গারদ।

সংসার হল 'নাট্যশালা'। কীভাবে? দেখো, যখন অভিনয় চলতে থাকে তখন অভিনেতা-অভিনেত্রীরা রংচং মেখে সেজগুজে রঙ্গমঞ্চে এসে দেখা দেয়। যার পালা যখন শেষ হয়, সে তখন সাজগোজ ফেলে, বেশ বদল ক'রে নিজের প্রকৃত রূপ নিয়ে ঘরে ফিরে যায়। আমরাও এই সংসাররূপী রঙ্গমঞ্চে থিয়েটার করতে এসেছি। আমরা কারুর পিতা সাজছি, কারুর সাজছি পুত্র, কারুর পতি, কত রকম সংই না সাজতে হচ্ছে আমাদের। যেই পালা শেষ হয়ে গেল অমনি সাজ খুলে ফেলে, বেশ বদল করে ঘরে ফিরে যাই, তখন কোথায় রইল পতি, কোথায় পিতা আর পুত্র, কেউ কোথাও নেই। থিয়েটারেও দেখো কেউ রাজা সাজছে, কেউ সাজছে মন্ত্রী, কেউ শত্রু, কেউ বা মিত্র, কিন্তু পালা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাজ-পোশাক ফেলে যে যার ঘরে চলে গেল, তখন আর কোথাও কিছু রইল না। সেই জন্যেই সংসারকে বলা হয় নাট্যশালা।

সংসার 'জেলখানা'। দেখো, জেলখানায় কয়েদীদের থাকবার জন্যে একটা করে ঘর মেলে। মেয়াদ শেষ হলেই তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। আমাদেরও সংসারের কয়েদখানায় এই দেহরূপী এক একটা ঘর মিলেছে, মেয়াদ যতদিন আছে ততদিন এখানে আবদ্ধ থাকতে হবে, মেয়াদ ফুরোলেই এই দেহরূপী ঘর ছেড়ে নিজের ঘরে চলে যেতে হবে। দেখো ভাই, বিচারবুদ্ধি দিয়ে দেখলে ঠিক বুঝতে পারবে এই সংসার সত্যিই জেলখানা। আমরা এই জেলে এক-একটা কুঠরিতে পড়ে রয়েছি, মেয়াদ পূর্ণ হলে নিজের জায়গায় চলে যাব। তাই বলা হয় সংসার জেলখানা।

তারপর বলা হচ্ছে সংসার 'বাজার'। সংসারকে বাজার বলা হয় কেন? মানুষ যেমন বাজারে বেচা-কেনা করতে আসে, আমরাও তেমনি এই সংসারে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বেচা-কেনা করতে এসেছি। যার বেচা-কেনা শেষ হয়ে যাবে, সে আর বাজারে থাকবে না, বাজার ছেড়ে নিজের ঘরে চলে যাবে আপন আপন কর্মফলের সওদা নিয়ে।

২। সংসারে থেকে কি ধর্মলাভ হয় না?

নিশ্চয় হবে, কেন হবে না? তিন আশ্রমকে প্রতি পালন করে গৃহস্থ আশ্রম। দেখো ব্রহ্মচর্য আশ্রম, বানপ্রস্থ আশ্রম আর সন্ন্যাস আশ্রম, এই তিন আশ্রমে যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা তো রোজগার কিছু করেন না। তাঁদের খাওয়া-দাওয়া চলে কীভাবে? তাদের খাওয়া-পরার দায়-দায়িত্ব সবকিছু গৃহস্থ আশ্রমই বহন করে। এইজন্যই এই তিন আশ্রমের পূণ্যের কিছু কিছু অংশ গৃহীদের আপনা থেকেই মিলে যায়। এই গেল এক কথা। তারপর দেখো, যেকোনো আশ্রমের মানুষই হোক না কেন তাতে কিছু আসে যায় না, আসল কথা হল, ভগবানকে জানা বা ভালবাসা। ভগবানেক যে ভালবাসতে পারে, সে-ই হল ধার্মিক, সে জ্ঞানী হোক, যোগী হোক, কর্মী হোক আর ভক্তই হোক। সে বানপ্রস্থ আশ্রমের লোক হতে পারে, ব্রহ্মচর্য আশ্রমের লোক হতে পারে, সন্ন্যাস আশ্রম বা গৃহস্থ আশ্রমের লোকও হতে পারে। দেখো ভাই, সব ধর্মের সার ধর্ম হল ভগবানের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করা।

৩। সংসারীর পক্ষে ভগবানের নাম নেবার সময় কোথায়?

কত লোক আমাকে এসে বলে ঃ বাবা, জপ কখন করব বলুন, আমাকে রোজগারের ধান্দায় ঘুরতে হয়, জপ করবার এতটুকুও সময় পাইনে। কেউ বলে, আমাকে ব্যবসা করতে হয়, তাই এতটুকুও সময় পাইনে। কেউ বলে, ছেলেপিলেদের পিছনেই সব সময়টা চলে যায়, ভগবানের নাম কখন করব বলুন? আমি বলি দেখো, তোমরা যে যা কাজ করছ করো, তাতে ভগবানের নাম নেবার কোনো বাধা হবে না। তুমি যদি মুখে মিছিরির একটা টুকরো রেখে দাও আর হাত পা দিয়ে যতরকম কাজ করতে থাকো, তাহলে একই সংগে তোমার কাজও হবে আর মিছরির স্বাদও তুমি গ্রহণ করতে পারবে। মুখে মিছিরির টুকরো থাকলে তোমার কাজে তো কোনো ব্যাঘাত ঘটবে না। তেমনি মুখে যদি নাম-রস আস্বাদন করো আর হাত পা দিয়ে সমস্ত কাজকর্ম করো,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাতে তো কোনো বাধা নেই। তবে প্রথমে চাই অভ্যাস, একবার অভ্যাস হয়ে গেলে তখন সহজ হয়ে যাবে। 'মুখমে নাম কর্‌না, হাথমে কাম কর্‌না।'

যারা বাঁশবাজির খেলা বা দড়ির খেলা দেখায় তাদের কীভাবে অভ্যাস করতে হয় দেখো। পায়ে তার শিং বাঁধা, সেই নিয়ে বাঁশেতে বাঁধা দড়ির উপর দিয়ে হাঁটছে, মাথায় রয়েছে ঘড়া, হাতে বাঁশ, নিচে ঢোল বাজছে, সেই ঢোলের তালে তালে সে তাল দিয়ে চলেছে। একবার ভেবে দেখো তো এই খেলা দেখবার সময় সেই বাজিকরের মন কোথায় থাকে? মনের গতিকে সে সবদিকে সমানভাবে ভাগ করে দেয়, তার জন্যে কী অভ্যাসটাই না তাকে করতে হয়েছে। একদিকে মনের ঝোঁক বেশি দিলে অন্যদিকে কম পড়ে যাবে আর তাহলেই তাকে মুখ থুবড়ে পড়তে হবে। বাজিকর এক সঙ্গে কত কাজ করে চলেছে, কোথাও তার এতটুকু বাধছে না। তবে সংসারের কাজেও বাজিকরের মতো অভ্যাস করা চাই। সংসারের সব কাজই করে যাও আর ভগবানকে স্মরণ করতে থাকো। অভ্যাস ছাড়া এটি কিন্তু হবে না। বাজিকরকেও ছেলেবেলা থেকে এসব অভ্যাস করতে হয়েছে। অভ্যাস করলেই সব সুগম হয়ে যায়।

একজন ভক্ত একদিন বলল, মহারাজ, আমরা সংসারী মানুষ, বিষয়ে ডুবে আছি, মীরাবাঈয়ের মতো সর্বদা হরিনাম নিয়ে ডুবে থাকতে পারিনে, তবে আর আমাদের প্রতি ভগবানের কৃপা হবে কেমন করে? আমি তখন তাকে নারদের তেলের বাটির গল্পটি শুনিয়ে দিলাম।

নারদ ঋষির মনে অহংকার হয়েছে যে তাঁর মতো ভগবানের ভক্ত আর কেউ নেই। এই গর্ব নিয়ে বীণা বাজিয়ে হরিগুণ গান করতে করতে গোলকধামে গিয়ে ভগবানকে প্রণাম করলেন। অন্তর্যামী ভগবান কিন্তু নারদের মনের ভাব টের পেয়েছেন। তিনি নারদকে আশীর্বাদ করলেন, কিন্তু তাঁর সঙ্গে কোনো কথা বললেন না। নারদ বললেন ঃ "প্রভু, এতদিন বাদে আপনাকে দর্শন করতে এলাম, আপনি আমার সঙ্গে কোনো কথা কইলেন না, কী এর কারণ জানতে ইচ্ছে হয়।" ভগবান বললেন ঃ 'এক ভক্তিমতী নারী রয়েছে মর্ত্যলোকে, আমার অতবড়ো ভক্ত আর কেউ নেই, তাকে দেখবার জন্যে আমার মনটা উতলা হয়েছে, তাই আমি একটু আনমনা ছিলাম।" ভগবানের মুখে তাঁর ভক্তের কথা শুনে নারদেরও সেই ভক্তিমতীকে দেখবার ইচ্ছে হল। তখন ভগবান আর নারদ মর্ত্যলোকে এসে পল্লীগ্রামের এক চাষার বাড়িতে অদৃশ্যভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। ঘর-সংসারের নানা কাজে চাষার বউ ভয়ানক ব্যস্ত, অন্য কোনো দিকে মন দেবার তার এতটুকু অবসর নেই। চাষার বউকে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দেখিয়ে ভগবান নারদকে বললেন ঃ "এই মেয়েটির কথাই তোমাকে বলছিলাম। এর মতো ভক্ত আমার আর কেউ নেই।" নারদ তো অবাক। এ যে ঘোর সংসারী, ভগবানকে যে একবারও স্মরণ করবে সে ফুসরৎ তার কোথায়? ভগবান আর নারদ দাঁড়িয়েই রয়েছেন। সারাদিন কেটে গেল, চাষার বউয়ের সংসারের কাজ আর শেষ হয় না। গভীর রাতে যখন সকল কাজ মিটল্ তখন সে খাটিয়াতে স্বামীর পাশে শুয়ে স্বামীকে বলল ঃ "একবার প্রেমের সঙ্গে বলো শ্রী হরি শ্রী হরি শ্রী হরি।" এই বলে চাষার বউ ঘুমিয়ে পড়ল।

নারদ হাসতে হাসতে বললেন ঃ "প্রভু একেই আপনি পরম ভক্ত বলছেন, অথচ আমি তো এর মধ্যে ভক্তির কোনো লক্ষণই দেখলাম না। সারা দিনরাতে বউটি মাত্র তিনবার আপনার নাম নিল আর তাতেই আপনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন!" শ্রীকৃষ্ণ বললেন ঃ "নারদ তুমি আগে আমার একটা কাজ করো দেখি। তোমাকে আমি এক বাটি ভর্তি সরষের তেল দিচ্ছি, এই তেলের বাটি নিয়ে তুমি স্বর্গ, মর্ত্য আর পাতাল ঘুরে তাড়াতাড়ি আমার কাছে ফিরে এসো। কিন্তু সাবধান, এক ফোঁটা তেল যেন মাটিতে না পড়ে। তুমি ফিরে এলে তোমাকে আমি বুঝিয়ে দেব চাষার বউটি আমার কেমন ভক্ত।"

তেল ভর্তি বাটি নিয়ে নারদ তো স্বর্গ, মর্ত পাতাল ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তাড়াতাড়ি হাঁটলে তেল মাটিতে পড়ে যাবে, এদিকে প্রভু বলে দিয়েছেন তেল পড়লে চলবে না, অথচ তাড়াতাড়ি ফিরেও আসতে হবে। যাইহোক, বহুদিন পর তো নারদ তেলের বাটি নিয়ে ফিরলেন এবং জানালেন কী কষ্ট করেই না তাঁকে সমস্ত পথটা অতিক্রম করতে হয়েছে যাতে এক ফোঁটা তেল মাটিতে না পড়ে। এবার নারদ জানতে চাইলেন কৃষকের বউয়ের কথা, তার ভক্তিতে ভগবান এমনকী দেখলেন যাতে তিনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন? শ্রীকৃষ্ণ হেসে বললেন ঃ "নারদ, তুমি তো সব সময় বীণা বাজিয়ে আমার নামগুণগান করো। আচ্ছা বলো তো, এই যে তেলের বাটি নিয়ে তুমি ত্রিভুবন ঘুরে এলে, তার মধ্যে কতবার আমার নাম নিয়েছ?' নারদ বললেন ঃ "একফোঁটা তেল যাতে মাটিতে না পড়ে সেদিকেই তো আমার সমস্ত মনটা নিযুক্ত রেখেছিলাম, তাই একবারও আপনার নাম নেবার কথা মনে হয়নি।"

ভগবান তখন বললেন ঃ "নারদ যাদের আমি এই সংসাররূপী তেলভর্তি পূর্ণপাত্র দেই, তারা যদি সংসার বজায় রেখে অন্তত একবারও আমাকে স্মরণ করে, সেই ডাকে আমি মুগ্ধ হয়ে যাই। এত কাজ তাদের করতে হয়, তবু তারা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

একবারের জন্য হলেও আমাকে ডাকতে ভোলে না। দেখো নারদ, তুমি সব কাজ ছেড়ে দিনরাত আমাকে ডাকছ, এতে আর বাহাদুরির কী আছে? সংসারের সকল কাজ সামলে যে লোক অন্ততঃ একবারও ভক্তিভরে আমাকে স্মরণ করে, তার সেই প্রেম, সেই ভক্তির তুলনা হয়?"

দেখো ভাই, তোমরা সংসারী, তোমাদের ভাবনা কিসের? সাধু-সন্ন্যাসীরা দিনরাত ভগবানকে ডাকবে, গৃহস্থরা তাদের সুযোগ সুবিধে মতো ডাকবে দু-জনের ডাকে কোনো তফাৎ নেই। ভাবগ্রাহী জনার্দন, তিনি ভাবকে গ্রহণ করেন, বস্তুকে দেখেন না। তোমার যদি ভক্তি থাকে, নিশ্চয়ই তিনি তা গ্রহণ করবেন।

৪। সংসার নির্লিপ্ত হয়ে কীভাবে কাজ করতে হয়?

দেখো ভাই, তুমি হলে উত্তম অধিকারী। উত্তম অধিকারী ইঙ্গিতমাত্রেই উত্তর বুঝে নেয়। তোমাকে আমি একটা কথা বলছি ঃ তুম্ ম্যানেজার বন্ জাও। পরমাত্মাদেব মালিক, তুমি তাঁর ম্যানেজার। মালিক তোমার হাতে এস্টেট দিয়েছেন, ওই এস্টেট তুমি যত্ন করে চালাবে। এস্টেট অর্থাৎ স্ত্রী-পুত্র, ধন-দৌলত যা কিছু আছে, এমন কি তোমার শরীর পর্যন্ত সবকিছুই হল ভগবানের। একেবারে মর্মে মর্মে বুঝে নিয়ো, যা-কিছু আমার মিলেছে তার কিছুই আমার নয়।, সবই হল মালিকের। আমি তাঁর ম্যানেজার, আমার মাইনে হল ক্ষুধা নিবারণের জন্য পোয়াটেক অন্ন, থাকবার জন্যে সাড়ে তিন হাত জায়গা, শীত নিবারণের জন্যে গায়ে দেবার কাপড়, এর বেশি তোমায় দিলেও তুমি নিতে পারবে না। কী ভাই, এখন বলো তো তুমি ম্যানেজার হবে, না মালিক হবে?

দেখো ভাই, তুমি গৃহস্থ মানুষ, তোমাকে কতরকম কর্তব্য পালন করতে হয়। যা-কিছু করো না কেন, ভগবানকে স্মরণ করে কোরো। ইষ্টদেবের উপর মনের লক্ষ্য স্থির রেখে যে কাজই করবে, সমস্ত কাজই ভগবানের চরণকমলের সেবায় পরিণত হবে। মনকে কীভাবে রাখতে হবে? কম্পাসের কাঁটা যেমন সর্বদা উত্তর দিকে থাকে, পূর্ব, পশ্চিমে বা দক্ষিণে দিকে কখনো থাকে না, মনের গতিকেও তেমনি কম্পাসের কাঁটার মতো শুধু ভগবানের দিকে স্থির রেখে দাও। সংসারের দিকে তাকে যেতে দিয়ো না। সংসারের সব কাজ করে যাও, কিন্তু মন যেন ভগবানের চরণে লেগে থাকে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

৫। সংসারীদের পক্ষে কথার সংযমের উপর এত জোর দেওয়া হয় কেন?

তোমারা গৃহস্থ, কথা বলবার সময় তোমাদের খুব হুঁশিয়ার হতে হবে। মুখ থেকে যে কথা একবার বেরিয়ে যায় তা তো আর ফিরে আসে না, তাই কথা বলবার আগে ভেবেচিন্তে ভালো করে বিচার করে কথা বলতে হয়।

দেখো ভাই, সাধনতত্ত্ব তো গোপন রাখতেই হয়। ব্যবহার জগতেও কোনো কোনো কথা গোপন রাখবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আয়ুর্বিত্তং গৃহচ্ছিদ্রং মন্ত্রমৈথুনভেষজম্।
দানাপামানমানঞ্চ নব গোপ্যানি যত্নতঃ।।

এই নয়টি জিনিষ গোপন রাখা উচিত। আয়ুর কথা কাউকে বলবে না, তোমার কত টাকাকড়ি আছে তা-ও কাউকে জানাবে না, ঘরের কেচ্ছা বা অশান্তির কথা যেন বাইরে প্রকাশ কোরো না, গুরুর কাছে মন্ত্র নিয়েছ তা গোপন রাখবে, মৈথুন সম্বন্ধে নীরব থাকবে, ওষুধের কথা রোগীর কাছে বলবে না। ওষুধের কথা যদি রোগীকে জানিয়ে দাও সে ভাবতে পারে, ও হরি, এই জিনিস দিয়েছে, এতে আমার রোগ সারবে কী করে? তাই রোগীর কাছে ওষুধের কথা জানানো উচিত নয়। দানের কথা গোপন রাখাই হল বিধি, ডান হাতের দান বাঁ হাত যেন টের না পায়। কেউ তোমাকে অপমান করলে তা গোপন রেখো নইলে লোকে জানতে পারলে তোমাকে হেয় জ্ঞান করবে। লোকের কাছে তোমার মান বাড়লে তা নিয়ে বলে বেড়িয়ো না। যদি বলে বেড়াও, তাতে তোমার প্রতি লোকের ঈর্ষা বাড়তে পারে। তাই নয়টি জিনিস সম্বন্ধে নীরবতা অবলম্বন করবে, কোনো কথা বলবে না। কথার সংযম তাই বিশেষভাবেই পালন করতে হবে সংসারীদের।

৬। সংসারের রঙ্গ দেখে যমরাজ, পৃথিবী আর লক্ষ্মী হাসেন কখন?

যমরাজ বৈদ্যকে দেখে হাসেন। বৈদ্য রোগীকে বাঁচাবার জন্যে কত চেষ্টাই না করে, যেন কিছুতেই তাকে মরতে দেবে না, ওষুধ খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখবে। তাই দেখে যমরাজ হাসেন আর ভাবেন, মূর্খ বৈদ্য জানে না যে তার রোগীর ঘাড় আমি চেপে ধরেছি, তার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে আর আমি যমরাজ এই বৈদ্যেরও ঘাড় ধরে একদিন নিয়ে যাব।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পৃথিবী হাসেন রাজাকে দেখে। রাজা গর্ব করে ভাবছে আমি পৃথিবী-পতি, পৃথিবীর অধীশ্বর আমি। রাজার এই গর্ব দেখে পৃথিবী হাসেন, আরে রাজা কিসের অভিমান করছ তুমি? তোমার মতো কতো রাজাই তো 'আমি রাজা আমার রাজত্ব' বলে অভিমান করে গিয়েছে, তারা সব এখন কোথায়? সবাইকে আমি শেষ করেছি। রাম—রাবণের মতো সব রাজাকেই আমি শেষ করেছি। তোমারও একদিন সেই দশা হবে, তোমারও কোথাও পাত্তা পাওয়া যাবে না।

লক্ষ্মী হাসেন কৃপণকে দেখে। কৃপণ ভাবে আমার ধনদৌলত কিছুই আমি খরচ করব না, সব পুঁজি করে রেখে দেব। কত তালা চাবি দিয়ে আট-ঘাট বেঁধে সিন্দুকে টাকা ভরতি করে রেখে দেয়। তাই দেখে লক্ষ্মী হাসেন আর ভাবেন, আরে কৃপণ যতই তুমি আমাকে তালাচাবি দিয়ে আটকাও না কেন, আমি যখন চলে যাব তখন কোন্ রাস্তা দিয়ে যাব তা তুমি জানতেও পারবে না। আমাকে কি তুমি তালা চাবি দিয়ে আটকে রাখতে পারবে?

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দান

১। উপার্জনের টাকার সদ্ব্যবহার কেমন করে করতে হয়?

উপার্জনের টাকা খরচ করবার একটা নিয়ম আছে। খাওয়া-পরার জন্যে আট আনা খরচ করবে, চার আনা অসময়ের জন্যে রেখে দেবে আর বাকি চার আনা দান করবে। এই দান বড়ো ব্যাঙ্কে বদান্যতার পুণ্যফলরূপে তোমার পুঁজি হয়ে থাকবে, পরের জন্মে তুমি তা পাবে। তুমি যে এখন আপিসে এত টাকা রোজগার করছ তার কারণ আগের জন্মে অনেক পুণ্য করেছিলে, তার ফল বড়ো ব্যাঙ্কে তোমার পুঁজি হয়ে রয়েছে, তা না হলে সবাই তো তোমার মতো রোজগার করতে পারত। তাতো হয় না, যার পুঁজি আছে তারই কোনো না কোনো প্রকারে টাকা মিলে যায়। দেখো ভাই, আগের জন্মের পুঁজি থেকে এখন তোমার সবকিছু মিলে যাচ্ছে, কিন্তু এই জন্মে আবার কিছু পুঁজি বাড়াবার চেষ্টা করো, দান করে পুণ্য অর্জন করো, পুঁজি বাড়াও, নইলে পরজন্মে তোমাকে কষ্টে পড়তে হবে।

২। দাতা কে? কৃপণ কে?

তুমি বলছ সব টাকাই তোমার খরচ হয়ে যায়। তবে তো দেখছি তুমি বড়োই কৃপণ, যত টাকা সব বড়ো ব্যাঙ্কে পুঁজি করে রাখছ। জানো তো ভাই 'জো হাথে সো হী সাথে', নিজ হাতে সৎকাজে যা ব্যয় করে যাবে তা সব তোমার সঙ্গে যাবে আর এখানকার যা-কিছু টাকাকড়ি সব এখানেই পড়ে থাকবে। তুমি মরে গেলে পর তার থেকে এক কানাকড়িও তুমি সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারবে না। পরের জন্যে তা পড়ে থাকবে। এখন নিজের হাতেই তো তুমি যা-কিছু খরচ করছ, ওই ধন তোমার সঙ্গে যাবে, বড়ো ব্যাঙ্কে অর্থাৎ ভগবানের কাছে জমা হবে, পরের জন্মে তুমি সেটা পাবে। এবার আমার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কথাটা বুঝলে তো? তুমি সৎকাজে তোমার টাকাকড়ি খরচ করে দিচ্ছ, তার মানে নিজের সঙ্গে নিয়ে যাবার যোগাড়। এখন বলো ভাই, তুমি কৃপণ, না কৃপণ নও?

সেই জন্যই একটা কথা আছে, 'জো হী দাতা সো হী কৃপণ হো হি কৃপণ সো হী দাতা।' অর্থাৎ দাতা যে দিচ্ছে, সেটা সে নিজের জন্যে কৃপণের মতো জমাচ্ছে, পরের জন্মের পুঁজি করছে আর যে এখানে সব নিজের জন্য জমিয়ে রাখছে কৃপণের মতো, সে-ই সব খুইয়ে বসে থাকছে, যেন দাতা হয়ে সব পুঁজি ফেলে রেখে যাচ্ছে পরের জন্য এখানেই। একবার আমি কলকাতায় গিয়েছিলাম। আমার প্রিয় শিষ্য শরৎচন্দ্র সিংহ আমাকে তার আপিসে নিয়ে গিয়েছিল। আপিসের সবাই আমাকে প্রণাম করবার পর এক চৌবেজী আমাকে বললঃ 'বাবা, এই বৈশ্য বড়ো কৃপণ, আপনি একে কিছু উপদেশ দিন।" আমি বললাম ঃ "ভাই, কেন একে তোমরা কৃপণ বলছ, এ তো পরম দাতা। ও তো সমস্ত ধন পুঁজি করে রাখছে, মরবার পর যাকে দেবে সর্বস্ব উজাড় করে দিয়ে যাবে। মরবার সময় ও তো সঙ্গে করে কিছুই নিয়ে যাবে না, তবে ও কৃপণ হল কী করে? ও তো পরম দাতা। 'জো হাথে সো হী সাথে' ও তো নিজের হাতে দান-ধ্যান কিছু করেনি, ও কী জিনিস সঙ্গে করে নিয়ে যাবে? ও তো পরের জন্য সমস্ত পুঁজি করে এখানেই রেখে যাচ্ছে, মরবার সময় সেই পুঁজি পরকে দিয়ে চলে যেতে হবে। বড়ো ব্যাঙ্কে ওর তো কোনো পুঁজি জমবে না, নিজের জন্যে কিছুই ওর থাকবে না। এখন তোমরা বুঝে দেখো কে কৃপণ আর কে দাতা।"

৩। ধনবান দান করতে পারে, নির্ধন কী করবে?

দেখো বাছা, সকলের জন্যেই যে এক পথ তা তো নয়। তবে গন্তব্যস্থান সকলেরই এক, রাস্তাই শুধু ভিন্ন-ভিন্ন হয়ে থাকে। 'কলৌ দানং হি কেবলম কলৌ নামৈব কেবলম্।' তোমার ধন নেই, বেশতো, তুমি নাম করো। দানই করো আর নামই করো, পৌঁছবে সেই একই জায়গায়।

ধনী যে, সে একটাকা দান করতে পারে, কিন্তু যে গরীব, সে যদি একটা আধলাও দান করে, ভগবানের কাছে সে আধলার মর্যাদাও অনেক বেশি, কেননা ধনীর অনেক টাকা রয়েছে, তার থেকে একটা টাকা দান করা তার পক্ষে এমন বেশি কিছু কথা নয়। কিন্তু গরীবের পক্ষে একটা আধলা দান করা তার বড়ো মনেরই পরিচয় দেয়। ভগবানের ভাব দেখেন, বস্তু তাঁর কাছে বড়ো নয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

৪। আশ্রমাদিতে দানের সার্থকতা কী?

নারদ ঋষি একদিন গঙ্গায় স্নান করছেন আর বলছেন ঃ "কলির্ধন্য কলির্ধন্য কলির্ধন্য"। অন্য এক ঋষি তখন নারদকে বললেন ঃ "কলি হল সবচেয়ে খারাপ যুগ, আপনি তাকে কেন ধন্য বলছেন?" নারদ বললেন ঃ "ভাই কলি-যুগকে সেই জন্যই ধন্য বলছি কারণ অন্য অন্য যুগে অনেক তপস্যার ফলে মানুষ উদ্ধার পেতে পারে, আর কলিযুগের এমনই মাহাত্ম্য যে বিনা তপস্যায় শুধু অন্নদান করলে আর ভগবানের নাম নিলেই মানুষ উদ্ধার হয়ে যায়। এই দানেই আর নামেই জীবরে সদ্‌গতি হয়ে যায়।"

দেখো মা, ভগবান যখন তোমায় দু পয়সা দিয়েছেন তখন তুমি দানকে বাড়িয়ে যাও! তুমি যত দান করবে, তোমার ধন ততই বেড়ে যাবে কমবে না। কুয়োর জল যতই বের করে নেবে, ততই তা পূর্ণ হতে থাকবে, জলও পরিস্কার থাকবে। কুয়োর থেকে জল না তুললে জল নষ্ট হয়ে যায়, সে জল লোকে খেতে পারে না। আর ওই জল তুমি যতই খরচ করতে থাকবে, ভগবান ততই তা পূর্ণ করে দেবেন। দিতে হয় অন্নদান, নিতে হয় হরিনাম। মা, দিতে যদি চাও তো অন্নদান করো, আর নিতে যদি চাও তো হরির নাম নাও।

ভগবান তোমাকে দুপয়সা দিয়েছেন। কত গৃহস্থলোক দিনভর পরিশ্রম করে, তবে দু পয়সা বাইরে থেকে রোজগার করে আনে। সেই রোজগার থেকে সংসারের খরচ চালিয়ে ছেলেপিলেদের খাইয়ে পরিয়ে যেটুকু পয়সা বাঁচাতে পারে তা গুরুসেবার জন্যে এখানে দিয়ে যায়। দেখো মা, কী প্রবল তাদের ধর্মভাব। আমিও তাই দেখি, ধর্মভাব থেকে গৃহস্থেরা এই যে দু'পয়সা দিচ্ছে তা যেন ভালো কাজে লাগে, অর্থাৎ কোনো শুভকাজে যেন তাদের ওই টাকা খরচ করা যায়! তোমাদের এই আশ্রমে অন্নদান হচ্ছে, বিদ্যাদান হচ্ছে, ওষুধ দেওয়া হচ্ছে, দেবসেবা, হচ্ছে, গোসেবা হচ্ছে অতিথি-ফকির যারা আসে তাদের কিছু মিলে যায়। হিন্দুদের যতরকম শুভকাজ, সব এই আশ্রমে চালু আছে।

দেখো মা ওষুধ দেওয়া একটা শ্রেষ্ঠ দান। তুমি অন্ন দিচ্ছ, আমি রোগী বলে খেতে পারছিনে, অন্ন আমার মুখে বিস্বাদ লাগছে। ওষুধ খেলে এই রোগ সেরে যাবে, তাই অন্নদানের চেয়েও ওষুধ দান শ্রেষ্ঠ। বিদ্যাদানও এক শ্রেষ্ঠ দান। সংসারের মধ্যে সবচেয়ে দুঃখদায়ক কী? নিজের মুর্খতা। নিজের যে মুর্খতা তা বড়ো দুঃখের কারণ, বিদ্যাদানে সেই দুঃখ দূর হয়। মা, হিন্দুদের মধ্যে যতকিছু ভালো কাজ আছে তার সবকিছু এইভাবে তোমাদের এই আশ্রমে চালু রয়েছে।

তুমি যে আমাকে দু'পয়সা দিচ্ছ, তা নিয়ে আমার কী করা কর্তব্য?

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আমার কর্তব্য হল ভালো উর্বরা জমি দেখে সেই বীজকে বপন করে দেওয়া, যাতে পরের বছর বা পরজন্মে তার ফল তুমি ভোগ করতে পারো। এতে আমার তো কোনো স্বার্থ নাই। 'জিস্‌কা চুন্‌ উস্‌কা পুণ, সাধু-অবধুতকা নেহী পাপ ঔর পুণ।' যার টাকাতে শুভকার্য হয়, ফল তারই মেলে, সাধু-অবধূতদের এতে কোনো পাপও নেই, পুণ্যও নেই। তবে সাধু অবধুত হল মালি। জমি চিনতে পারে কে? ওই মালি। গৃহস্থের কাছে সাধুর বেশ ধরে কেউ এল আর দুপয়সা ঠকিয়ে নিয়ে গেল। আবার সত্যিকারের ভালো কোনো সাধু গৃহস্থের কাছে এসে গালাগালি শুনে ফিরে গেল। সাধুবেশীদের মধ্যে কে যে ভালো, কে যে মন্দ গৃহস্থ তা চিনতে পারে না। তবে গুরুজনরা আছেন যাঁরা জমির ভালো-মন্দ বোঝেন, তাঁদের হাত দিয়েই শুভকার্য করানো উচিত।

কত লোক আমাকে বলে, বাবাজী সব সময় মাথায় করে ইঁট-কাঠ-চুন সুরকি বহন করছেন, পাকা বাড়ি বানাবার বাবাজীর নাকি খুব সখ। শুনে আমার হাসি পায়। এখানে প্রণামী বলে গৃহস্থরা যে পয়সা দিয়ে যায়, আমি শুধু দেখি তা আমি কোন কাজে লাগাতে পারব? তাই এমন কোনো সৎকাজে লাগিয়ে দিই যাতে তাদের কল্যাণ হয়। যারা টাকা-পয়সা দেয়, পুণ্য হয় তাদেরই আমি তো দিন-মুজুরি করি আর একমুঠো ভাত খেয়ে নিই। আমি শুধু দেখি, এই যে হাসপাতাল, পাঠশালা, সাধুদের থাকবার জন্যে যেসব ঘরবাড়ি রয়েছে, এতে আমার কী স্বার্থ রয়েছে? আমার কোন স্বার্থই নেই। এতে দশজনের কল্যাণ হচ্ছে, দশজন এখানে বসে আরাম পাচ্ছে। প্রথমে যখন বাড়ি তৈরি হতে শুরু হল তখন কত গরীব লোক খাটতে লাগল, মজুরীর টাকায় তাদের খাওয়ার কষ্ট ঘুচল। এখন তো আমার বৃদ্ধ অবস্থা, দুদিন বাদেই আমাকে চলে যেতে হবে, কিন্তু আশ্রমের সবকিছুই তো এখানে থাকবে। এইসব বাড়ি ঘর ধর্মশালা থাকবে, এতে মানুষ বাস করবে, এতে আমার কী স্বার্থ? 'আমার আমার' বলে আসক্তিপূর্ণ যে কাজ তাতেই বন্ধন। বিচারবুদ্ধি দিয়ে পরের কল্যাণের জন্যে যে কাজ করা হয় তাকে স্বার্থ বলে না, সেই কাজই পরার্থ হয়ে যায়।

৫। দান কখন নিষ্ফল হয়?

ধর্মকর্মে সর্বস্ব দান করে দিয়ে পরে যদি তাই নিয়ে মনে দুঃখ জাগে যে দান করে আমি একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেলাম, তবে সেই দান তামসিক দান হয়ে যাবে। তাই গোড়ায় ভালো করে ভেবেচিন্তে তারপর দান করা উচিত। একবার দান করার পর আর যেন অনুশোচনা করতে না হয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মৃত্যু

১। মৃত্যু সৃষ্টি রচনার একটি অঙ্গ কেন?

যে ভগবান আমাদের সৃষ্টি করেছেন, তিনিই আমাদের পালন করছেন, আবার তিনি আমাদের সংহার করছেন। কেন যে তিনি সৃষ্টি করেছেন, পালন করছেন, লয় করছেন, তা তিনি আমাদের কাছে প্রকাশ করেননি। তবে তুমি তোমার বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে সৃষ্টি-রহস্যের দ্বার খুলে একবার বুঝবার চেষ্টা করে দেখো। সৃষ্টি তো হল, কিন্তু সংহার যদি না হয় তাহলে পৃথিবীতে মানুষের থাকবার জায়গা তো মিলবে না। খাবার জিনিসও টান পড়বে। একবার এই অবস্থাটার কথা ভেবে দেখ তো। মানুষ, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ স্থানাভাবে এক অন্যের গায়ে পিষে যাচ্ছে, খাদ্য অভাবে পেট জ্বলে যাচ্ছে, যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে সকলেই তখন মরণ কামনা করবে। এজন্যেই মৃত্যু হল সৃষ্টির একটা অঙ্গ।

২। মৃত্যুর কোনো কালাকাল নেই কেন?

কাল পূর্ণ হলে মানুষ মারা যায়। কাল যতক্ষণ পূর্ণ না হচ্ছে ততক্ষণ যত সংকটেই মানুষ পড়ুক না কেন, তার প্রাণ-বিয়োগ হবে না। সে জলে ডুবুক, আগুনে পড়ুক, ছাদ থেকে পড়ে যাক, যেভাবে হোক তার প্রাণ রক্ষা হয়ে যাবে। আবার দেখা যায় মরবার কোনো কারণ নেই, অতি তুচ্ছ কোনো কারণেই মানুষের মৃত্যু হল। এর কারণ কী? কারণ আর কিছুই নয়, তার কালপূর্ণ হয়েছে। বিচিত্র কালের গতি! কার ক্ষেত্রে কখন যে তা পূর্ণ হবে কেউ তা বলতে পারে না।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

৩। মৃত্যু পরে কি সঙ্গে যাবে?

এ জগতে কিছুই তোমার নয়। তোমার যদি হত তাহলে মৃত্যুর সময় তুমি তা সঙ্গে নিয়ে যেতে তো পারতে। তা তো পারবে না, যেখানকার জিনিস সেখানেই পড়ে থাকবে। তবে তোমার সঙ্গে যাবে পাপ আর পুণ্য। শুভাশুভ কর্মের দ্বারা তোমার যে পুণ্য আর পাপ সঞ্চয় হয়েছে, তাই তোমার সঙ্গে যাবে তাই আবারও বলি, দেখো মা, 'যা দেবে হাতে তাই যাবে সাথে।' নিজের হাতে যা দান-ধ্যান করবে, শুভকাজ করবে, তাই তোমার সঙ্গে যাবে। সেইজন্য সবসময় শুভকাজ করবে, শুভ চিন্তা করবে দান করবে।

৪। মৃত্যুকে মানুষ ভয় পায় কেন?

দেখো ভাই, মরতে মানুষ ভয় পায়, দুঃখ পায়, তার কারণ হল অজ্ঞানতা জ্ঞানচক্ষু খুললে তখন আর দুঃখ হয় না। দেখো, কোনো দেশে এমনি রেওয়াজ চালু হয়ে গিয়েছে যে সেখানে কেউ মারা গেলে লোকে আনন্দ করে, আর কেউ জন্মালে লোকে কাঁদে। ওদের মনে দৃঢ় ধারণা জন্মে গিয়েছে যে জন্ম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই শিশু মরণের পথে এগিয়ে যেতে লাগল, এই ভাবনাতেই তার আত্মীয়-স্বজন কাঁদতে থাকে। আর কেউ যখন মরে যায়, তখন এরা ভাবে যে মৃতব্যক্তি এবার মুক্তি পেল, আবার নতুন শরীর নিয়ে জন্মগ্রহণ করবে। এই চিন্তাতেই তারা আনন্দে মশগুল থাকে।

জগৎ সংসারে সবাই মৃত্যুকে ভয় পায়, কিন্তু এমন কেউ কেউ আছে যারা মৃত্যুকে ভয় করে না। এর কারণ কী? একই মৃত্যু, কিন্তু কেউ কেউ তাকে ভয় করে, কেউ মৃত্যুকে আনন্দ বলে মনে করে। আমার তো মনে হয়, যে-মানুষের মধ্যে পুণ্যের অংশ বেশি, যাদের কিছু জ্ঞান জন্মেছে, তারাই মৃত্যুকে ভয় পায় না। আর যাদের মধ্যে পাপের অংশ বেশি, অজ্ঞানতা বেশি, তারাই মৃত্যুর নামে ভয় পায়।

৫। অন্তিমকালের কর্তব্য কি?

অন্তিমকালের সময় খুব হুঁশিয়ার থাকতে হয়। জপ-তপ, পুজো-পাঠ, মানুষ যা-কিছু করে সব এই অন্তিকালের জন্যেই করে সারা জীবনের সাধন-ভজনের অভ্যাস এই শেষ সময়েই ফল দেয়। যারা সাধন-ভজনের ধার ধারে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

না, তাদের কথা আর কী বলব? অনেক ভজনশীল অভ্যাসী লোকের পক্ষেও মৃত্যু-যন্ত্রণার মধ্যে ভগবানের নাম স্মরণ করা সম্ভব হয় না। অন্তিমকালের চিন্তা অনুসারেই পরবর্তী জন্ম নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। তাই শুধু জপ-তপ করলেই চলবে না। সব সময় মনে সৎভাব জাগিয়ে রাখতে হবে যাতে অন্তিকালে সেই সৎভাবের চিন্তাই মনে স্থান পায় এবং সেই সৎচিন্তা নিয়েই ইহজগত থেকে বিদায় নেওয়া যায়। তাই বলা হয় 'তপা সো ক্ষপা, অন্তমতা সো গতা,' তপস্যা সব ক্ষয়প্রাপ্ত হয় বা বিফলে যায়, একমাত্র অন্তের মত বা শেষ চিন্তা অনুসারেই মানুষের গতি হয়ে থাকে। বাংলাতেও বলে ঃ 'জপ-তপ সবই বৃথা, মরতে জানলে হয়।' শেষ চিন্তা সম্বন্ধে তাই সর্বদা সজাগ থাকতে হয়, জীবনকালে 'সদা তদ্ভাবভাবিত' হলে তবেই মৃত্যুকালে বা 'অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ মুক্ত্বা কলেবরম্,' তাঁর স্মরণ করতে করতে কলেবর বা দেহত্যাগ করা সম্ভব হয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

খুব শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে

শ্রীশ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ-এর এক অনবদ্য গল্প সংকলন

বালানন্দ গল্পমালিকা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আমাদের প্রকাশনার পুস্তক সমুহ

১। রবীন্দ্রপুরস্কার প্রাপ্ত যশস্বী লেখক শঙ্করনাথ রায়ের— ভারতের সাধক
(৫, ৬, পৃথক্ ভাবে পাওয়া যায়)। (প্রতি খণ্ড ৮০, ১০০ ,)।
২। ছোটদের ভারতের সাধক মূল্য—১২।
শিবরাম কিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দের—
৩। আর্যশাস্ত্র প্রদীপ (১—৪) সেট—২৪০। ৪। দুর্গাচ্চনা ও নবরাত্র তত্ত্ব, ৪০।
৫। মানব তত্ত্ব, ৬। পরলোক তত্ত্ব, ২০০।
মহামহোপাধ্যায় ডাঃ গোপীনাথ কবিরাজের—
৭। সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ (১—৬) খণ্ড প্রকাশিত মূল্য ঃ ২১০।
৮। পত্রাবলী, মূল্য ঃ ৪৫। ৯। জ্ঞানগঞ্জ, মূল্য ঃ ৪৫।
১০। শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ—৬০। ১১। স্বসংবেদন ১২। সূর্য্যবিজ্ঞান—৭৫।
১৩। কাশীর সারস্বত সাধনা, প্রকাশিত মূল্য—৩৫। ১৪। অখণ্ড মহাযোগ মূল্য ঃ ৪০।
১৫। বিশুদ্ধানন্দ প্রসঙ্গ (১—৫) খণ্ড প্রকাশিত সেট্ ১২০।
১৬। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর— যজ্ঞ কথা মূল্য ঃ ৪০।
১৭। দিলীপকুমার রায়ের— মীরাবৃন্দাবনে মূল্য ঃ ২০।
১৮। স্বামী সোমেশ্বরানন্দের— সর্পাবদ শ্রীরামকৃষ্ণ (চিত্রে) মূল্য ঃ ৩০।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর শাস্ত্রী পঞ্চতীর্থের—
১৯। চিকিৎসা বিধানে তন্ত্রশাস্ত্র (১—৩) প্রকাশিত মূল্য ঃ ১৪৫।
২০। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ও শ্রীনিত্যানন্দ
(বৈষ্ণব সংস্কৃতি গবেষণা বিষয়ে গ্রন্থ) মূল্য ঃ ৪০।
২১। ডঃ সজল বসুর— সম্পাদনায় ভারতের সমাজ ভাবনা (দু'খণ্ড) প্রতি খণ্ড ২০।
২২। **West Bengal the Violent years Rs. 25.00**
২৩। শিবনাথ শাস্ত্রীর— মহান পুরুষের সান্নিধ্যে মূল্য ঃ ৩০।
২৪। ডঃ বেণীশঙ্কর শর্মার— বিবেকানন্দের জীবনের এক বিস্মৃত অধ্যায় মূল্য ঃ ৫০।
২৫। রামদয়াল মজুমদারের— গীতা পরিচয় মূল্য ঃ ৩০।
২৬। স্বামীমুক্তানন্দের— মাধব পাগলা ও রামঠাকুরের কথা (দুই খণ্ড) মূল্য ঃ ৫০।
২৭। গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়ের— গীতার কথা মূল্য ঃ ৫০।
২৮। ভাগবতের কথা মূল্য ঃ ৭৫। ২৯। মহাজন সংবাদ মূল্য ঃ ১২০।
৩০। ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেদ-বেদান্ত দর্শন যোগের উপর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ
অভয়ের কথা মূল্য ঃ ৮০।
৩১। বিভূপদ কীর্তির— রমন মহর্ষি ও শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মা মূল্য ঃ ৬০।
৩২। মোহিতলাল মজুমদারের— জয়তু নেতাজী মূল্য ঃ ৮০।
৩৩। পরিব্রাজক গঙ্গানারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের— গুরুসঙ্গে দাক্ষিণাত্য মূল্য ঃ ৮০।

প্রাচী পাবলিকেশন্স

৬৩বি, ন্যাশনাল প্লেস, বাক্সাড়া, হাওড়া—৭১১৩০৬ ফোন ঃ ৬৫৮-০০৮৪

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi